লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী

লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

Loke-Biswas O Loke-Samskar
(Folk Beliefs & Superstitions)
by Dr. Barun Kumar Chakrabarty

প্রথম প্রকাশ : জন্মাষ্টমী, ১৩৮৭
দ্বিতীয় পুস্তক বিপণি সংস্করণ : ১লা বৈশাখ, ১৩৯০

প্রকাশক
শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদ
অজয় গুপ্ত

মুদ্রক
শ্রীপুলিনচন্দ্র বেরা
দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন
কলকাতা-৬

পনেরো টাকা

সারস্বত সাধনার কিংবদন্তী পুরুষ

আমার গুরু—

আচার্য শ্রীসুকুমার সেন

শ্রীচরণেষু

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

সাহিত্য সমীক্ষা
বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস
বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র
লোক-সংস্কৃতি ঃ নানা প্রসঙ্গ
টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য
বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত

নিবেদন

লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন উপকরণ বেশ কিছুদিন ধরেই নানা গবেষক এবং আলোচক দ্বারা সংগৃহীত, প্রকাশিত ও আলোচিত হলেও লোক-সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারগুলি তেমন ভাবে সংগৃহীত এবং আলোচিত হতে দেখা যায় নি। অথচ ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, গান, গীতিকা কিংবা গল্পের মত লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারও বিস্মৃতির পথে ইতি মধ্যেই অনেকখানি চলে গেছে, বিশেষত যেগুলি প্রাচীন; আবার বিপরীতক্রমে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় অনেক নতুন বিশ্বাস এবং সংস্কারের উদ্ভবও ঘটেছে। বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের লোক-বিশ্বাস এবং সংস্কারের একাধিক বিশ্বকোষ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া পৃথক পৃথক ভাবেও বিশেষ বিশেষ দেশের প্রচলিত বিশ্বাস এবং সংস্কারের সংকলন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস এবং সংস্কারের কোন সংকলন কিংবা সেই সম্পর্কিত আলোচনা গ্রন্থ এপর্যন্ত অপ্রকাশিত। অবশ্য ও বাংলায় আবদুল হাফিজ 'বাঙলা দেশের লৌকিক ঐতিহ্য', 'লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ' এবং 'লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ' নামে তিন খানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। প্রথম দু'টি গ্রন্থে সাধারণ ভাবে লৌকিক ঐতিহ্য এবং মানব সমাজে লৌকিক সংস্কারের উদ্ভব সম্পর্কিত নানা আলোচনা স্থান পেয়েছে। শেষোক্ত গ্রন্থটির দ্বিতীয় অংশে আধুনিক বাংলা দেশে প্রচলিত ২৫৬টি লোক-সংস্কার 'বাঙালীর লোক সংস্কার' পর্যায়ে সংকলিত হয়েছে। তন্মধ্যে অবশ্য বেশ কিছু লোক-ঔষধও সংস্কারের নামে সংকলিত হয়েছে দেখা যায়। জনাব হাফিজ তাঁর গ্রন্থে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কারের সঙ্গে বাংলাদেশে প্রচলিত সংস্কারের যেমন কোন তুলনামূলক আলোচনা করেন নি, তেমনি প্রচলিত সংস্কার গুলির পেছনে প্রকৃত উদ্দেশ্য কি নিহিত রয়েছে সেই সম্পর্কেও তেমন কিছু উল্লেখ করেন নি। আমাদের এই বাংলায় লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার সম্পর্কিত কোন গ্রন্থ প্রকাশিত না হলেও কয়েকটি পত্র পত্রিকায় কিছু প্রবন্ধ এবং লোক-বিশ্বাস ও সংস্কারের কিছু সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে।

এ গুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'বিশ্ববাণী' পত্রিকায় ধারাবাহিক

ভাবে প্রকাশিত জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী রচিত 'যাদু বিজ্ঞান ও সাধন শক্তি' প্রবন্ধটি (কার্তিক, অগ্রহায়ণ ও পৌষ সংখ্যা, ১৩৮৪) ; পুরুলিয়া জেলা থেকে প্রকাশিত 'ছত্রাক' পত্রিকার ১৩৮৪ সনের বৈশাখী সংখ্যায় ; মহাবীর নন্দী রচিত 'মানভূমি সংস্কার বিচিত্রা' প্রবন্ধটি ; ঐ একই পত্রিকার ১৩৮৪ সনের শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত মহাবীর নন্দীর'মানভূমী সংস্কার বিচিত্রা'র তৃতীয় কিস্তি, ১৩৮৫ সনের নববর্ষ সংখ্যায় প্রকাশিত অরুণ প্রকাশ সিংহ সংগৃহীত 'মানভূমে প্রচলিত কিছু সংস্কার', শারদীয়া 'ভাবনা চিন্তা'য় (১৩৮৩) প্রকাশিত সুবিমল বসাক সংকলিত 'কুসংস্কার ১১০','সাহিত্য ও সংস্কৃতি',পত্রিকার কার্তিক-চৈত্র (১৩৮৫) সংখ্যায় প্রকাশিত এবং গোপা সরকার রচিত 'কলকাতার জীবনে নিষেধাত্মক লোক-সংস্কার' ; 'দিগদর্শন' পত্রিকার পঞ্চম সংকলনে প্রকাশিত (নভেম্বর ১৯৭২) ডঃ বিমল মুখোপাধ্যায়ের 'বাঙলার লোকাচার ও লোক বিশ্বাস' শীর্ষক সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি। শেষোক্ত প্রবন্ধটিতে প্রায় দেড় শতাধিক লোকাচার ও লোক-বিশ্বাস স্থান পেয়েছে। তাছাড়া লেখকের আচার ও বিশ্বাস সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনাও স্থান পেয়েছে প্রবন্ধটিতে। 'ঐকতান' পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যায় (১৩৮৬) প্রকাশিত ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত 'পশ্চিম-বঙ্গে লোক-বিশ্বাস ও যাদুবিদ্যার ধারা' শীর্ষক প্রবন্ধটিও প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। বর্তমান লেখকের একটি প্রবন্ধ 'বাংলা প্রবাদে লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' প্রকাশিত হয়েছে রবিবাসরীয় জনতা পত্রিকায় (৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯)। তাছাড়া সংস্কার ও বিশ্বাস সম্পর্কিত বর্তমান লেখকের আরও কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে একাধিক পত্রিকায়। এগুলির মধ্যে আছে আলিঙ্গনের বিশেষ সংখ্যায় প্রকাশিত 'বৃষ্টি ও সংস্কার' প্রবন্ধটি, 'ধন-ধান্যে' পত্রিকায় প্রকাশিত (১৬-৩১ মে ১৯৮০) 'সংস্কারে ঐক্য' প্রবন্ধটি, 'বেনামী বন্দর' পত্রিকায় প্রকাশিত (১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৮৬) 'প্রসঙ্গ : গর্ভবতী রমণী ও আমাদের লোক-সংস্কার' প্রবন্ধটি, এছাড়া 'আকাদেমী অব ফোকলোর' প্রকাশিত 'বিবাহের লোকাচার' গ্রন্থের (জুন ১৯৮০) অন্তর্গত বর্তমান লেখক রচিত 'বাঙ্গালীর বিবাহ সম্পর্কিত লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' প্রবন্ধটিও উল্লেখযোগ্য। বর্তমান গ্রন্থটিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত যে সহস্রাধিক লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার সংকলিত হয়েছে প্রতিটি ক্ষেত্রেই কোনটি কোন জেলা থেকে সংগৃহীত তার নির্দিষ্ট উল্লেখ থাকা উচিত ছিল কিন্তু কেন সে উল্লেখ নেই, তার কৈফিয়ৎ এই প্রসঙ্গে দিয়ে রাখা প্রয়োজন। একই বিশ্বাস এবং সংস্কার পশ্চিমবঙ্গের অনেক-

গুলি জেলাতেই বর্তমান। সুতরাং একটি সংস্কার অথবা বিশ্বাসের সঙ্গে বিশেষ একটি জেলার নাম যুক্ত করা সঙ্গত মনে করা হয় নি। পূর্ববঙ্গের (অধুনা বাংলাদেশ) বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করছেন। তাঁদের মাধ্যমে ওপার বাংলার বহু লোক-বিশ্বাস ও সংস্কার এপার বাংলার লোক সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে স্বাভাবিক কারণেই। যদিও বর্তমান গ্রন্থটিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রচলিত লোক-বিশ্বাস এবং সংস্কারকে সংকলিত করা হয়েছে, কিন্তু পূর্বোক্ত কারণে বাংলাদেশে প্রচলিত বেশ কিছু বিশ্বাস এবং সংস্কারও পরোক্ষভাবে বর্তমান সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে ধরে নিতে হবে। লোক-সংস্কৃতির বিষয়ে সামান্য সচেতন যিনি, তিনিই জানেন লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারেরও এক বিশেষ গুরুত্ব আছে লোক-সংস্কৃতির আলোচনায়। তাই বিংশ শতাব্দীর আটের দশক যখন অতিক্রান্ত প্রায়, তখন বর্তমান গ্রন্থটিকে সংস্কার প্রচারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেখলে বর্তমান লেখকের প্রতি যে অবিচার করা হবে সেকথা সবিনয়ে জানিয়ে রাখি। বর্তমান গ্রন্থটিতে লোক-বিশ্বাস এবং সংস্কার সংক্রান্ত আলোচনা নিতান্ত সীমিত পরিসরে স্থান পেয়েছে। আরও বিস্তৃত পরিসরে আলোচনা করাব অবকাশও ছিল, বর্তমান লেখকের সে ইচ্ছাও ছিল। কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, নানা প্রতিকূলতায় গ্রন্থটির মুদ্রণ কার্যে আশাতীত বিলম্ব হওয়ায় ধৈর্যচ্যুতি বশতঃই গ্রন্থটিকে দ্রুত প্রকাশের জন্যে আলোচনাকে সীমিত রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে বিস্তৃত আলোচনার ইচ্ছা অবশ্য রইল। এই গ্রন্থটি রচনায় যাঁরা লেখককে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন ডঃ সুকুমার সেন, ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ডঃ মযহারুল ইসলাম, অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী, ডঃ ভবানীগোপাল সান্যাল, ডঃ অরুণ বসু, অধ্যাপক সনৎকুমার মিত্র, ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, ডঃ দুলাল চৌধুরী, ডঃ সুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, দিব্যজ্যোতি মজুমদার এবং ডঃ মানস মজুমদার। এঁদের সকলকেই আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। সেই সঙ্গে শিল্পী অজয় গুপ্ত গ্রন্থটির প্রচ্ছদ অঙ্কন করে দিয়েছেন বলে তাঁকেও জানাই ধন্যবাদ।

বরুণকুমার চক্রবর্তী

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

মাত্র তিন বছরেরও কম সময়ের মধ্যে 'লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশ করা হ'ল। বলা বাহুল্য দ্বিতীয় সংস্করণটিকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত করে প্রকাশ করা হয়েছে। আলোচনার অংশকে যেমন বৃদ্ধি করা হয়েছে তেমনি সংকলনে বিশ্বাস এবং সংস্কারের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছে। শ্লাঘার বিষয় হ'ল যে প্রথম সংস্করণটির ক্ষেত্রে পত্র-পত্রিকায় তেমন বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়নি, এমনকি একটি মাত্র পত্রিকা ছাড়া অন্যত্র এর সমালোচনাও প্রকাশিত হয়নি। তবু পাঠকদের কাছে গ্রন্থটি আদৃত হয়েছে। নিঃসন্দেহে তা বিষয়ের গৌরবে।

বর্তমান পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণটি প্রকাশের ব্যাপারে পুস্তক বিপণির তরুণ কর্ণধার শ্রীমান্ অনুপকুমার মাহিন্দারের আন্তরিক সহযোগিতার জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

১লা বৈশাখ, ১৩৯০ **বরুণকুমার চক্রবর্তী**

ভূমিকা

বেশ কিছুদিন যাবৎ পশ্চিমবঙ্গে (এবং বাংলাদেশেও) লোক-সংস্কৃতির বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা (যেমন লোক সাহিত্য, লোক শিল্প, লোকসঙ্গীত, লোকাচার, লোকায়ত ধর্ম ও সংস্কার, লোকায়ত বিশ্বাস, লোক প্রবাদ, লোক নৃত্য ও অভিনয় ইত্যাদি) নিয়ে নানা প্রকারের সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও আলোচনাদি হচ্ছে। এ সব বিষয়ে সেমিনার সিম্পোসিয়ম ইত্যাদি প্রায়শ হয়ে থাকে, ভালোমন্দ গ্রন্থাদিও বেশ কিছু রচিত হয়েছে, দু-তিনটি প্রতিষ্ঠান ও গড়ে উঠেছে এই লোক সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে। লক্ষণীয় এই যে, যাঁরা এ-সব উদ্যমের সঙ্গে জড়িত তাঁরা প্রায় সকলেই একই বয়সের (দশ পনেরো বছরের ব্যবধানের মধ্যে) ; প্রায় সবারই মনন কল্পনাগত শাসনানুশাসন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের বা সমাজ বিজ্ঞানের নয়। বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গে অধুনা যাঁরা এ-কাজে ব্রতী তাঁদের কারোরই শিক্ষা ও প্রেরণা, মন ও বুদ্ধির শাসনে বিজ্ঞানসম্মত সাংস্কৃতিক জনতত্ত্ব বা সমাজ বিজ্ঞানের শাসন-বশ্যতার স্বীকৃতি নেই। অন্যদিকে আবার যাঁদের মন ও বুদ্ধি এই দুই বিদ্যার শাসনে শাসিত তাঁরা এদিকটায় কমই আকৃষ্ট হচ্ছেন ; লোকায়ত বাঙালীর শিল্প, নাচ, গান, অভিনয়, ভাষা, মৌখিক সাহিত্য ধর্ম বিশ্বাস ও আচার বিচার প্রভৃতির দিকে তাঁদের অনুরাগ বিশেষ দেখা যায় না। এই দুই অবস্থার মধ্যে পড়ে বাঙালীর লোক-সংস্কৃতি চর্চার গুণগত বৈজ্ঞানিক সংগ্রহ-আলোচনা-বিশ্লেষণে আমরা খুব অগ্রসরমান একথা বোধ হয় বলা যায় না। তা ছাড়া, সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব আলোচনায় আমরা আজও যেসব শব্দ (term) পদ বা বাক্যাংশ, ধ্যান ধারণা (concept) ও আদর্শ (model) ইত্যাদি সচরাচর ব্যবহার করি তা সমস্তই বিদেশি পণ্ডিতদের চিন্তা ও রচনা থেকে ধার করা ; আজও আমরা সেগুলোকে আমাদের দেশের ও সমাজের জলমাটি আলো বাতাসের সঙ্গে মিলিয়ে স্বাঙ্গীকৃত করে নিতে পারিনি।

কিন্তু যা হয়নি যা আমরা পারিনি আজও, তা নিয়ে দুঃখ করে লাভ নাই। যা আমরা করেছি ও করছি তার কথাই বলি। রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র থেকে সুরু করে গত ৭০—৮০ বছরের ভেতর বিশেষ ভাবে গত বিশ পঁচিশ বছরের ভেতর লোক-সংস্কৃতির নানা শাখা-প্রশাখায় বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ হয়েছে প্রচুর,

অর্থবহ আলোচনা বিশ্লেষণও কিছু কিছু হয়েছে। সংগ্রহ ক্রিয়া সবটাই খুব বিজ্ঞান সম্মত ভাবে হয়েছে এমন নয়, তবে কোথায় তা হয় নি, কোথায় হয়েছে, তা যে কোন সজাগ বুদ্ধি গবেষকের চোখেই ধরা পড়বে এবং তখন তিনি তা পরখ করে নিতে পারবেন। সদ্যোক্ত এই সমৃদ্ধ সংগ্রহের মূল্য অপরিসীম, যেহেতু এরই মধ্যে এই সংস্কৃতির অনেক তথ্য হারিয়ে গেছে এবং যা এখনও বাকি আছে তা হারিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। কালের পরিবর্তনের অমোঘ যুক্তিতেই তা আরও দ্রুত হারিয়ে যাবে।

ইতিমধ্যে শ্রীমান্ বরুণকুমার চক্রবর্তী বাঙালীর লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের এই একটি সংগ্রহ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন। প্রসন্নচিত্তে এই নাতিবৃহৎ গ্রন্থটিকে স্বাগত জানাই। প্রথমেই গ্রন্থকার কিঞ্চিন্ন্যন ৫০ পৃষ্ঠায় লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের সংজ্ঞা নির্ণয়, এ-দুয়ের মধ্যে পার্থক্য ও এ-দুয়ের উৎপত্তি, সংস্কারের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা, সংস্কারের ঐক্য, দেশভেদে সংস্কারে স্ববিরোধিতা ইত্যাদি নিয়ে কিছু বিশ্লেষণ আলোচনা করেছেন। বইটির বাকি অংশে আছে বাঙালীর লোকায়ত জীবনের নানা নিষেধাজ্ঞা (taboo), নানা অসুখ-অসুবিধার প্রতিকার ও উপশম, শুভ ও অশুভ লক্ষণ, বিবাহ, গর্ভবতী নারী ও প্রসূতি, বৃষ্টি, কৃষি, চোখ লাগা বা নজর লাগা, ভোজন, যাত্রা, ঝগড়া-বিবাদ, নামকরণ, ঋণ প্রভৃতি বিচিত্র বিষয় নিয়ে বিচিত্রতর বিশ্বাস ও সংস্কারের একটি দীর্ঘ তালিকা। সর্বশেষে একটি পরিশিষ্টে লোহা, বৃষ্টি, গর্ভবতী নারী ইত্যাদি নিয়ে আরও কিছু সংস্কারের উল্লেখ করা হয়েছে।

এ-বই পাঠক সাধারণের কৌতূহলোদ্দীপক হবে সন্দেহ নেই, কিন্তু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বে যাঁরা আগ্রহী তাঁরা এ সংগ্রহে এমন অনেক তথ্য পাবেন যা তাঁদের বাঙালীর লোকায়ত জীবনকে জানবার ও বুঝবার দিকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে।

কলকাতা, ১৭ আগষ্ট ১৯৮০ **নীহাররঞ্জন রায়**

বিষয়সূচী

No natural exhalation in the Sky,

No scape of nature, no distemper'd day,

No common wind, no customed event,

But they will Pluck away his natural cause,

And call them meteors, prodigies and signs,

Abortives, presager and tongues of heaven,

Plainly denouncing vengeance.

—William Shakespeare (King John)

১. সংজ্ঞা ঃ লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

দীর্ঘদিন ধরে যদিও লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার সম্পর্কে পণ্ডিতেরা আলোচনা করে আসছেন, বিশেষত লোক-সংস্কার সম্পর্কে, কিন্তু আজও লোক-সংস্কার সম্পর্কে তাঁরা ঐকমত্যে পৌঁছতে পারেননি। বিভিন্ন জন সংস্কারের বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা দিয়েছেন। স্বভাবতঃই এইসব সংজ্ঞায় প্রতিফলিত হয়েছে বিভিন্ন জনের দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য। আমরা লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবেশের আগে কয়েকটি সংজ্ঞার পরিচয় নেবার চেষ্টা করব। কারণ তাহলে আমাদের পক্ষে লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরী করে নেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। প্রথমেই সংস্কার সম্পর্কিত সংজ্ঞার উল্লেখ করা হ'ল।

ক. "Irrational or unfounded belief in general"

– Short Oxford Dictionary.

খ. "If there is evidence for a belief, if its probabilities are calculable and of reasonable amount, then there is nothing irrational in taking a chance in believing it. But if the odds cannot be estimated, or if they are grossy weighted against what is believed, then the belief is a superstition." —Prof. A. E. Heath ; 'probability, Science and Superstition.' The Rationalist Annual. 1948

গ. "...... a superstition is something which is "left over" from the past and which continues to prevail without being understood." – Martin Lings ; 'Ancient Beliefs and Modern Superstition' ; Chap III, Page 26 (The Present in the light of the Past)

ঘ. "Superstition" means in common use false beliefs concerning supernatural powers, especially such as are regarded as socially injurious and particulars as leading to

obscuranitism or cruelty. "Superstition," then, is here used merely as a collective term for the subject……Magic (or the belief in occult forces) and Animism (or the belief in the activity of Spirits)."—Carveth Read ; 'Man and his Superstitions' ; 2nd Edition ; Page I

ঙ. "……to define as 'Superstition' any belief or practice that is not recommended or enjoyed by any of the great organised religions such as Christianity, Judaism, Islam and Buddhism." – Alexander H. Krappe ; 'The science of Folklore' ; Page 204.

চ. "Superstitions are the living relics of ways of thought much older than our own, and of beliefs once strongly held but now abandoned and forgotten." —Christina Hole ; Foreword ; 'Encyclopedia of Seuperstition' ; Page 7

ছ. "Superstitions are, however, but beliefs of which there is no longer a wholehearted acceptance. They are practices that are followed without conviction, but with an uneasy feeling that it will do no harm to carry them out, if by chance we thus get on the good side of powers whose existence we may at times doubt."—Melville J. Herskovits ; 'Cultural Anthropology' ; Chap XII ; Religion ; Man and the Universe ; Page 221.

প্রথম সংজ্ঞাটির মূল কথা হ'ল—বিচারশক্তি শূন্য, অযৌক্তিক অথবা সাধারণভাবে অমূলক বিশ্বাসই হ'ল সংস্কার।

দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে—বিশ্বাসের পেছনে যদি কোন প্রমাণ থাকে, যদি বিশ্বাসের সম্ভাবনা গুলি গণনসাধ্য হয় এবং সেগুলির পরিমাণও যদি হয় উল্লেখযোগ্য, তবে সে ক্ষেত্রে বিশ্বাস করার ব্যাপারে তেমন কোন অযৌক্তিকতা থাকে না। কিন্তু যদি বৈষম্যগুলি নিরূপণের অতীত হয় অথবা যা বিশ্বাস করা হয়ে আসছে তুলনায় যদি সেগুলি অমার্জিতভাবে গুরুত্ব সম্পন্ন হয় তবে সেই বিশ্বাসই হ'ল সংস্কার।

তৃতীয় সংজ্ঞায় দেখা গেল বলা হয়েছে—সংস্কার হ'ল যা নাকি অতীতকাল থেকেই চলে আসছে এবং যা বর্তমানে না বুঝেও অনুসৃত হচ্ছে।

চতুর্থ সংজ্ঞা অনুযায়ী, সাধারণভাবে সংস্কার হ'ল মিথ্যা বা ভিত্তিহীন বিশ্বাস, যে বিশ্বাস অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা সংক্রান্ত, বিশেষত সেই বিশ্বাস যা নাকি সামাজিকভাবে ক্ষতিকারক এবং যা জ্ঞান ও কৃষ্টির বিরোধিতায় চালিত করে অথবা যা হ'ল নৃশংসতা। সংস্কার হ'ল তাহলে যাদুবিদ্যা এবং সর্বপ্রাণবাদের সমষ্টিগত একটি পদ।

পঞ্চম সংজ্ঞা অনুযায়ী, সংস্কার হ'ল যে কোন বিশ্বাস অথবা আচার যা নাকি খ্রীস্টান, ইহুদী, ইসলাম অথবা বৌদ্ধ ধর্মের মত বিখ্যাত এবং সুসংহত ধর্মগুলির দ্বারা অনুমোদিত নয়।

ষষ্ঠ সংজ্ঞায় বলা হ'ল—সংস্কার আমাদের নিজেদের থেকেও অনেক বেশী প্রাচীন চিন্তাধারার জীবন্ত ধ্বংসাবশেষ, যেগুলি একদা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মহিমায় অধিষ্ঠিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে যা পরিত্যক্ত এবং বিস্মৃত।

সপ্তম সংজ্ঞা অনুযায়ী—সংস্কার হ'ল সেইসব বিশ্বাস যেগুলি সর্বান্তঃকরণে গৃহীত নয়; আসলে এগুলি হ'ল কতকগুলি আচার যেগুলি অনুসৃত হয় দৃঢ়-বিশ্বাস ব্যতিরেকে, যেগুলি অনুসৃত হলে তা কোনরকম ক্ষতিকারক হবে না, পরন্তু দৈবক্রমে সেগুলির দ্বারা সুফলও লাভ করা যেতে পারে—এই মানসিকতায়।

এইবার উদ্ধৃত সংজ্ঞাগুলি কতখানি গ্রহণযোগ্য দেখা যেতে পারে। প্রথম সংজ্ঞাটিতে লক্ষ্য করা যায় যে অমূলক বিশ্বাসকেই সংস্কার বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিশ্বাস এবং সংস্কারের প্রভেদকে স্বীকার করা হয়নি। অথচ আমরা জানি যে যা লোক-বিশ্বাস তাই লোক-সংস্কার নয়। বিশ্বাস এবং সংস্কারের মধ্যে রয়েছে একটা সুস্পষ্ট পার্থক্য। শুধু তাই নয়, এই সংজ্ঞাটিতে ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে সংহত সমাজের বিশ্বাসের মধ্যেও কোন পার্থক্য দেখান হয় নি। সংজ্ঞাটিতে কেবলমাত্র গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বিচারশক্তি শূন্যতা বা অযৌক্তিকতার ওপর। সংস্কারের এ'টি অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হলেও কেবল এই বৈশিষ্ট্যটিই সংস্কারের মূল কথা নয়। তাই প্রথমটিকে আমরা ত্রুটি মুক্ত এবং সংস্কারের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয়বাহী সংজ্ঞা হিসাবে স্বীকার করতে পারি না।

দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিতে দেখা যায় অধ্যাপক হীথ,বিশ্বাস কখন গ্রহণযোগ্য হতে পারে সেই সম্পর্কে উল্লেখ করে বিপরীতক্রমে বিশ্বাস কখন সংস্কারে পরিণত হয় তার

ইঙ্গিত দিয়েছেন এবং এক্ষেত্রে বিশ্বাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বৈষম্যগুলির ওপরেই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সংস্কারের ক্ষেত্রে বৈষম্যই কিন্তু প্রধান ব্যাপার নয়। কারণ এমন অনেক সংস্কার প্রচলিত রয়েছে যে সংস্কারগুলির মধ্যে একটা গভীর ঐক্যের সন্ধান লাভ দুর্লভ নয়। বরং বলা চলে সংস্কারের ক্ষেত্রে ঐক্য যেমন একটা লক্ষণীয় দিক, বৈষম্যও তেমনি একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। তাছাড়াও এর সঙ্গে ঐতিহ্য, ঐহিক কল্যাণ লিপ্সা প্রভৃতি ব্যাপার-গুলিও যুক্ত। কিন্তু অধ্যাপক হীথ প্রদত্ত সংজ্ঞায় সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লিখিত হয়নি।

মার্টিন লিঙ্গস্ প্রদত্ত তৃতীয় সংজ্ঞায় সংস্কারের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। সংস্কার সুপ্রাচীন, অতীত কাল থেকেই তা চলে আসছে এবং বর্তমানে তা প্রচলিত থাকলেও লোকে সেগুলি না বুঝেই মেনে চলে। একথা ঠিকই যে সংস্কারের মধ্যে একটা প্রাচীনতা থাকে এবং সাধারণভাবে লোকে না বুঝেই সংস্কারগুলি মেনে চলে। সংক্ষেপে বর্ণিত সংস্কারের এই সংজ্ঞাটি অনেক-খানি গ্রহণযোগ্য হলেও সর্বাংশে নয়। কারণ সংস্কারের সার্বিক পরিচয়টুকু এই সংজ্ঞাটিতেও উপস্থাপিত হয়নি। তাছাড়া সংস্কারের অনুসরণের এবং বোধ-গম্যতার বিষয়ে উল্লেখ করা হলেও কি অনুসরণ করা হয়ে থাকে নির্দিষ্টভাবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। কৌশলে সেই বিষয়টিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।

চতুর্থ সংজ্ঞায় কার্ভেথ রীড সংস্কারের মোটামুটি একটা গ্রহণযোগ্য রূপ দিয়েছেন এবং উদ্ধৃত অন্যান্য সংজ্ঞাগুলির তুলনায় এ'টি অনেকখানি ত্রুটিমুক্ত স্বীকার করতে হয়। সর্বপ্রাণবাদ ও যাদুবিদ্যার সমন্বিত রূপকেই সংস্কার বলে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে সংস্কারের মূল যে ভিত্তিহীন বিশ্বাস তাতে সন্দেহ নেই। তাছাড়া এগুলিকে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা সংক্রান্ত বলেও স্বীকার করে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু একটি বিষয়ে আমরা কার্ভেথ রীডের সঙ্গে একমত নই। তা হ'ল সংস্কার মাত্রই তা নৃশংস কিংবা সামাজিক ভাবে তা ক্ষতিকারক হবেই এমন কথা বলা যায় না। আসলে এক্ষেত্রে সংস্কারের মন্দ দিকটির প্রতিই নির্দেশ করা হয়েছে। কিন্তু সংস্কারেরও যে একটা ভাল দিক আছে, সেটিকে এক্ষেত্রে অস্বীকার করা হয়েছে। আসলে আমরা বাংলা ভাষায় সংস্কারকে যেমন 'সু' এবং 'কু' এই দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দেখি, ইংরিজী 'superstition' শব্দটিতে তা বোঝায় না, কেবল মন্দ দিকটিকেই ইঙ্গিত করা হয়। সেইজন্যেই এই ত্রুটিটি ঘটে গেছে।

পঞ্চম সংজ্ঞায় সংস্কার ধর্মীয় ব্যাপারের অঙ্গীভূত নয় বলে বলা হয়েছে। কিন্তু এই দৃষ্টিভঙ্গী মোটেই যথার্থ নয়। অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মবোধ থেকেও সংস্কারের উৎপত্তি ঘটেছে লক্ষ্য করা যায়। অবশ্যই এমন অনেক সংস্কারও আছে, যেগুলি ধর্মীয় প্রসঙ্গ বহির্ভূত। তাছাড়া সংজ্ঞাটিতে বিশেষ কয়েকটি ধর্মের অননুমোদিত বিশ্বাস এবং আচারকেই সংস্কার বলে অভিহিত করা হয়েছে। আলেকজাণ্ডার এইচ ক্রাপের বক্তব্য অনুযায়ী খ্রীস্টান, ইহুদী, ইসলাম এবং বৌদ্ধ ধর্মের মত প্রধান ধর্মগুলির অনুমোদিত আচার এবং বিশ্বাস সংস্কার পর্যায়ভুক্ত নয়। এক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টতঃই একদেশদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন স্বীকার করতে হয়। ধর্মীয় গোঁড়ামি এক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীন দৃষ্টিভঙ্গীকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। তাই তাঁর উল্লিখিত ধর্মগুলি ব্যতীত অন্যান্য ধর্মের অনুমোদিত আচার এবং বিশ্বাসকে 'সংস্কার' বলে প্রতিপন্ন করতে প্রয়াসী হয়েছেন তিনি। অথচ যে ধর্মগুলির উল্লেখ তিনি করেছেন, সেই ধর্মগুলি থেকেও খুব কম সংস্কারের উদ্ভব ঘটেনি।

ষষ্ঠ সংজ্ঞাটিতে খ্রীস্টিনা হোল প্রাচীন চিন্তাধারার জীবন্ত ধ্বংসাবশেষ বলে সংস্কারের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এক্ষেত্রে বক্তব্য হ'ল সংস্কার মূলতঃ প্রাচীন কালে উদ্ভূত হলেও, আধুনিক কালে পরিবর্তিত সমাজ ব্যবস্থাতেও সংস্কার উদ্ভূত হতে দেখা যায়। তাছাড়া বহু সংস্কারের মূল আজকের দিনে অজ্ঞাত কিংবা বিস্মৃত হলেও সম্পূর্ণভাবে সমস্ত সংস্কারই বিস্মৃত এবং বিশেষত বর্তমানে পরিত্যক্ত এমন কথা স্বীকার করা যায় না।

সপ্তম সংজ্ঞাটিতে প্রচলিত সংস্কার অনুসৃত না হলে কিরকম এক অস্বস্তিকর মানসিকতা হয় সেই দিকটির প্রতি উপযুক্ত ইঙ্গিত করা হলেও সংস্কারগুলি অনুসৃত না হলে সংস্কার বিশ্বাসী মানুষ যে ক্ষতির আশংকা করে থাকে, যে কারণে সংস্কার অনুসৃত না হলে অস্বস্তিকর মানসিকতার উদ্ভব হয়, সে বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হয়েছে। অর্থাৎ সংস্কার সংক্রান্ত সংজ্ঞাগুলিতে কমবেশি সংস্কারের এক একটি দিককে পরিস্ফুট করা হলেও সর্বাংশে গ্রহণযোগ্য এবং ত্রুটিমুক্ত এমন কোন একটি সংজ্ঞার সাক্ষাৎ লাভ করা যায় না।

এইবার আসা যাক লোক-বিশ্বাসের সংজ্ঞায়।

কার্ভেথ রীড বিশ্বাস প্রসঙ্গে মন্তব্য করে বলেছেন :

"The attitude of mind in which perceptions are regarded as real judgement as true or matters fact actions and events

as about to have certain results. It is a series and respect-ful attitude; for matter of fact compels us to adjust our behaviour to it, whether we have power to alter it or not." 'Man and his superstitions'—Page 6 : 2nd Edition.

আবদুল হাফিজ লোক-বিশ্বাস প্রসঙ্গে বলেছেন—'একটি বিশ্বাস একজন নিরক্ষর ব্যক্তির মনে যতক্ষণ অবস্থান করে, ততক্ষণ তা লোক-বিশ্বাসই বটে।' 'লৌকিক সংস্কার ও মানব-সমাজ' ; পৃঃ ৬১

প্রথম সংজ্ঞাটিতে বিশ্বাসের স্বরূপটির অনেকখানিই পরিস্ফুট হয়েছে, বিশেষত কোন মানসিক অবস্থায় এবং কেমন করে মানুষের মনে বিশ্বাস তার স্থান করে নেয় তার সুস্পষ্ট পরিচয়টুকু বিধৃত। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হাফিজ যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হয়। কারণ সংহত সমাজের মানুষের মনে স্থান না করে নিতে পারলে বিশ্বাস কখনও লোক-বিশ্বাসে পরিণত হতে পারে না! ব্যক্তিগত বিশ্বাসের সঙ্গে লোক-বিশ্বাসের মূল পার্থক্য এইখানেই। তাছাড়া লোক-বিশ্বাস যে নিরক্ষর ব্যক্তির মনেই অবস্থান করে, অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন তথাকথিত শিক্ষিতজনের মনে অবস্থান করেনা এমন কথাও যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ বিশ্বাসই হোক আর সংস্কারই হোক উভয়ক্ষেত্রেই মূলতঃ যুক্তির বন্ধনকে অস্বীকার করা হয়। যেখানে যুক্তির বাধ্য-বাধকতা থাকে না সেখানে অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন কি সে নিরক্ষর সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে পড়ে।

২. পার্থক্য : লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

এইবার আমরা লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের পার্থক্য নিয়ে আলো-চনায় প্রবৃত্ত হতে পারি।

ইংরিজী 'Folk belief' শব্দটিকে বাংলায় translation loan-এর মাধ্যমে করা হয়েছে লোক-বিশ্বাস। কিন্তু অনেকেই ইংরিজী 'Superstition' শব্দটির প্রতিশব্দরূপে যে'সংস্কার' শব্দটিকে ব্যবহার করে থাকেন, তা যথার্থ নয়।

কারণ আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে সংস্কারের ভাল মন্দ দু'দিকই আছে। কিন্তু 'Superstition' বলতে বিশেষভাবে সংস্কারের মন্দদিকটিকেই বোঝান হয়ে থাকে। সে যাই হোক, এখন প্রশ্ন হ'ল লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার বলতে কি বোঝায়? আপাতভাবে মনে হতে পারে যে লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার দুই-ই এক। আভিধানিক অর্থের বিচারে অবশ্য দুইই এক—বিশ্বাস এবং সংস্কার উভয়েরই অর্থ হল প্রত্যয়। গুণগত বিচারে (Qualitatitively) উভয়ই এক হলেও বলা যায় পরিমাণগতভাবে (Quantitatively) কিছু পার্থক্য দুইয়ের মধ্যে রয়ে গেছে। সংহত এক জনসমষ্টি যে বিশেষ বিশেষ আচার আচরণ এবং ক্রিয়াদিকে কর্তব্য-অকর্তব্য বলে বিবেচনা করে, যেগুলির সঙ্গে শুভাশুভ বোধ জড়িত, তাই হ'ল লোক-বিশ্বাস। লোক-বিশ্বাসের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক খুবই কম, নেই বললেই চলে। কিন্তু লোক-সংস্কার হ'ল সেইসব আচার-আচরণ এবং ক্রিয়াকলাপ যেগুলি পালনীয় কিংবা বর্জনীয় বলে সংহত জনসমষ্টি শুধু বিশ্বাস করে না, ব্যবহারিক জীবনে তা মেনেও চলে। লোক-সংস্কারের সঙ্গে ঐতিহ্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। লোক-বিশ্বাস খুব সাম্প্রতিক কালের হতে পারে বা হয়ও। কিন্তু লোক-সংস্কারের মূল থাকে গভীরে। পুরুষানুক্রমে যা বিশ্বস্তভাবে অনুসৃত হয়ে থাকে। লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার উভয়েরই মূলে কাজ করে মূলতঃ ঐহিক শুভাশুভ বোধ। তবে লোক-বিশ্বাস যেক্ষেত্রে একান্তভাবে একটা ধ্যান-ধারণা মানসিক ক্রিয়া মাত্র, সেক্ষেত্রে লোক-সংস্কারের সঙ্গে কিছু আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। লোক-সংস্কারের উৎপত্তির মূলে অনেকক্ষেত্রেই ধর্মবোধ বা শাস্ত্রনির্দেশও কাজ করে।

লোক-বিশ্বাস অনুসৃত না হলেও তেমন কোন মানসিক প্রতিক্রিয়া হয় না সংহত সমাজের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক মানুষের ক্ষেত্রে। কিন্তু লোক-সংস্কার অনুসৃত তথা পালিত না হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটা বিরূপ মানসিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। বলাবাহুল্য যে প্রতিক্রিয়া মানসিক ভয় এবং অস্বস্তিবোধ সঞ্জাত।

ব্যক্তিবিশেষের বিশ্বাস অথবা সংস্কারের সঙ্গে লোক-বিশ্বাস বা লোক-সংস্কারের যে পার্থক্য আছে সে উল্লেখ আগেই করা হয়েছে, তবু একটু বিশদভাবে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার প্রয়োজনীয়তা আছে।

একজন মনস্তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগত বিশ্বাস—সংস্কারের সঙ্গে লোক-বিশ্বাস ও সংস্কারকে এক করে দেখার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন :

'There are beliefs and practices individuals have come to adopt by and for themselves, usually without communicating them to others. They must not be confused with socially shared superstitions applied to a particular person.

People may have their own private lucky or unlucky colours, days, objects or places. They may perform certain ritual acts in order to ensure success in their undertaking or ward off some danger.' Gustav Jahoda ; The psychology of superstitions' ; Page 15.

আমরা ব্যক্তিগত ভাবে সকলেই চাই জীবনে সাফল্য, চাই অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে। তাই বাঞ্ছিত সাফল্য লাভের জন্যে আমরা নানা ক্ষেত্রেই বেশ কিছু বিশ্বাস, বিশেষত সংস্কারের বশবর্তী হয়ে পড়ি। বিশেষ একটি জামা পরে বেরোলে কার্যসিদ্ধি হয় বলে বিশ্বাস করি, আর তাই সম্ভবমত সকল গুরুত্বপূর্ণ কাজে বেরোবার আগে সেই বিশেষ জামাটি গায়ে চড়াই। চাকরীর ইন্টারভিউ দিতে, পরীক্ষায় বসতে, এমন কি নিজের প্রিয় দলের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ঐ বিশেষ জামাটি পরে উপস্থিত হই। কিংবা কোন একটি-দু'টি কাজে আকস্মিকভাবে যার মুখ দেখে বাড়ী থেকে বের হয়ে সেই কাজে সাফল্যলাভ ঘটেছিল, পরবর্তীকালে সব কাজেই বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ কাজে সেই ব্যক্তিটির মুখ দেখে বের হতে সচেষ্ট হই। কিংবা বিপরীত ক্রমে যার মুখ দেখে বেরিয়ে দু'টি একটি কাজে অসাফল্য ঘটে গিয়েছিল পরবর্তীকালে পারতপক্ষে কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে বের হবার সময় তার মুখ যাতে দেখতে না হয় সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করি। বহু জকি (Jockey) ঘোড়দৌড়ে অংশ গ্রহণের আগে বিশেষ টুপি পরে নেন, কারণ সেই টুপিটি তার কাছে সৌভাগ্যের প্রতীক ; অনেক ক্রিকেট খেলোয়াড়কে দেখা যায় বিশেষ ব্যাট বা বুট্ ব্যবহার করতে ঐ একই উদ্দেশ্যে। অনেক ফুটবল খেলোয়াড় খেলার প্রারম্ভে গোল পোস্ট স্পর্শ করেন, সংস্কার, এর ফলে খেলায় বাঞ্ছিত ক্রীড়া-নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রাখতে পারবেন, খেলায় জয়ী হবেন। এমনকি অনেক খেলোয়াড় তাঁদের স্ত্রীকে তাঁদের খেলা টি. ভি.-তে দেখতে দেন না। সংস্কার, স্ত্রী খেলা দেখলে তার খেলা ভাল হবে না। যে ক্রিকেট খেলোয়াড় একটি বিশেষ ব্যাটে ব্যাট করে গুরুত্বপূর্ণ সেনচুরী করেন, তার মনে এইরকম একটা ধারণা গড়ে ওঠে যে ঐ ব্যাটটি তার পক্ষে অত্যন্ত

শুভ। অতএব এই বিশেষ ব্যাট দিয়েই তিনি প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ খেলা খেলতে চান। কিন্তু যে ব্যাটটি একজন বিশেষ ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কাছে অত্যন্ত সৌভাগ্যের বলে আদরণীয়, সব ক্রিকেট খেলোয়াড়ের কাছেই কি সেই বিশেষ ব্যাটটি সমান সৌভাগ্যের এবং আদরণীয় বলে পরিগণিত হবে? এর উত্তর আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু একই ভৌগোলিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক পরিবেশে একই রূপ আচার আচরণ ও জীবনচর্চায় অভ্যস্ত সংহত জনসমষ্টির মধ্যে যা বিশ্বাস অথবা সংস্কার বলে গৃহীত হয়, তাই হ'ল লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার। পৈতৃক সম্পত্তির মত এই বিশ্বাস এবং সংস্কার সংহত জনসমষ্টি বিনা দ্বিধায় এবং বিচারে গ্রহণ করে ও অনুসরণ করে চলে। যেমন একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যায়। বাড়ী থেকে যাত্রা করার সময় কেউ হাঁচলে যাত্রায় বাধা পড়ে বলে বিশ্বাস। এক্ষেত্রে এই বিশ্বাসটি ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, সমষ্টিগত। আর সেই বাধা অতিক্রমণের জন্যে যাত্রা করতে উদ্যত ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করা আর হয় না। এক্ষেত্রে এই অপেক্ষা করা ব্যাপারটি সংস্কারের অন্তর্গত, আর বলা বাহুল্য এ সংস্কার ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, লোক-সংস্কারের অন্তর্গত। কারণ এই সংস্কারের অংশীদার সংহত সমাজ। ব্যক্তি বিশেষের বিশ্বাস বা সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী হয় না, কিন্তু লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার দীর্ঘস্থায়ী। ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা সংস্কার ব্যক্তির নিজস্ব আবিষ্কার, কিন্তু লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার সংহত সমাজের আবিষ্কার। আর সমাজের মানুষ মাতৃস্তন দুগ্ধ পানের সঙ্গে সঙ্গে এগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে এবং আয়ত্ত করে। অর্থাৎ শেষোক্ত ক্ষেত্রে ঐতিহ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে স্বীকার করতে হয়।

লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার উভয় ক্ষেত্রেই মূল কথা হ'ল বিশেষ কার্য বা ক্রিয়ার একটি সুনির্দিষ্ট কারণের অনুসন্ধান। সেদিক দিয়ে বলা চলে মানুষের বিজ্ঞান চেতনার প্রথম স্ফূরণ ঘটে লোক-বিশ্বাস, বিশেষত লোক-সংস্কারে। কারণ বিজ্ঞান আমাদের প্রথম যে পাঠ দেয় তা হ'ল—জাগতিক ব্যাপারে আকস্মিকতার কোন স্থান নেই। প্রতিটি কার্যই সুনির্দিষ্ট কারণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আমরা একটু তলিয়ে দেখলেই জানতে পারি যে লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারে মানুষের এই কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণের প্রয়াসই মুখ্য হয়ে উঠেছে। অবশ্য একথা ঠিকই যে সেই কার্য-কারণ সম্পর্ক বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত নয়। সংহত সমাজের মানুষ তাদের অভিজ্ঞতা এবং সাধারণ বুদ্ধি

তথা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করেই কার্য-কারণ সম্পর্ক নিরূপণে ব্রতী হয়েছে।

লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার উদ্ভবের মূলে কারণানুসন্ধানের প্রয়াস থাকলেও পরবর্তীকালে যারা এগুলি অনুসরণ করে, তাদের মধ্যে কিন্তু অন্ধ-বিশ্বাস এবং আনুগত্যের মনোভাবই ক্রিয়াশীল হয়ে থাকে। লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের সংগে আমাদের ঐহিক শুভাশুভের কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং থাকলে তার পরিমাণ কতখানি, সেই বিষয়টিকে আপাতত বাদ দিলেও একথা ঠিক যে মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে বিশ্বাস এবং সংস্কারের মূল্য অনেকখানি। যেমন সংহত সমাজে যা নাকি শুভ বলে চিহ্নিত, যা দেখে গৃহ থেকে যাত্রা করলে যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় বলে বিশ্বাস, সেই বস্তু বা প্রাণীর দর্শনে মানুষ অনেকখানি বল পায়, যে বল তাকে অভীষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে বহুলাংশে সহায়তা করে। আবার বিপরীতক্রমে যা অশুভ বলে স্বীকৃত সেই বস্তু বা প্রাণীর দর্শনে মানুষের মনে এমন এক বিপরীত ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় যার ফলে তার আত্মবিশ্বাস অনেকাংশে বিনষ্ট হয়ে যায়। সাফল্য লাভের পথে তা গুরুতর অন্তরায় হয়ে দেখা দিতে পারে বা দেয়ও।

লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল একই উদ্দেশ্যে বা একই পরিণামের ব্যাপারে স্থানভেদে অনেকগুলি কারণ বা আচরণের কথা বলা হলেও একই সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত আচরণীয় প্রথার মধ্যে স্থান কালভেদে তেমন ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায় না; দেশভেদে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ভিন্নতা লক্ষিত হয়। একই বিশ্বাস বা সংস্কারের ক্ষেত্রে ইতর-বিশেষ যেটুকু পার্থক্য ঘটেছে তা খুবই সামান্য বলা চলে। একটু বিস্তারিত করে বলতে গেলে বলতে হয় যে লোক-সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা যেমন ছড়া, গীতিকা, গান ইত্যাদির ক্ষেত্রে পাঠান্তর যেমন সুলভ, লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের ক্ষেত্রে সেইরকম মতান্তর তেমন সুলভ নয়। যেমন কোন্ কোন্ দিনে যাত্রা নাস্তি, কিংবা কি কি দেখে যাত্রা করলে যাত্রা শুভ হয় না, অথবা কি কি কারণে অতিথির আবির্ভাব ঘটার সম্ভাবনা, ঝগড়া অথবা ঋণ কি কি কারণে হয়, এই সব বিষয়ে নানা বিশ্বাস, নানা স্থানে সংস্কার প্রচলিত আছে। কিন্তু একটি পরিণামের সঙ্গে যুক্ত নির্দিষ্ট কারণ বা আচরণটি স্থান ভেদে রূপান্তরিত বা আমূল পরিবর্তিত হতে তেমন দেখা যায় না।

৩. লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের উৎপত্তি

ঠিক কবে থেকে লোক-বিশ্বাস অথবা লোক-সংস্কারের উৎপত্তি সঠিকভাবে সে সম্বন্ধে কিছু বলা না গেলেও এটুকু বলা যায় যে কর্ণের সহজাত কবচকুণ্ডলের মতই সংস্কার এবং বিশ্বাস মানুষের আদিম অবস্থা থেকেই তার অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে চলে আসছে। এবং আধুনিক যুগেও এ ব্যাপারে ব্যতিক্রম ঘটেনি। অনেকের মনে এরকম একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে সংস্কার প্রধানতঃ নিরক্ষর লোক সমাজে (Non Literate Society) ও অল্পাধিক পরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত সমাজেই (Civilized and Literate) প্রচলিত তা কিন্তু যথার্থ নয়। এ ব্যাপারে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত কিংবা অক্ষর জ্ঞান সম্পন্ন অথবা নিরক্ষরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এখন প্রশ্ন হ'ল সংস্কারের উৎপত্তি হল কিভাবে? আদিম যুগের মানুষের এটা জানা ছিল যে কোন কিছুই অকারণে ঘটেনা। সব কিছুর পেছনেই একটা সুনির্দিষ্ট কারণ কাজ করে। তবে আধুনিক যুগে যাকে আমরা কার্য-কারণ সম্পর্ক বলে অভিহিত করি, আদিম যুগের মানুষ কাকতালীয়—ঘটনার মধ্যেই সেই কার্য-কারণ সম্পর্ককে প্রত্যক্ষ করেছিল। আদিম মানুষকে প্রধানতঃ দু'টি ব্যাপারে সদা সতর্কতা অবলম্বন করতে হ'ত—ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যে শিকারের সন্ধান আর শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা। বলাবাহুল্য এতটুকু অসতর্কতার ফলে উভয় ক্ষেত্রেই 'শিকার হাত-ছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল, নতুবা সম্ভাবনা ছিল মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার। এই জন্যে আদিম মানুষের সদাজাগ্রত দৃষ্টিকে এড়াতে পারত না অন্যের পদচিহ্ন, গাছের ভাঙ্গা ডালপালা, খাদ্যের উচ্ছিষ্টাংশ, অথবা বসতির কোন চিহ্ন, পশুর বিষ্ঠা বা পাখীরপালক। শুধু শ্রবনেন্দ্রিয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হওয়া নয়, সেই সঙ্গে আদিম মানুষের অপরাপর ইন্দ্রিয়গুলিও সজাগ থাকত অন্যান্য নানা ব্যাপারে। যেমন কলরব বা সুগন্ধ-দুর্গন্ধ তার শ্রবনেন্দ্রিয় বা ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে সহজেই আকৃষ্ট করত। এইভাবে সুদূর প্রাচীন কালের আদিম মানুষ তার পরিচিত সীমাবদ্ধ জগতের সর্বত্র সদা জাগ্রত দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে নানাবিধ সঙ্কেত বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ কোন পাখীর স্তব্ধ হওয়া, আকাশের দিকে তাকিয়ে মাথার ওপর কোন শকুনকে প্রত্যক্ষ করা, যাত্রা পথের ওপর দিয়ে খর-গোসের চলে যাওয়া, প্রবহমান বাতাসের দিক পরিবর্তন—এই রকম শত-সহস্র

সঙ্কেতের সঙ্গে মানুষ ক্রমে ক্রমে তার ব্যক্তিগত শুভাশুভকে যুক্ত করে ফেলে। ক্রমে ক্রমে আদিম মানুষ তার প্রত্যক্ষ করা সঙ্কেত গুলিকে সম্ভবতঃ দু'টি ভাগে বিভক্ত করে দেখতে শেখে। যেমন শিকারের পদচিহ্ন, সোয়ালো পাখীর (Swallo) প্রত্যাবর্তন, ভেকের কর্কশ শব্দ ইত্যাদি—এই সব সঙ্কেতের অনিবার্য পরিণাম হিসাবে আদিম মানুষ লক্ষ্য করত হয় খাদ্য প্রাপ্তির উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে, নতুবা বসন্ত ঋতুর পুনরাবির্ভাবকে। বারংবার একইরূপ অভিজ্ঞতা হওয়ার ফলে আদিম মানুষ এইসব সঙ্কেতগুলিকে কয়েকটি বিশেষ পরিণতির কারণ হিসাবে গণ্য করতে শেখে। অপর পক্ষে দ্বিতীয় পর্যায়ের সঙ্কেতগুলির মধ্যে ছিল—আকাশে বিদ্যুতের চমকানি, নক্ষত্রের স্খলন, ভূমিকম্প ইত্যাদি। এইসব সঙ্কেত প্রত্যক্ষ করার পর হয়ত আদিম মানুষ শিকারে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়, শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত হবার অনভিপ্রেত অভিজ্ঞতা অর্জন করে, কিংবা তার গোষ্ঠীভুক্ত কারোর মৃত্যু ঘটে। যদিও এসব ক্ষেত্রে উল্লিখিত সঙ্কেত এবং পরিণামে আদিম মানুষের অভিজ্ঞতা অর্জনের মধ্যে কোন যোগসূত্র ছিল না, তথাপি আদিম যুগের মানুষ উভয়ের মধ্যে একটা কার্য-কারণ সম্পর্ককে কল্পনা করে নেয়। এই শেষোক্ত শ্রেণীর সঙ্কেত গুলিই সংস্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উৎস রূপে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীকালে মানুষ যতই সভ্য এবং উন্নত হতে থাকে, ততই বিভিন্ন পরিণামের সঙ্গে তার কল্পিত কারণগুলির যোগাযোগকে স্পষ্টতর করে নিতে থাকে। আবহাওয়া, মৃত্যু কিংবা শস্য উৎপাদন অথবা রোগে আক্রান্ত হওয়ার মতন ব্যাপারের কারণ হিসাবে বিভিন্ন শক্তিকে দায়ী বলে বিশ্বাস করে নেয়। শেষপর্যন্ত এর থেকেই সৃষ্ট হয় সর্বাত্মবাদ তত্ত্ব, নৃতত্ত্ব-বিদ্‌গণ যাকে সংস্কার সৃষ্টির মূল বলে অভিহিত করে থাকেন। আদিম মানুষ বিশ্বাস করতো যে ব্যক্তির জীবন ব্যক্তির দেহ মধ্যস্থিত আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, অপর পক্ষে বস্তু বিশ্বের ঘটনাবলী আত্মপ্রকাশ করে আত্মা সম্পন্ন দেব-দেবী বা কোনো বিশেষ শক্তির কারণে। অর্থাৎ সর্বাত্মবাদের প্রথম পর্যায় নিঃশেষিত হয়েছিল ব্যক্তি বিশেষের আত্মার আবিষ্কারে—অপরপক্ষে সর্বাত্মবাদ তত্ত্বটি পরবর্তীকালে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়—বহির্বিশ্বের সমস্ত বস্তুরমধ্যে বিশেষ শক্তির সন্ধানে। এইভাবেই আদিম মানুষ গ্রহ-নক্ষত্র, আকাশ-বাতাস, পাহাড়-পর্বত, নদী-নালা—সব কিছুর মধ্যে একটা না একটা শক্তির অস্তিত্বকে বিশ্বাস করে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, বন্যা,আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, প্রবল বর্ষণ, সূর্যোদয় সূর্যাস্ত সব কিছুতেই বিশেষ শক্তি ক্রিয়াশীল বলে মানুষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। আর

এই অদৃশ্য শক্তিকেই মানুষ বিশেষ কার্য বা ঘটনার কারণ বলে মেনে নেয়।

মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ অবশ্য সংস্কার অথবা বিশ্বাসের মূলে মানুষের মানসিক গঠনকেই লক্ষ্য করেছেন। ফ্রয়েড কিংবা জং-এর মতন মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের ধারণা সংস্কারের মূল মানুষের অসচেতন মানসিক প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত। এঁদের মতে সংস্কার মোটেই অতীতের কোন ব্যাপার নয়, বরং সংস্কার প্রতিটি মানুষের মানসিক গঠনের সঙ্গে অনিবার্য অঙ্গরূপে যুক্ত যা নাকি পরিস্থিতি বিশেষে আত্মপ্রকাশ করে থাকে এই মাত্র।

সংস্কার উদ্ভবের মূলে ধর্মীয় নির্দেশ বা আচার কম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেনি; বস্তুতপক্ষে ধর্মীয় নির্দেশ এবং আচার-আচরণ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সংস্কার সৃষ্টির উৎস। পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ হ'ল বেদ, আবার বেদের প্রাচীনতম অংশ হ'ল ঋক্‌বেদ। কয়েক সহস্র বৎসর পূর্বে রচিত ঋক্‌বেদে আমরা কিছু সংখ্যক সংস্কার অথবা সংস্কারের মূলের সন্ধান পাই। আজও আমাদের সংহত সমাজে এইসব সংস্কারের এবং বিশ্বাসের অনেকগুলিই বেশ বহাল তবিয়তেই বিরাজমান, অথচ এগুলির উৎসের কথা আমাদের অনেকেরই অজানা।

পেঁচার ডাককে অমঙ্গল সূচক বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। বেদে এহেন পেচকের ডাকজনিত অমঙ্গল নাশের জন্য মন্ত্রও রয়েছে—

যদুলুকো বদতি মোঘমেতদ্ যৎ কপোতঃ পদমগ্নৌকৃণোতি।

যস্য দূতঃ প্রহিত এষ এতৎ তস্মৈ যমায় নমো অস্তু মৃত্যবে॥

ঋক্‌সংহিতা ১০ম মণ্ডল। ১৬৫সূক্ত।

পক্ষিদের অমঙ্গল ধ্বনি শুনলে যে নিজের অথবা পরিবারের অকল্যাণ হয়, এ বিশ্বাস বহুকাল ধরেই চলে আসছে। সেইসঙ্গে অমঙ্গল ধ্বনি জনিত অকল্যাণ বিনাশের ব্যবস্থাও রয়েছে। এই প্রসঙ্গে ঋক্‌সংহিতার ২য় মণ্ডল। ৪৩ সূক্তটির উল্লেখ করা যেতে পারে, যেটি সায়ণের মতে পক্ষিদের অমঙ্গল ধ্বনি শ্রবণ করলে জপ করতে হয়। ঐ একই সূক্তের ২ এবং ৩ নং মন্ত্রে শকুনকে মঙ্গল এবং শুভকারক শব্দ করার জন্যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই প্রসঙ্গে ২।৪২।৩ মন্ত্রটিও উল্লেখযোগ্য।

লোক-বিশ্বাস হ'ল পুত্র না থাকলে মানুষ স্বর্গচ্যুত হয়। এর মূলটি হ'ল ঋক্‌বেদের ১।১০৫।৩ মন্ত্রটির সায়ণভাষ্য। অনেকে যদিও সায়ণভাষ্যকে এই মন্ত্রের

অর্থ বলে স্বীকার করেন নি, কিন্তু সায়ণভাষ্যের অনুরূপ বক্তব্য উপনিষদে, ব্রাহ্মণগ্রন্থে এবং পুরাণেও রয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

আমাদের সমাজে ভ্রাতা এবং ভগিনীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ, সহোদর ভাই-বোন তো দূরের কথা, এমনকি মামাতো, পিসতুতো, মাসতুতো, খুড়তুতো কিংবা জ্যেঠতুতো ভাই-বোনের মধ্যেও বিবাহ হয় না। ঋক্‌সংহিতার ১০।১০ সূক্ত। ২,১২ ঋক্‌মন্ত্রে বলা হয়েছে ভ্রাতা-ভগিনীর সঙ্গমে পাপ হয়। ভ্রাতা-ভগিনীর মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হবার ব্যাপারে এই শাস্ত্রীয় সাবধানবাণী অন্যতম কারণ।

কাউকে ডাকতে গেলে সামনের দিক থেকে ডাকা উচিত, পেছন থেকে ডাকা অশুভ বলে বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। এই বিশ্বাসের মূল রয়ে গেছে কৃষ্ণযজুঃ। ১ম খণ্ড। ৭ম প্রপাঠকের ১ম মন্ত্র— "পাক যজ্ঞং বা আহিতাগ্নেঃ পক্ষবঃ উপতিষ্ঠন্তি" ইত্যাদি উপাখ্যানে।

অমাবস্যা ও পূর্ণিমা তিথিতে স্ত্রী সহবাস করলে সামর্থ্যহীন হতে হয়— "নামাবস্যায়াং পৌর্ণমাস্যাং চ স্ত্রিয়মুপেয়াদ যদুপেয়ান্নিরিন্দ্রিয়ঃ স্যাৎ"—কৃষ্ণযজুঃ সংহিতা ; ২য় কাণ্ড ; ৫ম প্রপাঠক ; ৬ মন্ত্র।

পশু বলিদানের সময় বলিদানের জন্য নির্দিষ্ট পশুটির গায়ের রঙও বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বেদে বলা হয়েছে সাদা পশু বলি দিলে সে ক্ষিপ্র স্বর্গ থেকে ফল নিয়ে আসে, কারণ সাদা পশু বায়ু দেবতার অত্যন্ত প্রিয়।—কৃষ্ণযজুঃ ; ২য় কাণ্ড ; ১ম প্রপাঠক ; ১ম মন্ত্র।

সপত্নীদের প্রতি স্বামীকে বিদ্বেষপরায়ণ করে তুলতে এবং বিশেষ এক স্ত্রীর প্রতি স্বামীকে অনুরক্ত করে তোলার ব্যাপারেও বেদে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে বিশেষ তিথিতে একপ্রকার লতা সংগ্রহ করে স্বামীর বালিশের তলায় রেখে দিতে হবে। তাহলেই অভীষ্ট ফললাভ ঘটবে—১০।১৪৫ সূক্ত।

বৃক্ষ ছিন্ন করলে তার থেকে যে লোহিত বর্ণের নির্যাস বের হয়, তা ব্রহ্মহত্যা পাপের অনুরূপ—কৃষ্ণযজুঃ সংহিতা ; ২য় কাণ্ড ; ৫ম প্রপাঠক (বিশ্বরূপাখ্যান)। এখানে আরও বলা হয়েছে, রজস্বলা অবস্থায় যে নারী ভিত্তি ইত্যাদি স্থানে চিত্রাঙ্কন করে সেই নারী কেশশূন্য, কানা, মলিনদন্তযুক্ত পুত্র লাভ করে। রজস্বলা অবস্থায় তৃণাদি ছেদন করলে কুনখযুক্ত পুত্র লাভ ঘটে। আর এই সময় দড়ি পাকালে পুত্র গলায় দড়ি দিয়ে মরে।

যদি কোন ব্যক্তির রোগ নির্ণয় করা সম্ভব না হয় অথচ সেই ব্যক্তি ক্রমেই হীনবল এবং কৃশ হয়ে যায়, তবে এক্ষেত্রে চিররোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রজাপতির

উদ্দেশে শৃঙ্গরহিত বৃষ অর্পণ করতে হয়। এক্ষেত্রে যুক্তি হ'ল সকল পুরুষ প্রজাপতি থেকে সৃষ্ট। তাই চিকিৎসকের অজ্ঞাত হলেও সেই অজ্ঞাত রোগটি প্রজাপতির জ্ঞাত। প্রজাপতি তাই এক্ষেত্রে রোগাগ্রস্ত ব্যক্তিকে রোগমুক্ত করেন—কৃষ্ণযজুঃ, ২য় কাণ্ড ; ১ম প্রপাঠক ৬-১৬ মন্ত্র।

বৈদিক প্রথায় অনুষ্ঠিত অন্ত্যেষ্টিতে মৃতের দু'হাতে দু'টি পশুর হৃদ্‌পিণ্ডকে দেওয়া হয় তারপর যথানিয়মে মৃত ব্যক্তিকে অগ্নিসংযোগ করা হয়। বিশ্বাস হ'ল মৃত ব্যক্তিটি যখন যমের কাছে উপস্থিত হবে তখন যমের দরজার কাছে পাহারারত চারটি করে চক্ষুবিশিষ্ট এবং বিশাল নাকের অধিকারী দু'টি কুকুর তাকে ছিঁড়ে খাবার জন্যে তেড়ে আসবে। মৃত ব্যক্তি তখন হৃদ্‌পিণ্ড দু'টি তাদের দিয়ে নির্বিঘ্নে যমের কাছে যেতে পারবে। ঋক্‌সংহিতা ১০ম মণ্ডল ; ১৪ সূক্ত। ১১-১২ মন্ত্র।

এইভাবে আমাদের দেশের বহু সংস্কার এবং বিশ্বাস ধর্মীয় নির্দেশ অথবা আচার থেকে উদ্ভূত হয়েছে। কেবল আমাদের দেশে অথবা সমাজেই নয়, পৃথিবীর সমস্ত দেশের সংস্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই সেই দেশের আচরণীয় ধর্মের এক গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে স্বীকার করতে হয়।

ধর্মীয় পৌরাণিক কাহিনীও অসংখ্য সংস্কার সৃষ্টির মূলে কাজ করেছে। যেমন, মেয়েদের ঘরের বাইরে গিয়ে ভিক্ষা দিতে নেই। আমরা জানি জনক-দুহিতা ও রামচন্দ্র-পত্নী সীতা ঘরের বাইরে গিয়ে লঙ্কাধিপতিকে ভিক্ষা দিতে গিয়েই রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হয়েছিলেন। প্রথমোক্ত সংস্কারটি এই ঘটনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। অথবা কোন মেয়ের নাম সীতা বা জানকী রাখতে নেই। কারণ রামায়ণে বর্ণিত সীতাকে সারাটি জীবন দুঃখেই অতিবাহিত করতে হয়েছিল। তাই থেকেই সংস্কার সৃষ্টি হয়েছে যে সীতা নাম গ্রহণকারিণী মাত্রকেই জীবন ব্যাপী দুঃখিনী হতে হবে। সংস্কার হ'ল এলোচুলে ভিক্ষা দিতে নেই, দিলে সীতার দশা হয়। বলাবাহুল্য সংস্কারটি মহিলাদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। সীতা নাকি এলোচুলে ভিক্ষে দিয়েছিলেন, আর তার ফলেই রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হন। খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁটাবার আগে কাঠি থেকে একটু অংশ ভেঙ্গে ফেলে দিত হয়। এই ভেঙ্গে ফেলা অংশ রাবণের চিতা জলতে সাহায্য করে। এই সংস্কারটির মূলেও রয়েছে পৌরাণিক ঘটনার প্রভাব। রাবণ লঙ্কার যুদ্ধে রামচন্দ্র কর্তৃক নিহত হবার পর শ্রীরামচন্দ্র রাবণ-মহিষী মন্দোদরীকে বর দিয়েছিলন যে তিনি কখনও বৈধব্যদশা ভোগ করবেন না।

সংস্কার হ'ল স্বামীর চিতার আগুন না নেভা পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোকের বৈধব্যদশা ঘটেনা। এর থেকেই খড়কে কাঠির অংশ ফেলার সংস্কারটি উদ্ভূত।

কাঠবিড়ালী হত্যা করলে ব্রহ্মহত্যার পাপে লিপ্ত হতে হয় বলে সংস্কার। শ্রীরামচন্দ্রের লঙ্কাভিযানের সময় সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণের কাজে কাঠবিড়াল তার সীমিত সামর্থ্য নিয়ে সহায়তা করেছিল। সেইজন্যে শ্রীরামচন্দ্রের আশীর্বাদ-ধন্য এই প্রাণীটি। শ্রীরামচন্দ্রের নির্দেশেই কাঠবিড়াল-হত্যা ব্রহ্মহত্যার সমান বলে সংস্কার প্রচলিত হয়ে আসছে। অগ্রহায়ণ মাসে জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ হয় না। সংস্কার হ'ল রাম সীতার বিবাহ হয়েছিল। তাই অগ্রহায়ণ মাসে, জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ হলে কার্য-কারণ সূত্রে স্ত্রী ও স্বামী পৃথক পৃথক অবস্থান করে।

মাসের প্রথম দিনটি যাত্রার পথে অশুভ, বিশেষত ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে। আর এই সংস্কারের মূলে রয়েছে পৌরাণিক কাহিনী। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে সূর্যের গতিরোধকারী বিন্ধ্য পর্বত গুরু অগস্ত্যের কাছে মাথা নত করেছিল। এদিকে গুরু অগস্ত্যও বিন্ধ্যকে সেই অবস্থায় থাকতে বলে আর ফেরেন নি। সেই থেকে লোক-সংস্কারের সৃষ্টি হয়েছে যে মাসের প্রথম দিনটিতে যাত্রা করলে আর ফেরার সম্ভাবনা থাকেনা।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অষ্টম গর্ভের সন্তান। এই থেকেই উদ্ভূত হয়েছে যে অষ্টম গর্ভের পুত্রসন্তান খুব প্রতিভাবান হয়। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রেও পৌরাণিক কাহিনীর প্রভাব কার্যকরী হয়েছে। বেহুলা-লখিন্দর হ'ল লৌকিক কাহিনী। শ্রাবণ মাসে নাকি বেহুলা-লখিন্দরের বিবাহ হয়েছিল আর সেই রাত্রেই বেহুলা বিধবা হয়েছিলেন, মনসামঙ্গল কাব্যে সেই মর্মন্তুদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এর থেকেই সৃষ্টি হয়েছে শ্রাবণ মাসে বিবাহ নিষিদ্ধ।

পশ্চিমদিকে মাথা রেখে শোওয়া নিষিদ্ধ। এই নিষেধাজ্ঞার মূলেও রয়েছে একটি পৌরাণিক কাহিনী। গণেশের জন্মের পর তাঁকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও দেখতে গেলে গণেশের মুণ্ডু উড়ে যায়। তখন দেবরাজ ইন্দ্রের হাতী ঐরাবতের মাথা কেটে এনে গণেশের মাথায় বসিয়ে দেওয়া হয়। এদিকে দেবরাজের ঐরাবতের মাথা ঠিক করতে দেবরাজ পথ বাতলালেন। তিন ভুবনে লোক পাঠান হ'ল। পশ্চিমদিকে শিয়র করে যে হাতী শুয়ে থাকবে, তার মাথা কেটে এনে ঐরাবতের মুণ্ডহীন দেহে তা বসিয়ে দেওয়া হবে। একটি হাতী পশ্চিমদিকে মাথা করে ঘুমচ্ছিল, শেষে তার মাথাটি কেটে এনে ঐরাবতের মুণ্ডহীন দেহে লাগিয়ে দেওয়া

হ'ল। এই জন্যেই পশ্চিমে শিয়র করে ঘুমান বারণ, তাহলে মাথা যাবার সম্ভাবনা থাকে বলে বিশ্বাস।

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সংস্কার কিভাবে উদ্ভূত হয় তার একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত হ'ল একটি দেশলাই কাঠিতে তিনবার সিগারেট ধরানো উচিত নয় এই সংস্কারটি। সংস্কারটি উদ্ভূত হয়েছে বুয়র যুদ্ধের সময়। সৈন্যদের মধ্যে একজন যখন সিগারেট ধরাত তখন তাতে গুপ্তস্থানে অবস্থানকারী শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হ'ত। দ্বিতীয় জন একই কাঠিতে সিগারেট ধরালে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যরা তাদের লক্ষ্য স্থির করার সুযোগ লাভ করত, আর তৃতীয় জন সিগারেট ধরাতে থাকলে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যরা নির্দিষ্ট স্থান লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করার সুযোগ পেত। স্বভাবতঃই একটি দেশলাই কাঠির তুলনায় সৈনিকের প্রাণের মূল্য অনেকখানি। তদুপরি শত্রুপক্ষীয় সৈন্যরা বিপরীত শিবিরের সৈন্যদের অবস্থান লক্ষ্য করার সুযোগ পেতে পারে—এই কারণে একই দেশলাই কাঠির আগুনে পর পর তিনটে সিগারেট জ্বালানোকে দুর্ভাগ্যের সূচক বলে সংস্কার সৃষ্টি হয়।

৪. সংস্কারের যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা

আপাতভাবে সংস্কারগুলি অর্থহীন বলে মনে হলেও এমন অনেক সংস্কার আছে যেগুলির যুক্তি আমরা অস্বীকার করতে পারি না। তবে যুক্তিগ্রাহ্য সংস্কারগুলির বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রকৃত কারণ গোপন রেখে অন্যবিধ কারণের উল্লেখ। মূলতঃ এসব ক্ষেত্রে অমঙ্গল অথবা অন্য কোন ক্ষতির সম্ভাবনার বিষয়ই উল্লিখিত হয়ে থাকে। এখন প্রশ্ন হ'ল প্রকৃত কারণ এসব ক্ষেত্রে গোপন রাখার কারণ কি? আমরা একটু চিন্তা করলেই বুঝতে পারি যে প্রকৃত কারণ বা উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি সাধারণ মানুষের দ্বারা অনুসৃত বা পালিত হ'ত না। যা অনিশ্চিত, অনির্দিষ্ট—তার প্রতি মানুষের এক প্রকার স্বাভাবিক ভয়মিশ্রিত অনুচিকীর্ষার মনোভাব বিদ্যমান থাকে। সব সংস্কার যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও অনেক সংস্কারই যুক্তিগ্রাহ্য, বিশেষত নিষেধাজ্ঞা সূচক সংস্কারগুলি, কিছু বাস্তব দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমরা তা আলোচনা করতে পারি।

শাঁখ খালি মেঝেয় রাখতে নেই। এর কারণটি হ'ল খালি মেঝেয় শাঁখ রাখলে তা মেঝেয় ঘষে তাড়াতাড়ি ক্ষয়ে যাবার সম্ভাবনা। সেইজন্যেই কোন কিছুর ওপর শাঁখ রাখতে হয়। স্বর্ণালঙ্কার হারান খুবই অমঙ্গলজনক বলে

প্রচলিত। আমরা জানি সোনা অত্যন্ত মূল্যবান ধাতু। তাই স্বর্ণনির্মিত মূল্যবান অলংকার ব্যবহারকারী বা অলংকারের অধিকারী যাতে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন সেইজন্যেই সংস্কারটির উদ্ভব। বলা হয় বালিশে বসতে নেই, বসলে পেছনে ফোঁড়া হয়। আসলে বালিশে বসলে বালিশ ছিঁড়ে যেতে পারে সেই-জন্যে ফোঁড়ার ভয় দেখিয়ে বালিশে বসা বন্ধ করার উদ্দেশ্যে এই সংস্কারটির উদ্ভব। বিবাহিতা নারী এলোচুলে খেতে বসলে স্বামীর পাগল হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে বলে বলা হয়েছে। আসল কারণটি এক্ষেত্রে উহ্য রাখা হয়েছে। কারণটি হ'ল এলোচুলে খেতে বসলে পাতে চুল পড়তে পারে আর তা খাবারের সঙ্গে পেটে চলে যেতে পারে। সেইজন্যেই স্বামী পাগল হয়ে যাবার ভয় দেখিয়ে খাবার সময়ে এলোচুল বাঁধার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। খাওয়ার সময় পাতের তলায় জল ছিটিয়ে তবেই খাবার জায়গা করার কথা বলা হয়েছে। আমরা এর কারণটি সহজেই বুঝতে পারি। পায়ের তলায় অনেক ধুলো-ময়লা থাকতে পারে। কিন্তু জল ছিটিয়ে দিলে সেগুলি আর খাবার পাতে পড়তে পারেনা। এইজন্যেই খাবারের জায়গার তলায় প্রথমে জল ছিটোবার কথা বলা হয়ে থাকে। মেঝেয় কয়লা বা লোহার দাগ টানতে নেই, টানলে ঋণ হয় বলে সংস্কার। এক্ষেত্রে আসল কারণ হ'ল মেঝে যাতে অপরিষ্কার না হয় কিংবা লোহার ঘর্ষণে মেঝে যাতে নষ্ট হয়ে না যায়, সেইজন্যেই ঋণ হবার ভয় দেখিয়ে লোহা বা কয়লার দাগ টানা থেকে নিবৃত্ত রাখা হয়েছে। সন্ধ্যার পর জোনাকি পোকা ধরলে পায়খানা পায়। জোনাকি পোকা পল্লীগ্রামেই দেখা যায়। সহরের মতন পল্লী-গ্রাম আলোকোজ্জ্বল নয়। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে জোনাকি পোকারও তাই একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যাতে সীমিত শক্তিতে হলেও এই ক্ষুদ্র পোকাগুলি নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে আলো দিতে পারে সেইজন্যেই এগুলিকে ধরা বা হত্যা করা নিষেধ করা হয়েছে রাত্রিবেলায় পায়খানা পাবার ভয় দেখিয়ে। তাছাড়া জোনাকির দেহে যে Luci ferin বলে ফসফরাস ঘটিত যৌগ থাকে, তা পেটে গেলে খারাপ। পল্লীগ্রামে রাত্রি বেলায় পায়খানা করা একটা গুরুতর সমস্যার ব্যাপার, সেই সমস্যার কথা মনে রেখেই এক্ষেত্রে সংস্কারটি গড়ে উঠেছে। চৌকাঠে বসার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। চৌকাঠে বসলে লোকজনের যাতায়াতে অসুবিধা হয়। সেই অসুবিধা দূর করতেই এই সংস্কারটির উদ্ভব। বঁটি খাড়া করে রাখতে নেই। রাখলে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা নাকি কাটা যায়। আসলে খাড়া বঁটিতে কেটে যাবার বা দুর্ঘটনা

ঘটার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করতেই এই সংস্কারটির সৃষ্টি। রজ্জুবদ্ধ যে গরু তার দড়ি ডিঙ্গোতে নেই। স্পষ্টতঃই এক্ষেত্রে গরুর গলায় বাঁধা দড়ি পায়ে জড়িয়ে পড়ে যাবার সম্ভাবনা, তাই এই নিষেধাজ্ঞা। গায়ে পরা অবস্থায় জামা কাপড় কিছু সেলাই করতে নেই। আসলে পরা অবস্থায় সেলাই করলে পরিধানকারীর গায়ে ছুঁচ ফুটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্যেই এই নিষেধাজ্ঞা। বলা হয় কুটনোর খোলা বাড়ীতে থেকে শুকালে ঋন হয়। এক্ষেত্রে কুটনোর খোলা যাতে বাড়ীকে অপরিষ্কার না করে সেইজন্যেই ঋণ হবার ভয় দেখান হয়েছে। দড়ি বাঁধা অবস্থায় গরু মারা গেলে ভয়ানক অকল্যাণ হয়, এক্ষেত্রে মুখে খড় নিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষা সংগ্রহ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। আসলে মৃত্যুর সময় গরু যাতে দড়ির বন্ধন থেকে মুক্ত থাকে সেই জন্যেই এই প্রায়শ্চিত্তের ভয় দেখান হয়েছে। এমনিতেই মৃত্যুর সময় এই অবোলা প্রাণীকে নিদারুণ কষ্ট সহ্য করতে হয়, তার ওপর রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় থাকলে সেই যন্ত্রণার পরিমাণ বহুগুণ বেড়ে যায়। অবোলা গরু মৃত্যুকালে যাতে মুক্ত অবস্থায় থাকে সেই উদ্দেশ্যেই সংস্কারটির উদ্ভব। এক কোপে বলিদানের কথা বলা হয়েছে; এর কারণ যাতে বলির জন্য নির্দিষ্ট হতভাগ্য প্রাণীটিকে বেশিক্ষণ মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করতে না হয়। হাতে লবণ দিতে নেই। এর কারণ লবণ হ'ল hydroscapic এবং ক্ষয় কারক। একবার হাতে লবণ লাগলে হাত না ধোওয়া পর্যন্ত তা হাতেই লেগে থাকে। অসাবধানতা-বশতঃ এই হাত চোখে লাগলে চোখ জ্বালা করে। আর তাছাড়া এই হাত মুখে লাগলেও তা লবণাক্ত লাগে। অন্ধকারে কিছু খাওয়া নিষেধ। আমরা সহজেই এই নিষেধাজ্ঞার কারণটি বুঝতে পারি। কারণটি আর কিছুই না, অন্ধকারে খেলে খাদ্যদ্রব্যে যদি কিছু ময়লা থাকে তবে তাও পেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। তিনজনের একসঙ্গে যাত্রা করা নিষেধ, বিশেষত কোন গুরুত্বপূর্ণ কাজে। এই নিষেধাজ্ঞার পেছনে যুক্তি হ'ল প্রথমতঃ কাজটি যদি অত্যন্ত গোপনীয় হয় তাহলে তৃতীয় ব্যক্তির দ্বারা সেই গোপনীয়তা ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সর্বোপরি তৃতীয় ব্যক্তির সংযুক্তির ফলে ঐকমত্য নাও হতে পারে। সন্তানের গায়ে মায়ের শাড়ীর আঁচল লাগা খারাপ। এক্ষেত্রেও কারণটি সহজেই অনুধাবনযোগ্য। শাড়ীর আঁচল সহজেই কলুষিত এবং অপরিষ্কার হতে পারে। জননীর কাছেই শিশু-সন্তান অধিক সময় থাকে। তাই জননী যদি সচেতন না হন তাহলে তার অপরিষ্কার শাড়ীর আঁচল সন্তানের ওপর পড়ে আর তার ফলে তার শরীর রোগে

ধিকারের সুযোগ করে দেওয়া হয়। মৃতদেহ স্পর্শ করলে, এমন কি মৃতদেহের খাট বহন করলে বা স্পর্শ করলেও স্নান করতে হয়। বলা বাহুল্য, এই স্নানের ফলে একদিকে যেমন ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য অপরদিকে পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা করা হয়। কারণ সংক্রামক কোন ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটলেও স্নানের ফলে সুস্থ ব্যক্তির সেই ব্যাধির দ্বারা সংক্রমণের সম্ভাবনা তিরোহিত হয়ে যায়। রাত্রে নখ কাটা বারণ। যখন বৈদ্যুতিক আলো ছিল না, তখন এই নিষেধাজ্ঞার সঙ্গত কারণ ছিল। স্বল্প আলোয় নখ কাটতে গিয়ে যে কোন সময়ে আঙ্গুল কাটার সম্ভাবনা থাকে ; তাছাড়া কাটা নখ ঘরের মেঝেয় বা কাপড়ে পড়লেও তা দেখার অসুবিধা। এমন কি খাদ্যদ্রব্যেও কাটা নখ পড়তে পারে। এই জন্যেই রাত্রে নখ কাটা ছিল বারণ। প্রস্রাব বা পায়খানা করার সময় ব্রাহ্মণদের কানে পৈতা লাগাতে হয়। এর কারণটিও খুবই স্পষ্ট—যাতে পৈতা প্রস্রাব অথবা পায়খানায় ঠেকে না যায়, সেইজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে কানে পৈতা দেবার কথা বলা হয়েছে। শিশুর পোশাক যা শুকোবার জন্য দেওয়া হয় তা সূর্যাস্তের আগেই তুলে ফেলতে হয়। এর কারন সূর্যাস্তের পরও শিশুর ব্যবহারের জামা কাপড় বাইরে থাকলে তা আর্দ্র হতে পারে। দ্বিতীয়ত পোকা-মাকড়ও এসব কাপড়-চোপড়ে প্রবেশ করতে পারে। তারপর শিশুর ব্যবহারের সময় ঐ পোকামাকড় শিশুকে দংশন করতে পারে।

শিশুকে আয়নায় মুখ দেখতে দিতে নেই। এই সংস্কারটির কারণ হ'ল শিশু যদি আয়নায় বেশিক্ষণ ধরে মুখ দেখে তাহলে তার নিজের সম্বন্ধে একপ্রকার অস্বাভাবিক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। তাছাড়া শিশু বাক্‌শক্তি হারিয়ে ফেলে কেবল আচার-ব্যবহারে অনুকরণের চেষ্টা করতে শেখে। অন্নপ্রাশনের আগে শিশুর মাথায় ফুল গুঁজতে নেই। এক্ষেত্রেও কারণটি খুবই যুক্তিসঙ্গত। শিশু হাত দিয়ে মাথার ফুল টেনে নিতে পারে এবং তা মুখে দিতে পারে। ফুলের অংশ তার নাকে বা কানেও ঢুকিয়ে দিতে পারে। কোন কোন ফুল আবার বিষাক্ত হয় ; তাছাড়া ফুলের মধ্যে অনেক সময় অনেক রকমের কীট পতঙ্গ থাকে, তা থেকেও শিশুর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। মাসিক হবার পর চার দিনের দিন বিবাহিতা রমণীদের শুদ্ধিস্নানের পর কিছু খেতে হয়। তার আগে স্বামী বা সন্তানকে দেখতে পর্যন্ত নেই। এর কারণটিও খুবই যুক্তিসঙ্গত। মাসিকের ফলে স্ত্রীলোকের দেহ থেকে অনেকখানি লবণ বেরিয়ে যায়। তাছাড়া অতিরিক্ত রক্তক্ষয়ের ফলেও রমণী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই শুদ্ধিস্নানের পরেই কিছু

সংক্রামিত হতে পারে। দু'টি ঝাঁটা একসঙ্গে রাখলে সংস্কার হ'ল তাতে ঝগড়া হয়। আসল ব্যাপারটি হ'ল অধিকাংশ গৃহেই শুষ্কস্থানে ঝাঁট দেবার জন্যে একটি ঝাঁটা আর ভিজে এবং নোংরা জায়গায় ঝাঁট দেবার জন্যে আর একটি পৃথক ঝাঁটা ব্যবহার করা হয়। এখন এই ভিজে এবং শুষ্ক স্থানে ঝাঁট দেওয়ার জন্যে নির্দিষ্ট দু'টি ঝাঁটাই সমান নোংরা হয়ে যায়। তাই স্বাস্থ্যের কারণে দু'টি ঝাঁটাকে পৃথক পৃথক রাখা প্রয়োজন। সদ্য প্রস্ফুটিত ফল বা ফুলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করতে নেই। কারণ এর ফলে অবাঞ্ছিত ব্যক্তির দৃষ্টি এই ফল বা ফুলের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে। তার ফলে সে সেই ফল বা ফুলটি লোভ অথবা বিদ্বেষবশতঃ ছিঁড়ে নিতে পারে। ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই। এর কারণ ভাঙ্গা আয়নায় হাত কেটে যাবার সম্ভাবনা থাকে। দ্বিতীয়ত ভাঙ্গা আয়নায় নিজের চেহারার বিকৃত রূপ দেখে দ্রষ্টার মনে একপ্রকার অবাঞ্ছিত মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে পারে। গুরুত্বপূর্ণ কাজে কেউ বাইরে বেরোলে তাকে পেছন থেকে ডাকতে নেই। বলা হয়, এর ফলে যাত্রা অশুভ হয়। আসলে পেছন থেকে ডাকলে পেছন ফিরে জবাব দিতে হয় এবং মানসিক একাগ্রতাও এক্ষেত্রে নষ্ট হয়। সেইজন্যেই পেছন থেকে ডাকতে নিষেধ করা হয়। প্রদীপের সলতে একটার পরিবর্তে দুটো রাখতে হয়। একটা সলতে রাখতে নেই। এক্ষেত্রেও কারণটি স্পষ্ট। একটি সলতের আগুন দ্রুত নিভে যেতে পারে। কিন্তু দু'টি সলতে থাকলে আগুন চট্ করে নেভে না। আরও একটি কারণ, দু'টি সলতে থাকায় তেলের প্রবাহটা সলতের মাধ্যমে অব্যাহত থাকে। প্রদীপের আলো ফুঁ দিয়ে নেভাতে নেই। কারণ ফুঁ দিয়ে নেভাতে গিয়ে অনবধানতাবশতঃ চুলে বা মুখে অগ্নিশিখা লেগে পুড়ে যেতে পারে। উত্তরে মাথা রেখে ঘুমানো নিষিদ্ধ। প্রাচীন বিশ্বাস অনুযায়ী দক্ষিণ দিক হ'ল যমের বাসস্থান তাই উত্তরে মাথা রাখলে দক্ষিণ দিকে পা থাকে, এর ফলে যমরাজের অসম্মান হয়। সেই জন্যে উত্তরে মাথা রাখতে নেই। কিন্তু এর বৈজ্ঞানিক কারণটি হ'ল অন্য। মানুষের রক্তে লোহার পরিমাণ অনেকখানি। আর এই লৌহই সম্ভবত মানুষের দেহের বৈদ্যুতিক প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করে। উত্তরে মাথা রেখে শয়ন করলে দেহের বৈদ্যুতিক তরঙ্গের প্রবাহ বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া আমাদের দেহের কোষগুলিতে যে বিদ্যুৎ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তাও বাধা পায়। লক্ষ্য করার যে মৃতদেহের মাথা উত্তরমুখী রাখা হয়। কারণ মৃতদেহের চুম্বকত্ব নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পৃথিবীর চুম্বক শক্তিকে মৃতদেহের অভ্যন্তরে প্রবেশা-

খেয়ে নিলে দুর্বলতা খানিকটা কেটে যায়। মাসিকের সময় স্বামীর সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন সম্ভব না হওয়ায়, পরবর্তীকালে স্বামী স্ত্রীকে জৈবিক তাড়নায় দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করতে পারে। শিশুও জননীর কাছে স্তনদুগ্ধ চাইতে পারে। এ সবেও দুর্বলতার পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। তাই শুদ্ধিস্নানের পর কোন কিছু খাবার আগে স্বামী বা সন্তানকে দেখা পর্যন্ত নিষেধ করা হয়েছে।

মাসিকের সময় মহিলাদের ঐ ক'দিন বাড়ীর কোন কাজকর্ম করতে নেই। আগেকার দিনে যখন আমাদের সমাজে একান্নবর্তী পরিবার প্রথা ছিল, তখন মহিলাদের মাসে দু'তিন দিন বিশ্রাম দেওয়ার একটা প্রথা ছিল। সারাদিন উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে হ'ত যাদের, তাদের পক্ষে মাসে দু'তিন দিন বিশ্রাম গ্রহণ করা ছিল খুবই প্রয়োজনীয়। সংসারের সুবিধার জন্য এই বিশ্রাম গ্রহণের সময়টা নির্বাচন করা হয় মাসিকের সময়ে। মাসিকের ফলে স্ত্রীলোকেরা এমনিতেই এই সময় স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই এমনিতেও তাদের বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া মাসিকের সময় মহিলাদের রক্তে toxin এবং Menotoxin তৈরী হয়, যা সকল প্রকার সূক্ষ্ম জীবিতাংশের (Protoplasmic) পক্ষেই ক্ষতিকারক। সেইজন্যেই মাসিকের সময় স্ত্রীলোকদের সংসারের সবকিছু থেকে দূরে সরিয়ে রাখা প্রয়োজনীয়। দরজার কোণে ঝাঁটা উল্টো করে রাখতে নেই। এই সংস্কারটির মূল উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট। ঝাঁটার হাতলটি যদি মাটিতে থাকে আর ঝাঁটার সুঁচলো দিকটা যদি ওপরের দিকে থাকে, তাহলে সুঁচলো দিকটা হাতে ফুটে যেতে পারে। তাছাড়া ঝাঁটার হাতল ধরে ঝাঁটা দেওয়া হয়। তাই হাতলের দিকটা মাটিতে ঠেকান থাকলে তা অনেক সময় নোংরা হতে পারে। পরে ঐ হাতল ধরে ঝাঁট দিতে গেলে হাতও নোংরা হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। রাতের বেলায় কোন কিছু গুঁড়ো করতে নেই অথবা কাপড়চোপড় ধুতে নেই। এক্ষেত্রে আসল কারণটি হ'ল সারাদিনের পরিশ্রমের পর প্রতিবেশীরা সন্ধ্যাবেলায় বাড়ী ফেরে বিশ্রাম সুখ উপভোগের জন্যে। কিন্তু তখন যদি কোন কিছু গুঁড়ো করা হয় তাহলে তার ফলে নীরবতা ভঙ্গ হয়, প্রতিবেশীদের বিরক্তি উৎপাদন করে। তাছাড়া সন্ধ্যাবেলায় কিছু গুঁড়ো করার সময় পোকামাকড় বা অন্য কোন অবাঞ্ছিত জিনিস গুঁড়ো করার জিনিসের মধ্যে পড়ে গেলে চট্ করে তা ধরা যায় না। রাত্রিবেলায় কাপড় কাচার নিষেধের পেছনে যুক্তি হ'ল মূলত কাপড়-চোপড় কাচতে পুকুর ঘাটে বা নদী-নালায়

যেতে হয়। সন্ধ্যার পর অন্ধকারে এসব জায়গায় যাওয়া বিপজ্জনক। এমন কি যাওয়ার পথেও কোন কিছু কামড়ে দিতে পারে। সন্ধ্যের পর নিম, বট, অশ্বত্থ ইত্যাদি গাছতলায় যেতে নেই। এক্ষেত্রে প্রকৃত কারণটি হ'ল এই সব গাছ ঘন পত্রসম্বলিত বলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস ছাড়ে। আর যদি তেমন বাতাস না থাকে, তবে গাছতলায় কার্বন ডাই অক্সাইডের ঘন স্তর সৃষ্টি হয়। মানুষের পক্ষে এই ঘন স্তরবিশিষ্ট কার্বন ডাই অক্সাইডের সম্মুখীন হওয়া খুবই ক্ষতিকর। তদুপরি এইসব গাছের প্রচুর শেকড়-বাকড়ে যে সব গর্তের সৃষ্টি হয় তাতে বিষাক্ত সাপও বাসা বাঁধে। এই সব সাপের দ্বারাও আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই রাত্রিবেলায় এইসব গাছতলায় যাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। উনানে জ্বাল দেওয়ার সময় দুধ উথলে পড়া খারাপ। আমরা জানি দুধ অত্যন্ত পুষ্টিকর খাদ্য—বিশেষত শিশু, বৃদ্ধ এবং রোগীর ক্ষেত্রে। কিন্তু এই দুধ উনানে বসালে অল্প সময়ের মধ্যেই উথলে ওঠে। অনেক সময় দুধ উনানে জ্বাল দিতে বসিয়ে অন্য কাজে বাড়ীর মেয়েরা যায়, আর এর ফলে দুধ উথলে উনানে পড়ে। এতে দুধের পরিমাণ কমে যায়। শিশু বা রোগীর দুধে কম পড়ে। তাছাড়া উনানে দুধ পড়লে এক প্রকার বিশ্রী দুধ-পোড়া গন্ধ বের হয়। এই সব কারণেই উনানে দুধ পড়া খারাপ বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। হাত থেকে মাটিতে সরষে পড়ে গেলে ঝগড়া হয়। আসলে সরষে এত ছোট এবং গড়িয়ে নানা জায়গায় চলে যায় যে সব ঠিকমত কুড়িয়ে নেওয়া যায় না। ফলে একবার হাত থেকে সরষে পড়ে গেলে সব সরষে সংগ্রহ করা সম্ভব হয় না। যাতে সরষের অপচয় না হয়, তাছাড়া মাটিতে সরষে পড়ে থাকলে তাতে পা লেগে হড়কে মানুষ পড়েও যেতে পারে, সেইজন্যেও সংস্কারটির উদ্ভব। হাত থেকে আয়না পড়ে ভাঙ্গলে বারো বছর দুঃখ ভোগে কাটাতে হয়। এই সংস্কারটির মূলে রয়েছে যাতে আয়না পড়ে না ভাঙ্গে সেজন্যে সাবধানবাণী। কোন মানুষকে ডিঙ্গিয়ে যেতে নেই। এই নিষেধাজ্ঞাটির পেছনে যে কারণটি রয়েছে তা হ'ল ডিঙ্গোতে গিয়ে অতিক্রমকারী পা দিয়ে মাড়িয়ে ফেলতে পারে, এমনকি হাতে যদি কোন জিনিষ, বিশেষত ভারী জিনিষ থাকে, তবে তা ডিঙ্গোবার সময়ে যাকে ডিঙ্গোন হচ্ছিল তার ওপর গিয়ে পড়তে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই নিষেধাজ্ঞাটি উদ্ভূত। কালির দোয়াত মেঝেয় রাখতে নেই। আপাতভাবে মনে হতে পারে লেখার সরঞ্জাম পবিত্র, বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতীর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত; সেই কারণেই বোধ হয় এবংবিধ নিষেধাজ্ঞাটির

উৎপত্তি। আসল কারণটি কিন্তু অন্য—তা হ'ল মেঝেয় দোয়াত রাখলে কারো পা লেগে তা পড়ে ভেঙ্গে যেতে পারে এবং মেঝের বিস্তীর্ণ অংশ দোয়াতের কালিতে কলঙ্কিত হতে পারে, সেইজন্যেই এই সতর্কতা অবলম্বন। মেয়েদের কাটা বা ফেটে যাওয়া চুড়ি পরতে নেই। পরলে অমঙ্গল হয়। আসল ব্যাপারটি হ'ল কাটা বা ফাটা চুড়িতে হাত কেটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাছাড়া অনেক সময় কাটা বা ফাটা চুড়িতে কাপড় ছিঁড়ে যাবারও সম্ভাবনা থাকে। এইজন্যেই কাটা বা ফাটা চুড়ি পরা নিষেধ করা হয়েছে। উঠ্‌তি বয়সের ছেলেমেয়েদের ডিঙ্গিয়ে যেতে নেই, ডিঙ্গোলে নাকি তাদের বুদ্ধির ক্ষতি হয়। যে কারণে মানুষকে ডিঙ্গোতে নিষেধ করা হয়েছে, এক্ষেত্রেও সেই একই কারণ কার্যকরী। হিন্দুদের মাংস ও দুধ এক সঙ্গে খেতে নেই, খেলে গোমাংস খাওয়া হয়। আসলে মাংস খাওয়ার পর দুধ খেলে গুরুপাক খাওয়া হয়ে যায়, ফলে হজমের গোলমাল হতে পারে। এইজন্যেই মাংস এবং দুধ একসঙ্গে খাওয়া অনুচিত। গ্রহণের সময় খাদ্যগ্রহণ বারণ। এর কারণ হল—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে মানুষের পক্ষে ক্ষতিকর অসংখ্য জীবাণু ভাসমান। কিন্তু সূর্যকিরণের অতিবেগুণী রশ্মি এইসব জীবাণুকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে। গ্রহণের সময় কিন্তু সূর্যের আলো আমাদের পৃথিবীতে উপস্থিত হয় না। আর এই কারণে বায়ু-মণ্ডলে ভাসমান জীবাণুগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠার সুযোগ পায়। বিশেষত রান্না-করা খাবারে। এই সব খাদ্য ভক্ষণ করলে সহজেই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্যেই গ্রহণের সময় খাদ্যগ্রহণে নিষেধ করা হয়েছে। কার্তিক মাসে ভূত-চতুর্দ্দশীর দিন ওল সরষে, বেতো, নিম, জয়ন্তী, হিঞ্চে প্রভৃতি চোদ্দ শাক ভক্ষণের রীতি। সংস্কার হ'ল এই দিন চোদ্দ শাক খেলে কার্তিকের টান থেকে রেহাই পাওয়া যায়; যমের বাড়ীর দরজা ভক্ষণকারীর কাছ থেকে অনেক দূরে থাকে। আসলে শরৎকালে রোগের প্রকোপ বাড়ে। তাই এই সময়ে চোদ্দ শাক, যা নাকি ওষধি-গুণসম্পন্ন, খেলে স্বাস্থ্য ভাল থাকে। তবে নিছক এক দিনের জন্যে ভক্ষণ করলে বাঞ্ছিত ফললাভ সম্ভব হবে না, নিয়মিতভাবে অন্ততঃ পক্ষে চোদ্দ পাকের কয়েকটি ভক্ষণ করা প্রয়োজন। ভূতচতুর্দ্দশীর দিন থেকেই এর শুরু করা যেতে পারে। শয়ন একাদশী থেকে উত্থান একাদশী পর্যন্ত কলমী শাক খাওয়া নিষেধ। কারণ এই সময়ে নারায়ণ নাকি কলমী শাকের বিছানায় শুয়ে থাকেন। আসল কারণটি হ'ল কলমী শাক নানা গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও বর্ষাকালে এই শাক আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক হায় দাঁড়ায়।

বর্ষাকালে কলমী শাকে একপ্রকার আঠা হয়। এই আঠায় এক প্রকারের কীট জন্মে। শরৎ ঋতুর আবির্ভাবে কীটগুলি অপসৃত হয়। এই জন্যেই নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখে কলমী শাক খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। ত্রয়োদশীতে বায়ু মৃদু হলেও রক্তের গতি প্রবল হয়। তার ফলে এই তিথিতে রক্তসম্পর্কযুক্ত পীড়ার বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। বেগুন যেহেতু উষ্ণবীর্য তাই এই তিথিতে বেগুণ ভক্ষণ নিষেধ করা হয়েছে। নবমী তিথিতে লাউ খাওয়া নিষেধ করা হয়েছে। এর পেছনেও যুক্তি রয়েছে। নবমী হল সন্ধি তিথি। এই তিথি থেকে প্রতিপদ পর্যন্ত প্রকৃতির প্রতিটি অবস্থা পর পর বৃদ্ধির পথে থাকে। নবমীতে বায়ু প্রকুপিত হয়; তাছাড়া শ্লেষ্মাধাতুরও বৃদ্ধি ঘটে। লাউতে যেহেতু বায়ু ও শ্লেষ্মার বৃদ্ধি সেই হেতু নবমী তিথিতে লাউ ভক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। দ্বাদশীতে যে পুঁই শাক খেতে নিষেধ করা হয়েছে, তার পেছনেও আছে সঙ্গত কারণ। দ্বাদশীতে বায়ু কুপিত হয়। এর ফলে রক্তের গতি মৃদু করে দেয় আর ধমনী, শিরায় নানা প্রকারের বাত-বিকারের সৃষ্টি হয়। দ্বাদশীতে পুঁই শাক খেলে ভক্ষণকারীর দেহে তিথির স্বাভাবিক স্বভাব বৃদ্ধি পায়। এইজন্যেই পুঁই শাক ভক্ষণ এই তিথিতে নিষেধ করা হয়েছে। বিধবাদের পুঁই শাক খাওয়া বারণ। কারণ পুঁই শাক বৃষ্যগুণসম্পন্ন, আমিষগুণের ভেষজ, তাই এ'টি হিরণ্যকশিপুর নাড়ীর মতন অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া এ'টি নিদ্রাজনক, জনন উত্তেজক, শুক্রবর্ধক, রুচিপ্রদ। এই কারণে একে আমিষ জাতীয় বলে গণ্য করা হয়েছে আর বিধবাদের যেহেতু আমিষ ভক্ষণ অবিধেয়, তাই পুঁই শাকও তাদের পক্ষে অভক্ষ্য। দাঁত দিয়ে নখ কাটলে পরের জন্মে নাপিত হয়ে জন্মাতে হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত। এক্ষেত্রে স্পষ্টতঃই দাঁত দিয়ে যাতে নখ কাটা না হয় সেইজন্যই নাপিত হয়ে জন্মাবার ভয় দেখান হয়েছে। নখের ভেতর বহু ময়লা জমে থাকে। দাঁত দিয়ে এ হেন নখ কাটলে নখের ময়লা মুখের ভেতর চলে যাবার সমূহ সম্ভাবনা। তাতে অসুখ হতে পারে। এই কারণেই এই সংস্কারটির উদ্ভব।

বলা হয়েছে ঘাটে বসে পা দোলাতে নেই। কারণ ঘাটে বসে পা দোলাবার কালে যে কোন অসতর্ক মুহূর্তে পুকুরের জলে পড়ে যাবার সম্ভাবনা এবং বিপদের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে।

বলা হয়েছে ভাত বেড়ে চলে যেতে নেই। কারণ এর ফলে ভাতে পোকা-মাকড় বা অন্য কিছু অবাঞ্ছিত দ্রব্যপড়তে পারে।

দরজার মাথায় গামছা রাখতে নেই। রাখলে কাঠের দরজা ভিজে গামছার কারণে সহজে নষ্ট হয়ে যায়। তাছাড়া ভিজে গামছা থেকে জল পড়ে দরজা দিয়ে যাতায়াতকারীদের গায়ে লাগে।

দা বা কাঁচি দুইই ধারাল বস্তু। এদের ওপর বসলে যে কোনও সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। এইজন্যই বলা হয় এই দু'টি দ্রব্যের ওপর বসলে দাঁতে পোকা হয়।.

বলা হয় তিনজনে মৃতদেহ বহন করতে নেই। এক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞাটির কারণ বেশ স্পষ্ট। মৃতদেহ বহন করা হয় সচরাচর খাটে। খাটের চারটি দিক চার জনে কাঁধে করে নিলে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া বেশ সহজ হয়, আর এর ফলে কারো ওপরেই বেশি ভার পড়ে না। তিনজনে বহন করলে তা হয় না। এক্ষেত্রে একদিকের পুরো ভার একজনের ওপর পড়ে, ফলে মৃতদেহ সহজে বহন করে নিয়ে যাওয়া যায় না। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা নিষেধ। এক্ষেত্রেও কারণটি সহজেই বোধগম্য। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে প্রস্রাব গায়ে এসে পড়ে। সেইজন্যেই এই নিষেধাজ্ঞা।

রাত্রে গাছের ডালকাটা নিষেধ। কারণ অনেক সময় গাছে যে সাপ বা অন্যান্য বিষাক্ত পোকা-মাকড় থাকে, তা কামড়াতে পারে। তাছাড়া রাত্রে গাছ অধিক পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়ে। ডাল কাটতে গেলে এই কার্বন ডাই অক্সাইড অধিক পরিমাণে শরীরে প্রবেশ করে শরীরের ক্ষতি করতে পারে।

বিছানায় বসে গায়ে তেল মাখতে নেই, তারণ তাহলে তেল বিছানায় লেগে যাবার সম্ভাবনা।

জাতকের বয়স আঠারো মাস হবার আগে তার চুল কাটতে নেই। এক্ষেত্রে কারণটি হ'ল যে তার আগে জাতকের মাথা থাকে খুবই কোমল। এসময় চুল কাটতে গেলে শশুর মাথা কেটে যেতে পারে, ফলে তা বিষিয়ে গিয়ে শিশুর ভয়ানক ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

ঘাড়ে ব্যথা হলে বলা হয় মাথার বালিশ রোদে দিতে, তাহলে ঘাড়ের ব্যথা সারে। আসলে রোদে বালিশ দিলে বালিশ রৌদ্রে উত্তপ্ত হয় এবং সেই উষ্ণতা অনেকক্ষণ থাকে। রাতে এই রকম বালিশে শুলে উষ্ণতায় ঘাড়ের ব্যথার উপশম হয়।

বলা হয় 'আটে কাটে'। অর্থাৎ যে রমণী আট মাসের গর্ভবতী, তাকে খুব

সাবধানে থাকতে হয়। এই সময়ে তার কোন উঁচু জায়গায় শোওয়া নিষেধ। আমরা এই নিষেধাজ্ঞাটির কারণও সহজেই বুঝতে পারি। কারণ আট মাস অবস্থায় কোন উঁচু জায়গা থেকে যদি গর্ভবতী রমণী পড়ে যায়, তাহলে শুধু তারই গুরুতর শারীরিক ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে না, সেই সঙ্গে গর্ভস্থ সন্তানেরও ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। এইজন্যই এই সময় উঁচু জায়গায় শোওয়া বারণ করা হয়।

গর্ভাবস্থায় নানা বিধি-নিষেধ মেনে চলতে হয়। এর মধ্যে রয়েছে নদী নালা পার হতে নেই, সন্ধ্যার পর বেরোতে নেই। নদী-নালা পার হতে গিয়ে কোন কারণে যদি পা হড়কে পড়ে যায়, তাহলে গর্ভবতী রমণী ও তার গর্ভস্থ সন্তান উভয়েরই ক্ষতি হতে পারে। সন্ধ্যের পর বাড়ীর বাইরে গেলেও অন্ধকারে এবং অসাবধানতার ফলে গর্ভবতী রমণীর পড়ে যাবার সম্ভাবনা। বলা হয় রাত্রে যদি বেরোতেই হয় তাহলে যেন সঙ্গে আগুন থাকে। সঙ্গে আগুন থাকলে প্রথমতঃ পথ দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ সাপ বা অন্যান্য হিংস্র প্রাণীদের দ্বারা আর আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে না। আগুন দেখলে সব ভয়ে পালিয়ে যায়। গর্ভবতী রমণীকে চিংড়ি মাছ খেতে নেই। বলা হয় তাহলে ভাবী সন্তানের মাথার চুল কোঁকড়ানো হয়। আসলে চিংড়ি মাছ সহজে হজম হয় না। এই মাছ খেলে বেশি পায়খানা হয়। এই জন্যই নিষেধ করা হয়েছে। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃক্ষরোপণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আমরা জানি বৃক্ষরোপণের পর নবরোপিত বৃক্ষে প্রচুর জল নিয়মিত ভাবে দেওয়া প্রয়োজন। জ্যৈষ্ঠ মাসে এমনিতেই জলের বড় অভাব। তাই বৃক্ষে জল সেচনের জন্য প্রয়োজনীয় জল এই সময় না পাওয়া যাওয়ায় বৃক্ষের শুকিয়ে যাবার সম্ভাবনা। এইজন্যই এবংবিধ নিষেধাজ্ঞা। ভাত খেতে বসে থালার ওপর বাটি তুলে খেলে বলা হয় মেয়েদের জোটে সতীন, আর ছেলেদের হয় দুবার বিয়ে। আসলে বাটির তলায় অনেক সময় ময়লা লেগে থাকে। তাই এহেন ময়লাযুক্ত বাটি ভাতের থালায় রাখলে ভাত দূষিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা। এইজন্যই এই সংস্কারটির উদ্ভব।

আয়না অত্যন্ত পলকা জিনিস। একটু আঘাত লাগলেই ভেঙ্গে যায়। সেই জন্য আয়না ব্যবহারকারী যাতে সাবধানে আয়না ব্যবহার করে এই উদ্দেশ্যে যে সংস্কারটির প্রচলন তা হ'ল আয়না যার হাত থেকে পড়ে ভাঙ্গে তাকে বারো বছর দুঃখ ভোগ করতে হয়।

অপরের গায়ে থুথু ফেলার অর্থ নিজের রোগ ডেকে আনা। এই সংস্কারটির

আসল তাৎপর্য হ'ল যাতে কেউ অন্যের গায়ে কোনো কারণেই থুথু নিক্ষেপ না করে। এইজন্যই থুথু নিক্ষেপকারীর স্বাস্থ্যহানির ভয় দেখান হয়েছে।

বলা হয় একচোখে কাজল পরালে ছেলের অসুখ হয়। এক চোখে কাজল পরালে সৌন্দর্যের হানি ঘটে। এই কারণেই অসুখের ভয় দেখিয়ে সৌন্দর্যহানি যাতে না ঘটে তার চেষ্টা করা হয়েছে। বিছানায় ছেঁড়া চুল থাকলে বলা হয় কুস্বপ্ন দেখতে হয়। আসল ব্যাপার হ'ল শোবার বিছানাকে পরিষ্কার রাখা। এমন কি চুলও যাতে সেখানে পড়ে না থাকে, সেজন্যেই কুস্বপ্নের ভয় দেখান হয়েছে। কাঁধের ছাতা খেলাচ্ছলে ঘোরালেও মামার নাকি মাথা ঘোরে। কাঁধের ছাতা ঘোরানোর সঙ্গে মামার মাথা ঘোরার কোনই সম্পর্ক নেই। আসলে কাঁধে রাখা ছাতা অন্যমনস্কভাবে ঘোরাবার কালে তা অন্য কারো চোখে মুখে লেগে একটা দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। সে'জন্যেই যাতে ছাতা কেউ না ঘোরায় তাই এই ধরণের সংস্কারের উদ্ভব।

৫. সংস্কারে ঐক্য

বাঙ্গালী কবি গেয়েছেন—'নানা ভাষা নানা মত নানা পরিধান
বিবিধের মাঝে দেখ মিলন মহান।

অবশ্যই এক্ষেত্রে কবি বৈচিত্র্যের মধ্যে যে ঐক্যের সন্ধান পেয়েছেন তা আমাদের সুমহান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে, কিন্তু কবির এই বক্তব্যকে আমরা যদি সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করি, তাহলেও তা মোটেই অবান্তর হয় না। বরং বক্তব্যের ব্যঞ্জনা আরও বৃদ্ধি পায়, বিশেষতঃ সংস্কারের পরিপ্রেক্ষিতে। জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষ যে ক'টি সূত্রে গ্রথিত আছে, তন্মধ্যে সংস্কার অন্যতম। তাই তো দেখি একই বিষয় নিয়ে কিংবা একই উদ্দেশ্য নিয়ে সৃষ্ট সংস্কারের মধ্যে কতই না ঐক্য, যতই কেন সেক্ষেত্রে ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক কিংবা অন্যান্য বিষয়ে দুস্তর ব্যবধান আপাতগ্রাহ্য হয়ে বিরাজমান থাকুক, শেষ পর্যন্ত বিশ্বের সব মানুষের দুর্বলতা কিংবা বাসনার মূল সুরটি যে এক আমরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রচলিত সংস্কারের তুলনামূলক আলোচনায় সেই সত্য উপলব্ধি করতে প্রয়াস পাব, আর সেইসঙ্গে সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে সংস্কার-সূত্রেও যে আমরা অন্ততঃ ঐক্যবদ্ধ, সেই পরিচয়টুকুও লাভ করব।

আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি প্রথম সন্তানটি কন্যা হলেই শ্রেয়ঃ। আমেরিকার Marine এবং MassaChusetts-এ প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে এই ব্যাপারে। ওদের সংস্কারটি হ'ল—

First a daughter, then a son,
The world is well begun.
First a son, then a daughter,
Troubles follow after.

আমাদের দেশের মহিলারা কোন জোড়া ফলই খেতে চায় না সচরাচর। সংস্কার হ'ল জোড়া ফল খেলে যমজ সন্তান হয়। অষ্ট্রেলিয়ায় প্রচলিত সংস্কারে, গর্ভাবস্থায় কোন রমণী যদি জোড়া ফল ভক্ষণ করে, তাহলে সে যমজ সন্তান লাভের আশা করতে পারে। স্বপ্নের ব্যাপারে ফ্রয়েড যে ব্যাখ্যাই দিন, সংস্কারের ক্ষেত্রে যে তা স্বীকার করা হয় না, তা বলাবাহুল্য। আমাদের সংস্কারে নিজেদের সম্পর্কে কোন দুঃস্বপ্ন দেখলে তা অন্যের ক্ষেত্রে যেমন ফলবতী হয়, বিপরীত ক্রমে নিজেদের সম্পর্কে ভাল স্বপ্ন দেখলে তা সত্য হয় অন্যের প্রসঙ্গে। জাপানেও স্বপ্ন সম্পর্কে এই একই রূপ সংস্কার প্রচলিত আছে। কারো মৃত্যুসংবাদ প্রমাণিত হলে পরিণামে ঐ ব্যক্তিটির আয়ুঃ বৃদ্ধি পায় বলে বিশ্বাস করা হয়। সমগ্র ইউরোপে, বিশেষতঃ জার্মানীতে প্রচলিত আছে কোন ব্যক্তির মৃত্যু-সংবাদ যদি ভুল প্রতিপন্ন হয় এবং এই ভুল যদি স্বেচ্ছাকৃত না হয়, তাহলে যে ব্যক্তির মৃত্যু-সংবাদ রটে, তার অতিরিক্ত দশ বৎসরের পরমায়ু বৃদ্ধি পায়।

খেতে বসে গান গাওয়া ঠিক নয় কারণ তাতে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হন। আমাদের দেশের প্রচলিত এই সংস্কারের সঙ্গে অন্যান্য দেশের অবশ্যই খেতে বসা অবস্থায় গান গাওয়া সম্পর্কিত সংস্কারের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন ইংলণ্ডে খাবার টেবিলে গান গাইলে কর্মক্ষেত্রে তার মৃত্যু ঘটে বলে বিশ্বাস, অন্য এক সংস্কারে বলা হয়েছে অবিবাহিতা মেয়ে যদি খাবার টেবিলে বসে গান গায়, তাহলে তার কপালে জোটে মাতাল স্বামী। ফরাসীরা বিশ্বাস করে খাবার টেবিলে গান গাইলে দারিদ্র্য দেখা দেয়, আবার আমেরিকানদের সংস্কারে একই কারণে কার্যে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়। মোটের ওপর খেতে বসে গান গাওয়া ব্যাপারটা যে মোটেই ভাল নয় এবং এর পরিণাম যে কখনই ভাল হয় না, সেই মূল বক্তব্যটিই এই সব সংস্কারগুলিতে প্রতিফলিত।

কোথাও যাত্রার সময় হাঁচি হলে বাধা পড়ে বলে সংস্কার। সেক্ষেত্রে খানিক-

ক্ষণ অপেক্ষা করে তারপর গন্তব্য পথের উদ্দেশে যাত্রা করা বিধেয়। আমেরিকানরাও এই একইরূপ সংস্কারে বিশ্বাসী। ওরা বিশ্বাস করে যাত্রার সময় হাঁচি হওয়ার অর্থ হল যাত্রার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হওয়া। আবার কোন কথার সময় কেউ হাঁচলে বিশ্বাস করা হয় যে ঐ কথাটি সত্য। আমেরিকানরাও এই একই ধরণের সংস্কারে বিশ্বাসী। তবে সেইসঙ্গে ওরা এও বিশ্বাস করে যে খাবার টেবিলে বসে হাঁচলে তার অর্থ হ'ল পরবর্তী খাওয়ার আগেই নতুন বন্ধুলাভ ঘটবে। চীনারা তাদের নববর্ষের ঠিক প্রাক্কালে হাঁচি হলে বিশ্বাস করে পরবর্তী সারাটি বছর তার ব্যর্থতায় অতিবাহিত হবে। অর্থাৎ হাঁচিকে এই সব দেশে অশুভ ইঙ্গিত বলে ধরা হয়ে থাকে। ওয়েলস-এর লোকেরাও হাঁচিকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক হিসাবে মনে করে।

হাঁচি হলে যার হাঁচি হয়, তাকে 'জীব' বলা একটা সংস্কার। আফ্রিকানরা কারো হাঁচি হ'লে বলে—স্বাস্থ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য এবং সন্তান-সন্ততি। আধুনিক ইটালীয়ানরা বলে—ভগবান তোমার সাথী হোন। কারণ এরা বিশ্বাস করে, যে হাঁচে, তার আত্মা সাময়িকভাবে দেহ ছেড়ে চলে যায়।

কারো হাতে কখনও লবণ দিতে নেই, আমরা এই সংস্কারে বিশ্বাসী। রাশিয়ায় বিলেতে ও ইটালীতে কোন বন্ধু অপর বন্ধুকে প্রত্যক্ষভাবে লবণ দেয় না। এমনকি, কোন গৃহস্বামীও কখনও কোন অতিথিকে লবণ দেয় না; সংস্কার, এর ফলে দুর্ভাগ্য সূচিত হয়।

ইয়র্কশায়ারের অধিবাসীরা এই সংস্কারে বিশ্বাসী যে কেউ যদি আয়না ভাঙ্গে তাহলে সে তার শ্রেষ্ঠ বন্ধুকে হারায়। আয়না ভেঙ্গে ফেলার অর্থ হ'ল পরবর্তী সাতটি বছর দুর্ভাগ্যের বলি হওয়া। আমরাও আয়না ভাঙ্গলে বারো বৎসর পর্যন্ত দুঃখে কাটে বলে বিশ্বাস করি। শয়নের সময় দক্ষিণ দিকে মাথা করা হ'ল প্রচলিত সংস্কার। ইংলণ্ডের সংস্কারেও দেখা যায় দক্ষিণ দিকে মাথা করে শয়ন করলে দীর্ঘজীবী হওয়া সম্ভব হয়।

পুরুষের পক্ষে জোড়া ভুরু সৌভাগ্যের সূচক, যদিও মহিলাদের ক্ষেত্রে এ'টি ভাল নয় বলে সংস্কার প্রচলিত। পাশ্চাত্য দেশের কোথাও কোথাও যদিও জোড়া ভুরুকে খারাপ বলে বলা হয়েছে, কিন্তু সেইসঙ্গে এও বলা হয়েছে 'meeting eyebrows never know troubles'। উত্তর ইংলণ্ডে জোড়া ভুরু যার, সে জীবনে সুখী হয় বলে সংস্কার প্রচলিত রয়েছে। ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই, দেখলে বদনামের ভাগী হতে হয় বলে সংস্কার। ইংলণ্ডের

প্রচলিত সংস্কারে বলা হয়েছে ভাঙ্গা কাঁচ দিয়ে কাউকে দেখলে তার সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত হয়।

বেশি হাসলে কান্নার সম্ভাবনা থাকে। ইংলণ্ডের নানা স্থানেও এই সংস্কারটি প্রচলিত আছে। ওদেশে বলা হয়, প্রাতরাশের আগে হাসলে রাত্রির আগেই চোখের জল ফেলার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ কাঁদতে হয়। তাছাড়া পাশ্চাত্য জগতের বহু দেশেই এই রকম সংস্কার প্রচলিত আছে যে ব্যক্তি খুব বেশি হাসে তার আয়ুষ্কাল সীমিত হয়ে যায়। Lincolnshire-এ প্রচলিত সংস্কার হ'ল প্রার্থনা করার আগে হাসলে তা খারাপ।

মাথায় যন্ত্রণা হওয়া একটা সাধারণ ব্যাধি। আমাদের দেশে সংস্কার আছে কপালের যে দিকে ব্যথা, সেদিকের চুলে মিষ্টি কুমড়োর ডাঁটা বেঁধে দিতে হয়, দিলে যন্ত্রণার উপশম হয়। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে মাথার যন্ত্রণা উপশমের জন্যে যে সংস্কারটি প্রচলিত আছে তা হ'ল হাতের বুড়ো আঙ্গুল মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে তারপর আঙ্গুল দিয়ে আলটাকরায় চাপ দিতে হয়।

ঘুমন্ত শিশুকে সকল প্রকার অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্যে এখনও আমরা শিশুর বালিশের তলায় কাজললতা রেখে দিই। ইউরোপে একই উদ্দেশ্যে ঘুমন্ত শিশুর বালিশের তলায় রেখে দেওয়া হয় লোহার চাবি।

চুল, নখ ইত্যাদিকে মানবদেহের অংশ বলেই গণ্য করা হয়, আর এগুলির সাহায্যে যার চুল বা নখ তার ক্ষতি করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করা হয়। সেইজন্যে সপ্তাহের যে কোন দিন চুল বা নখ কাটতে নেই বলে সংস্কার। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনেই চুল কাটতে হয় কিংবা কাটতে হয় নখ। ইংলণ্ডে চুল কাটা সম্পর্কে প্রচলিত সংস্কার-ভিত্তিক ছড়াটি হল—

'Best never enjoyed if Sunday shorn,
And likewise leave out Monday,
Cut Thursday and you'll never grow rich,
Likewise on a Saturday.
But live long if shorn on a Tuesday,
And best of all is Friday.'

আমাদের সমাজেও প্রচলিত আছে জন্মবারে চুল কাটতে নেই, জন্মদিনেও চুল কাটতে নেই। তাছাড়া বৃহস্পতিবারেও চুল কাটা নিষেধ।

চুলের মতন নখ কাটারও নির্দিষ্ট দিন রয়েছে। সোমবার এবং মঙ্গলবার

নখ কাটার পক্ষে ভাল দিন। বুধবার এবং বৃহস্পতিবার এই দু' দিনও নখ কাটার পক্ষে মন্দ নয়। কিন্তু শনিবার নখ কাটা উচিত নয়। এদিন কাটলে ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। শুক্রবারেও নখ কাটতে নেই। রবিবার যে নখ কাটে, শয়তান তার সঙ্গে সারাটি সপ্তাহ ধরে থেকে যায়; আর সপ্তাহ শেষের মধ্যে তাকে কোনো না কোনো দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হতেই হয়। এইবার আমাদের সমাজে এই সম্পর্কিত বিধি নিষেধগুলি কিরকম দেখা যাক। আমাদের সমাজেও বৃহস্পতিবার নখ কাটা নিষেধ। ছেলের জন্মবারেও নখ কাটা নিষেধ। শনিবার নখ কাটলে বলা হয় ভাইয়ের দোষ হয়। শুক্রবারে নখ কাটলে সুখ চলে যায় বলে বিশ্বাস—

শুক্রবারে কাটে নখ,
সেইসঙ্গে কাটে সুখ ॥

—জন্মদিনেও নখ কাটতে নেই।

গায়ে জামা পরা অবস্থায় সেলাই করলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায় বলে আমাদের সমাজে সংস্কার প্রচলিত। পাশ্চাত্য সমাজেও এই একই সংস্কার প্রচলিত আছে। এমনকি, ও-দেশের সমাজে পরা অবস্থায় জামা সেলাই করলে তা মৃত্যুর লক্ষণ বলেও কোনো কোনো স্থানে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যে সেলাই করে তার শত্রু বৃদ্ধি পায় বলেও সংস্কার প্রচলিত আছে।

ঝাঁটা নিয়ে সংস্কার যেমন আমাদের সমাজে আছে, তেমনি আছে বিদেশেও। ঝাঁটা সম্পর্কিত সংস্কার নানা ধরণের, যেমন কোন মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই, কিংবা ঝাঁটা মাড়ালে কি হয় ইত্যাদি। আমাদের দেশে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী ভাদ্র মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই। পৌষ মাসেও ঝাঁটা কেনা নিষেধ। ইংলণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে 'মে' মাসে ঝাঁটা কেনা হয় না। সংস্কার, এই মাসে ঝাঁটা কিনলে বন্ধুরা সব চলে যায়। নির্মীয়মাণ বাড়ীতে ছেঁড়া চুপড়ি, জুতো ইত্যাদির সঙ্গে ঝাঁটাও ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, সংস্কার, এতে কারো কুদৃষ্টি পড়তে পারে না। কোন শিশু যদি ঝাঁটা দিয়ে ঝাঁট দেয় তাহলে গৃহে অতিথি সমাগম ঘটে। ঝাঁটা দেবার সময়ে গায়ে ঝাঁটা লাগা খারাপ। তখন দু' পা দিয়ে ঝাঁটাটি মাড়াতে হয়। অপরদিকে Yorkshire-এ প্রচলিত সংস্কার হ'ল কোন অবিবাহিতা মেয়ে যদি ঝাঁটা মাড়ায় তাহলে সে বিবাহের পূর্বেই গর্ভবতী হয়ে পড়ে। ইংলণ্ডে বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে শিশু যদি ঝাঁট দেয় তাহলে বাড়ীতে আশাতিরিক্ত অতিথির আবির্ভাব ঘটে। তাছাড়া ও-দেশেও ঝাঁটা মাড়ালে তা

দুর্ভাগ্যের সূচক বলে গণ্য করা হয়।

আমাদের সংস্কারে বলা হয়েছে যে বিপদ কখনও একা আসে না, অর্থাৎ একটি বিপদ ঘটলে পরপর আরও কয়েকটি বিপদ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। সেইজন্যে একটি বিপদ ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই অপরাপর বিপদের সম্মুখীন হবার জন্যে মানসিক দিক দিয়ে প্রস্তুত থাকতে হয়। আমেরিকাতেও এই ধরণের সংস্কার প্রচলিত রয়েছে, 'bad things happen in threes'। ইংলণ্ডেও সংস্কার হ'ল, 'one disappointment is followed by two others'।

সংস্কারে রবিবার, এই দিনটির এক বিশেষ গুরুত্ব আছে লক্ষ্য করা যায়। এই দিনে অনেক কিছু করা নিষেধ। যেমন আমাদের সমাজে রবিবার দিন বাঁশ কাটতে নেই। রবিবার আঁটকুড়োবার, তাই এদিন নতুন কাপড়ও পরতে নেই। আমেরিকার সংস্কারেও রবিবারের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে। ওখানে রবিবার দিন নখ কাটতে নেই, চুল কাটতে নেই, এমন কি বিছানায় নতুন চাদর পাতাও নিষেধ। পাতলে তা দুর্ভাগ্যের সূচনা করে বলে বিশ্বাস। সর্বোপরি রবিবার দিন সম্পর্কে জনপ্রিয় সংস্কারটি হ'ল—'Never make plans on a Sunday'। কারণ রবিবার দিন কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করলে তা নাকি সার্থক হয় না।

অতিথির আগমন সম্পর্কিত অনেকগুলি সংস্কার প্রচলিত আছে আমাদের দেশে। সাধারণভাবে বলা হয় হাত থেকে কোন জিনিস পড়ে গেলে বুঝতে হবে বাড়ীতে কোন অতিথির আবির্ভাব ঘটবে। স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত একটি সংস্কার হ'ল হাত থেকে তোয়ালে পড়ে গেলে অতিথির আবির্ভাব ঘটে।

ইংলণ্ডে সদ্যোজাত শিশুর সব ক'টি দাঁত বেরোবার আগে মায়েদের নিষেধ করা হয়েছে চিরুণির সাহায্যে শিশুর চুল আঁচড়াতে। সংস্কার, তাহলে চিরুণির যেমন দাঁত খসে যাবে, সেই সঙ্গে শিশুটিরও দাঁত অসময়েই পড়তে থাকবে। আমাদের দেশের প্রচলিত সংস্কারে অবশ্য তা বলা না হলেও আঠার মাসের আগে শিশুর মাথায় চিরুণি দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। বয়সের দিক দিয়ে আমাদের সঙ্গে ইংলণ্ডের সংস্কারে যথেষ্ট সাদৃশ্য রক্ষিত হয়েছে স্বীকার করতে হয়। কারণ শিশুর সব ক'টি দাঁত উঠতে মোঠামুটিভাবে প্রায় আঠার মাস সময়ই লাগে।

চুল কাটা, নখ কাটার মতন কাপড় কাচা বা ক্ষার সেদ্ধ নিয়েও সংস্কার রয়েছে। বলাবাহুল্য, এই সম্পর্কিত সংস্কার শুধু এদেশেই নয়, বিদেশেও

প্রচলিত। আমাদের দেশের প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী সন্তানের জন্মবারে ক্ষার সেদ্ধ করতে নেই। তাছাড়া বৃহস্পতিবারেও কাপড় সেদ্ধ করা নিষেধ। ইংলণ্ডেও কাপড় কাচা সম্পর্কিত সংস্কারে বলা হয়েছে—

Wash on Friday, wash in need,
Wash on Saturday, a shut indeed.

নববর্ষের দিন কাপড় কাচা একেবারে নিষিদ্ধ। এ'দিন কাপড় কাচলে বিশ্বাস, পরিবারের একজন সদস্য মৃত্যুমুখে পতিত হয়—'washes one of the family away'। গুড ফ্রাইডের দিনও কাপড় কাচা একেবারে বারণ। তাছাড়া মে মাসে কম্বল কাচাও বারণ করা হয়েছে।

যাত্রা সম্পর্কে নানাবিধ সংস্কারের মধ্যে একটি হ'ল যাত্রা করার পর পেছন থেকে কেউ ডাকলে যাত্রা অযাত্রায় পরিণত হয়। ইংলণ্ডের উপকূল অঞ্চলে প্রচলিত আছে জেলেরা একবার সমুদ্রে মাছধরবার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাদের আর পেছন থেকে ডাকতে নেই, ডাকলে তাদের পেছন ফিরে তাকাতে হয়, আর তার ফলে সমুদ্রে গিয়ে তাদের বিপদে পড়ার সম্ভাবনা। তাই জেলেরা বাড়ী থেকে যাত্রা করার সময় কোন কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যেতে ভুলে গেলে, পরিবারের কেউ সেই জিনিসটি নিয়ে পেছন থেকে ছুটে গিয়ে জেলের সামনে ফেলে দেয়। ইংলণ্ডের উপকূল অঞ্চলে প্রচলিত সংস্কারে যেক্ষেত্রে কেবল জেলেদের যাত্রা করার পর পেছন থেকে ডাকা নিষেধ, সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে সাধারণভাবে যাত্রা করার পর কাউকেই পেছন থেকে ডাকা হয় না।

শিশুদের দুধের দাঁত ইঁদুরের গর্তে ফেলতে হয়, যেখানে সেখানে ফেলতে নেই। সংস্কার, ইঁদুরের গর্তে ফেললে শিশুর দাঁত হয় ইঁদুরের দাঁতের মতন তীক্ষ্ণ। না, এই সংস্কার কেবল আমাদের সমাজেই যে প্রচলিত তা নয়। পাশ্চাত্য জগতের নানা দেশেই দুধের দাঁত যেখানে সেখানে ফেললে তা ডাইনী কর্তৃক অশুভ কিছু করার ব্যাপারে প্রযুক্ত হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয়। তাই অনেক দেশেই দুধের দাঁতকে লবণ মিশ্রিত করে তারপর তা আগুনে পোড়ান হয়ে থাকে। এবং এই পোড়ানোর দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় শিশুর মায়ের ওপর। অক্সফোর্ডের চতুষ্পার্শ্বের স্কুলগুলির ছেলেমেয়েরা স্কুলে থাকাকালীন অবস্থায় দাঁত পড়ে গেলে সেগুলি যত্নপূর্বক বাড়ীতে এনে মায়ের হাতে দেয়। যাতে মা পড়া দাঁত আগুনে দিতে পারেন। মোটের উপর দুধের দাঁত যে

খুশীমত যেখানে সেখানে ফেলতে নেই—এই ব্যাপারে আমাদের সঙ্গে পাশ্চাত্য-দেশের ঐক্য লক্ষণীয়।

মানুষের জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলীর মধ্যে অন্যতম প্রধান হ'ল বিবাহ। বিবাহ যদি সফল না হয়, স্বামী-স্ত্রী উভয়ের জীবনেই নেমে আসে অবাঞ্ছিত বিপর্যয়। কিন্তু বিবাহিত জীবন শেষ পর্যন্ত সফল হবে কিনা সেটা একটা অনিশ্চিতের ব্যাপার। সব অনিশ্চিত ব্যাপারের মতন বিবাহিত জীবন সুখের হবে কিনা—এই অনিশ্চিত ব্যাপার নিয়েও রচিত হয়েছে সংস্কার—এদেশে এবং বিদেশে। আর এই ব্যাপারে বিবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ আচার এবং অন্যান্য করণীয়ের সঙ্গে বিবাহের দিন, মাস এবং সময় নিয়েও সৃষ্ট হয়েছে সংস্কার। আমাদের দেশের হিন্দু সমাজে ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, পৌষ এবং চৈত্র মাসে বিবাহ হয় না। বলা হয় এই মাসগুলি অকাল। পাশ্চাত্যের অনেক দেশেও বিশেষ বিশেষ মাসে বিবাহ হয় না। যেমন মে মাস বিবাহের পক্ষে অশুভ বলে বলা হয়। স্কটল্যাণ্ডের একটি বহু প্রচলিত সংস্কার হ'ল—'Marry in May, rue for aye'। ইংলণ্ডের সর্বত্র প্রচলিত আর একটি সংস্কার হ'ল—'Marry in Lent, you'll live to repent'।

৬. দেশভেদে সংস্কারে স্ববিরোধিতা

সংস্কারের একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল স্ববিরোধিতা। অর্থাৎ যে উপাদানের ব্যবহার বা অনুষ্ঠানের আয়োজন কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষে শুভকর, সেই একই উপাদানের ব্যবহার বা অনুষ্ঠানের আয়োজন অন্য ক্ষেত্রে অশুভ বলে বলা হয়েছে। অবশ্যই সব সংস্কার প্রসঙ্গে এমন কথা বলা চলে না। তবে বেশ কিছু সংস্কারের ক্ষেত্রে এই স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়। এর কারণ হ'ল সংস্কার মূলতঃ বিশ্বাসের সংগে যুক্ত, বিশ্বাসের ওপরই প্রতিষ্ঠিত। যেহেতু এগুলি সচেতনভাবে সৃষ্ট নয় এবং সর্বাংশে বিজ্ঞানভিত্তিক নয় কিংবা বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দ্বারা পরীক্ষিত নয়, তাই একই উপাদানের ব্যবহারগত প্রতিক্রিয়া কিংবা একই আচরণ অথবা অনুষ্ঠানের পরিণাম ভিন্ন ভিন্ন রকম হতে পেরেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

সাধারণভাবে মানবজাতির সংস্কারে লোহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত।

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী এই ধাতুটি বিভিন্ন প্রকার রোগ নিরাময়ে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যুর মত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানের অপরিহার্য উপকরণের স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এর বিপরীত চিত্রটিও উপেক্ষণীয় নয়। অর্থাৎ এমন বহু সংস্কার আছে যেখানে সর্বতোভাবে লোহার সংস্পর্শ এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। প্রাচীন গ্রীস দেশের মন্দিরে লৌহ নির্মিত কোন যন্ত্রের ব্যবহার ছিল নিষিদ্ধ। Solomon-এর মন্দির নির্মাণের সময় মন্দিরাভ্যন্তরে হাতুড়ি অথবা কুড়াল ব্যবহারের কোন শব্দ শোনা যায়নি বলে জানা যায়। দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকে যদি কেউ কোন লৌহদণ্ড দেখতে পায়, সঙ্গে সঙ্গে তা দিয়ে দেয়। হিন্দুরা পুণ্যস্নানের পর আর লোহা স্পর্শ করেনা, কারণ লোহা হ'ল অশুভ ধাতু। এমন কি অনেক সময় চোরেরা পর্যন্ত লোহা চুরি করতে ইতস্ততঃ করে। সংস্কার এই যে লোহা চুরি করলে জীবনে আর স্বাচ্ছন্দ্যের অধিকারী হওয়া যায় না। শনি ব্যতিরেকে অপর কোন দেব বিগ্রহ লোহায় নির্মিত হয় না। বেদজ্ঞ বা অগ্নিহোত্রীরা অগ্নিগৃহে কখনও লৌহ নির্মিত যন্ত্র নিয়ে যান না বা অপরকে নিয়ে যেতে দেন না। গোঁড়া ব্রাহ্মণ পূজার্চনার সময় এমন কি হাতের লৌহ নির্মিত আংটিটি পর্যন্ত খুলে রাখেন, খুলে রাখেন যজ্ঞোপবীতে বাঁধা লোহার চাবিটি পর্যন্ত।

তিন সংখ্যাটি অশুভ বলে সংস্কার। দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস দিতে নেই, দিলে শত্রু হয়ে যায়। কিন্তু কেউ যদি তিন সত্যি করে কোন কিছু বলে, তবে তা সত্য বলেই গৃহীত হয়। তিনজনের বিশেষতঃ তিন ব্রাহ্মণের একসঙ্গে যাত্রা নিষেধ। আবার ভগবানের আশীর্বাদ লাভের জন্য প্রার্থনা শেষে তাঁর উদ্দেশে তিনবার প্রণতি জানান হয়। অশুভ শক্তিকে তাড়াতে বা তার হাত থেকে মুক্তি পেতে অশুভ শক্তির দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির ওপর বিশেষ কোন দ্রব্য তিনবার নাড়ানোর রীতি। সদ্য-বিবাহিত স্ত্রীলোকের হাতে যে মঙ্গলসূত্র বেঁধে দেওয়া হয়, তাতে থাকে তিনটি সূতার ঘের। তেমনি যজ্ঞোপবীতেও তিন দণ্ডি করে সূতা থাকে। কোন মৃতদেহ আবার তিনজন ব্যক্তি বহন করতে পারে না। তিনটি জিনিস কখনই এক সময়ে করা উচিত নয়। কোন কৃষক তার ফসল তিন জায়গায় সঞ্চয় করে রাখে না। শ্রাদ্ধ ব্যতিরেকে অন্য সময়ে তিন ব্রাহ্মণে একসঙ্গে আহারে বসে না। আসলে 'When finality is desirable three is deliberately chosen as a limit, but when finality means disaster three becomes a number to be avoided'।

('The keys of power' by J. Abbott ; chap xiii. The power of Numbers)

যাত্রা করায় সময় হাঁচি পড়লে তা বাধা হিসাবে গণ্য করা হয়, কিন্তু কথা বলার সময় কারো হাঁচি হলে যার কথার পিঠে হাঁচি হয়, সেই কথাকে সত্য বলে মেনে নেওয়ার সংস্কার প্রচলিত। যাত্রাকালে পেছন থেকে ডাকলে তা অযাত্রা হয়ে যায় বলে সংস্কার, কিন্তু সেই পেছন থেকেই যদি মা ডাকেন, তাহলে আর যাত্রা অশুভ হয় না, বরং ভাল হয়। যাত্রাকালে কোন কিছুতে আঘাত লাগলে বাধা পড়েছে বলে খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে তবে যাত্রা পুনরায় শুরু করার রীতি। অথচ সেই যাত্রাকালে যদি মাথায় আঘাত লাগে, তাহলে আর যাত্রা অশুভ হয় না। সধবাদের শাড়ীর আঁচল মাটিতে ফেলতে নেই। কিন্তু শাড়ীর আঁচল যদি সন্তানের গায়ে লাগে তাহলে নাকি সন্তানের আয়ুঃক্ষয় হয়, সেক্ষেত্রে আবার শাড়ীর আঁচল মাটিতে ঠেকাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কুমারী মেয়েদের আলতার ওপর আলতা পরতে নেই, অথচ সধবাদের ক্ষেত্রে দু'বার আলতা পরতে হয়।

আমাদের দেশের প্রচলিত অনেক সংস্কারে যেমন স্ববিরোধিতার সন্ধান পাওয়া যায়, তেমনি আমাদের দেশে প্রচলিত সংস্কারের সঙ্গে অন্যান্য দেশে প্রচলিত সংস্কারেও অনেক বৈপরীত্যের সন্ধান মেলে। যেমন আমাদের দেশে ডান হাতের তালু চুলকালে লাভের এবং বাম হাতের তালু চুলকালে তা ক্ষতির দ্যোতক বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর বহু দেশেই যদিও এই সংস্কারটি প্রচলিত আছে, কিন্তু আমেরিকায় এর বিপরীত বিশ্বাস প্রচলিত। অর্থাৎ ডান হাতের তালু চুলকালে তা ক্ষতির এবং বাম হাতের তালু চুলকালে তা লাভের ইঙ্গিত-বাহী। আমাদের দেশে সন্ধ্যাবেলায় একতারা দেখা খারাপ বলে সংস্কার প্রচলিত। কিন্তু ইংলণ্ড ও আমেরিকায় একতারা দেখা সৌভাগ্যের ব্যাপার। মনে কোন বিশেষ ইচ্ছা থাকলে সেই ইচ্ছাকে গোপন রেখে একটি ছড়ার পুনরাবৃত্তি করলে সেই গোপন বাসনা নাকি চরিতার্থতা লাভ করে। ছড়াটি হ'ল—

Star light, Star bright,
First Star I see to-night.
I wish I may, I wish I might,
Have the wish I wish to-night

আমাদের সংস্কারে লাল রং মঙ্গলের প্রতীক। তাই বিবাহ উপনয়ন, অন্ন-

প্রাশনের মতন আনন্দদায়ক সামাজিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র রক্তাক্ষরে আজও মুদ্রিত হয়ে থাকে। বিবাহের জন্য সজ্জিত কনেকে লাল শাঁখা, আলতা এবং সিঁদুর দিয়ে সজ্জিত করা হয়। এমন কি বিবাহ উপলক্ষ্যে সে বসুধারা অঙ্কিত করা হয়, তাতেও থাকে লাল সিঁদুর। অনেক ক্ষেত্রে কনেকে রক্তবর্ণের বেনারসী বা অন্য শাড়ী পরান হয়। আমাদের রক্তের রঙ লাল, তাছাড়া রক্তবর্ণকে যৌন ভালবাসার সঙ্গেও যুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে। সংস্কারেও রক্তবর্ণের এক বিশেষ ভূমিকা এই কারণে যে এই রক্তবর্ণ টি ডাইনীবিদ্যা এবং অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ ভাবে কার্যকরী। কিন্তু ইংলণ্ডে রক্তিমবর্ণকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। এমন কি বিবাহের কনে ভুলেও কখনও রক্তবর্ণের পোশাকে সজ্জিত হয় না। ইংলণ্ডে বিয়ের কনে শুভ্র পোশাকে সজ্জিত হয়ে থাকে। কারণ সাদা হল সরলতা ও পবিত্রতার প্রতীক। আমাদের সংস্কারে কালো বেড়াল অশুভ বলে চিহ্নিত। কিন্তু ইংলণ্ডে কৃষ্ণবর্ণের বেড়াল সাধারণভাবে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে স্বীকৃত। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে সাদা বেড়ালকেই অশুভ বলে গণ্য করা হয়। বাড়ীতে অথবা নৌকায় যদি কালো বেড়াল আসে তবে তা সৌভাগ্যের বলে মনে করা হয়। আমরা যেখানে কালো বেড়াল বাড়ীতে ঢুকলেই তাকে দূর-ছাই করে তাড়িয়ে দিই অকল্যাণের ভয়ে, সেক্ষেত্রে পাশ্চাত্য দেশে কালো বেড়ালকে তাড়ানো ত হয়ই না, বরং মনে করা হয় তাড়ালে সে গৃহের বা নৌকার সৌভাগ্য নিয়ে যাবে। কোন ব্যক্তির সামনের পথ দিয়ে যদি কালো বেড়াল চলে যায় তবে তা অতীব সৌভাগ্যের বলে বিশ্বাস করা হয়। অবশ্য পূর্ব Yorkshire-এ কালো বেড়ালের সাক্ষাৎলাভ অশুভ বলে গণ্য করা হয়। Yorkshire-এর উপকূলে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী কোন গৃহকর্ত্রী যদি বাড়ীতে কালো বেড়াল পোষে তাহলে তার স্বামী সমুদ্র যাত্রা থেকে নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করে। আমেরিকা এবং ইউ-রোপের অন্যান্য অনেক দেশেই সাদা বেড়ালকে খুব সন্দেহের চোখে দেখা হয়ে থাকে।

আমাদের দেশের প্রচলিত সংস্কারে পশ্চিমদিকে মাথা রেখে শয়ন করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু ইংলণ্ডে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী পশ্চিমদিকে মাথা রেখে শয়ন করলে ভ্রমণের সুযোগ আসে। আমাদের সংস্কারে প্রবাসে উত্তরদিকে শির রাখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইংলণ্ডে প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী উত্তর-দিকে মাথা রেখে শয়ন করলে পরমায়ু কমে যায়।

আমরা হাঁচিকে যাত্রার ক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ গণ্য করে থাকি। কিন্তু জাপানে

একবার হাঁচি হলে বিশ্বাস করা হয় যে অন্য কেউ তাহলে উচ্চ প্রশংসা করছে তার সম্পর্কে। জোড়া ভুরুর অধিকারীকে আমরা সৌভাগ্যবান বলে বিবেচনা করি। কিন্তু এর বিপরীত বিশ্বাসেরও অনেকগুলি দৃষ্টান্ত রয়েছে। ইংলণ্ডের কোন কোন অংশে বিশ্বাস করা হয় জোড়াভুরুর অধিকারী বিবাহের পোশাক পরিধান করার সুযোগ লাভ থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে জোড়াভুরুর অধিকারীর হয় অকালমৃত্যু ঘটে নতুবা প্রণয়ে ব্যর্থতা আসে বলে সংস্কার প্রচলিত। স্কটল্যাণ্ডে জোড়া ভুরুর অধিকারী ব্যক্তিকে আদর্শচ্যুত বলে গণ্য করা হয়। আবার কখনও কখনও এমন ব্যক্তির ফাঁসীকাঠে মৃত্যু ঘটে বলে সংস্কার। গ্রীসে এই ধরণের মানুষকে রক্ত শোষক পিশাচ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া ডেনমার্ক, জার্মানী এবং আইসল্যাণ্ডের মত দেশে জোড়া ভুরুর অধিকারীকে 'werewolf' বলে মনে করা হয়। আইসল্যাণ্ডে এই ধরণের মানুষকে একসময়ে বলা হ'ত 'hamrammr'। কথাটির মানে হ'ল যে ব্যক্তি নাকি নিজের আকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম।

৭. লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কারের শ্রেণী বিভাগ

লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। একই বিষয় সংক্রান্ত লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারগুলিকে এক একটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় যেমন অতিথির আগমন সংক্রান্ত, ঋণ সম্পর্কিত, সু ও কু-লক্ষণ সংক্রান্ত, বৃষ্টি সম্পর্কিত, প্রসূতির আচরণীয় লোক-সংস্কার, কৃষি সংক্রান্ত ইত্যাদি। বর্তমান বক্ষ্যমান গ্রন্থে যে সহস্রাধিক লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার সংকলিত হয়েছে, সেগুলিকে এই ভাবেই শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। অবশ্য এই ভাবে শ্রেণী করণের একটা বড় ত্রুটি হ'ল এক শ্রেণী ভুক্ত লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কার অপর শ্রেণী ভুক্ত হবার যোগ্যতা সম্পন্ন হলে সেক্ষেত্রে একই বিশ্বাস এবং সংস্কারকে একাধিক শ্রেণীভুক্ত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন অমাবস্যায় হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। এ'টি নিষেধাত্মক সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে যেমন, তেমনি কৃষিসংক্রান্ত সংস্কারেরও অন্তর্ভুক্ত হবার অধিকারী। আবার ভাজা পিঠের প্রথমটি মেয়েদের খেতে নেই এ'টি একদিকে যেমন নিষেধাজ্ঞাসূচক সংস্কারের অন্তর্গত হতে পারে, তেমনিই ভোজন সংক্রান্ত সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত হবারও যোগ্যতাসম্পন্ন।

আর একভাবে লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারের শ্রেণী করণ করা যায় যেমন—নিয়ন্ত্রণীয় এবং অনিয়ন্ত্রণীয় শ্রেণীর। যে সংস্কার বা বিশ্বাস আমাদের নিয়ন্ত্রণাধীন সেগুলিকে আমরা প্রথম পর্যায়ভুক্ত বলে অভিহিত করতে পারি। যেমন হু'কাঠি বাজাতে নেই, বাজালে ঝগড়া হয় কিংবা মেঝেয় জলের দাগ কাটতে নেই কাটলে ঋণ হয়। বিপরীতক্রমে যে সব বিশ্বাস অথবা সংস্কার আমাদের নিয়ন্ত্রণের অতীত সেগুলিই হ'ল অনিয়ন্ত্রণীয় লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার। যেমন এক শালিখ দেখা নিষেধ, দেখলে ঝগড়া হয়। কিংবা কুকুরের মধ্যে ঝগড়া হলে যে এলাকায় ঝগড়া হয় সেই এলাকার লোকেদের মধ্যেও ঝগড়া শুরু হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এক শালিখ দেখা কিংবা কুকুরের মধ্যে ঝগড়া শুরু হওয়ার ব্যাপারে আমাদের কোন হাত থাকেনা। তাই এগুলিকে অনিয়-ন্ত্রণীয় বলা হয়েছে।

Philippa Waring আবার তাঁর 'A Dictionary of Omens & Superstitions' গ্রন্থে লোক-সংস্কারকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (Page 8)

1. 'The idea that if a certain action is taken bad luck will result.
2. The performing of a specified ritual which will bring about desired results.
3. The reading of omens by which a definite event, good or bad will occur.'

৮. সংস্কার ও লোহা

সংস্কারের সঙ্গে লোহার এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। কিংবা অন্যভাবে বলা চলে যে সংস্কারের ক্ষেত্রে লোহার ভূমিকাটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে এমন কোন জাতি পাওয়া যাবেনা যে জাতি নাকি কোন না কোন সংস্কারে বিশ্বাসী নয়; আবার কোন না কোন সংস্কারের সঙ্গে লোহার ব্যবহার জড়িত নয়, এমনটিও খুবই বিরল। আমাদের দেশের বিভিন্ন সংস্কারের সঙ্গে লোহার এক অতি গভীর সম্পর্ক, আবার ঠিক তেমনি পাশ্চাত্যদেশ সমূহের বিভিন্ন সংস্কারেও লোহার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটির সন্ধানলাভ অতিশয় সুলভ। মানুষের জীবনের

তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হ'ল যথাক্রমে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু। এই তিনের ক্ষেত্রে লোহার ব্যবহার বহুল। যেমন গর্ভবতী রমণীকে বাম পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের পরের আঙ্গুলে আঙ্গট পরতে হয়। ইদানীং এই আঙ্গট অনেক ক্ষেত্রে রৌপ্য নির্মিত হলেও মূলতঃ আঙ্গটটি লৌহ নির্মিত একপ্রকার আভরণ। সদ্য প্রসূতী আঁতুড় ঘরের বাইরে গেলে প্রথম একুশদিন পর্যন্ত সঙ্গে কাস্তে রাখে। অনেক স্থানেই আঁতুড় ঘরের দরজায় হালের ফলাটা ছুঁইয়ে রাখার রীতি। বলাবাহুল্য এ'টি লৌহ নির্মিত। আঁতুড় ঘর থেকে সদ্য পোয়াতী পায়খানা করতে যাবার সময় সঙ্গে একটা ছুরি বা অন্য কোন অস্ত্র রাখে। শিশুকে ডাইনির প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে তার হাতে-পায় লোহার বালা অথবা মল পরিয়ে রাখা হয়। ঘুমন্ত শিশুর বিছানায় যে কাজললতা রেখে দেওয়ার রীতি, সেই কাজললতাটিও লৌহ নির্মিত। এমনকি গরুর বাছুর হবার পর গরুর শিঙে লোহা বেঁধে দেওয়া হয়ে থাকে।

বিয়ের দিন সকালে ভাবী বর এবং কনের হাতে যথাক্রমে যাঁতি এবং কাজললতা দেওয়া হয় এবং বিবাহের অনুষ্ঠানাদি শেষ না হওয়া পর্যন্ত দু'জনেই ঐ যাঁতি এবং কাজললতা ধারণ করে থাকে। ইদানীং যাঁতি এবং কাজললতা অনেক ক্ষেত্রে রৌপ্য নির্মিত হতে দেখা গেলেও মূলতঃ এ দু'টি জিনিষ যে লৌহ নির্মিত তা অনস্বীকার্য। মা অথবা বাবা মারা গেলে সন্তানের অশৌচ হয়, আর অশৌচকালে উত্তরীয় ধারণের সঙ্গে গলায় একটা লৌহ নির্মিত চাবি ধারণ করতে হয়। কোনও ব্যক্তি যে স্থানে মারা যায় সেখানে একটা লৌহ নির্মিত পেরেক পুঁতে রাখা হয়। বিবাহ হ'ল শুভকাজ। কিন্তু এই শুভ কাজে যাতে অশুভ শক্তি বা ক্ষতিকারক আত্মারা অবাঞ্ছিত কোন কিছু না করতে পারে সেইজন্যেই আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে লৌহ নির্মিত যাঁতি অথবা কাজললতা ধারণ করা হয়। আবার মৃত্যুর পর মৃত ব্যক্তির আত্মা যদি কোন ক্ষতি করে সেই ভয়েই অথবা সেই অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করতে লৌহ নির্মিত চাবি ধারণ করার সংস্কারের উৎপত্তি।

ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানেও প্রচলিত সংস্কারে লোহার ভূমিকাটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। দাক্ষিণাত্যে নৌকা থেকে গোপনে একটি পেরেক তুলে নিয়ে শনিবার দিন সেই পেরেক থেকে তৈরী করা হয় আংটি। সংস্কার যে এই আংটি ধারণ করলে বিভিন্ন গ্রহ এবং অশুভ শক্তির অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যায়। কোন ব্যক্তির যদি অশুভ সময়ে মৃত্যু হয়

তাহলে তার চিতায় একটি ডিমের সঙ্গে একটি লৌহখণ্ডও নিক্ষেপ করা হয়। অনেক ক্ষেত্রেই অসুস্থতাকে অশুভ শক্তির প্রভাবজাত বলে গণ্য করা হয়। এবং এ ক্ষেত্রেও লোহা হ'ল আত্মরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। সিন্ধু দেশে কোন পতঙ্গ যদি চোখে কামড়ায় এবং সেজন্যে চোখে যন্ত্রণা হয় সেক্ষেত্রে ক্ষতে লোহা স্পর্শ করান হয়। অসুস্থতা নিরাময়ের জন্যে উত্তপ্ত লৌহ খণ্ড জলে ডুবিয়ে সেই জল ব্যবহার করা হয়। এমন কি গৃহপালিত গবাদি পশুকে রক্ষা করতে তাদের গলায় লৌহনির্মিত আংটা পরিয়ে দেওয়া হয়। কর্ণাটকের অন্তর্গত মল্লাদ ভূখণ্ডের অধিবাসীরা যখন কলেরা রোগ মহামারী রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন বাড়ী থেকে বের হবার সময় সঙ্গে লোহার কুড়াল রাখে। চোখের ক্ষত নিরাময় করতে একটা লোহার চাকতি চোখের ওপর বোলান হয় কিংবা করাতের লোহার গুঁড়োর সঙ্গে লেবুর রস মিশিয়ে তাই চোখে দেওয়া হয়। বাতের হাত থেকে রক্ষা পেতে লৌহ নির্মিত আংটি এবং পায়ের আঙ্গুলে লৌহ নির্মিত আভরণ ব্যবহার করা হয়। হ্যাবা হলে ব্যবহার করা হয় দই এবং হলুদের এক মিশ্রণ। এই মিশ্রণ পায়ের চেটো এবং হাতের তালুতে প্রয়োগ করা হয়। কামারের দোকানের ছাইও রোগ নিরাময়ের ব্যাপারে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এর কারণটি খুব স্পষ্ট আর তা হ'ল এই ছাইয়ে লৌহ চূর্ণ থাকে। অসুস্থ ব্যক্তির কোন আত্মীয়কে প্রভাতের আগে কামারের দোকান থেকে রবিবার দিন ছাই সংগ্রহ করে তা একটি কাপড়ে বেঁধে কড়িকাঠে রোগীর মাথার উপর বেঁধে দিতে হয় এবং প্রত্যহ রোগীর শরীরে তা প্রয়োগ করতে হয়। গুজরাটে যদি কোন মহিলার সন্তান অল্প বয়সে মারা যায়, সেক্ষেত্রে সেই মহিলা পায়ে লোহার তৈরী পাঁইজোর পরিধান করে। এই পাঁইজোর কসাইয়ের ছুরি থেকে তৈরী হলেই ভাল হয়। মরণাপন্ন ব্যক্তিকে বাঁচাতে একটা নতুন কালো রঙের কম্বল পেতে তার ওপর কুমড়ো এবং মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তির কাটা নখের এবং চুলের অংশ ও একটি লৌহখণ্ড দেওয়া হয়। এরপর সবকিছু পুঁটলি বেঁধে তা ফুল দিয়ে সাজিয়ে তাতে কিছু কালো তিল দিয়ে সেই পুঁটলিটি একজন পুরোহিতের হাতে দিয়ে দেওয়া হয়। পুরোহিত পুঁটলিটি নিয়ে মরণোন্মুখ ব্যক্তিটির ওপ'র তিনবার নেড়ে তারপর ফেলে দেন। যদি ব্যক্তিটি সে যাত্রায় বেঁচে যায়, তাহলে ঐ পুরোহিত রক্ষা পাওয়া ব্যক্তিটিকে পরবর্তী তিন মাসের জন্যে প্রত্যক্ষ করতে পারেন না। কর্ণাটকে যে মহিলা সন্তান প্রসব করবার সময়ে মারা যায়, সেই মহিলার বুকের ওপর ব্রাহ্মণ একটা লৌহ খণ্ড স্থাপন করেন, উদ্দেশ্য ঐ মহিলার অশরীরী আত্মার আত্মপ্রকাশে

বাধাদান। কঙ্কোণীয়রা বাড়ীতে কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির আত্মা থেকে রক্ষা পেতে ঘোড়ার একটি ক্ষুর হয় বাড়ীর কোনস্থানে নতুবা বাড়ীর প্রবেশ পথে বিদ্ধ করে রাখে। একজন মারাঠা তার স্ত্রীবিয়োগের পর থেকে পাঁচদিন পর্যন্ত সঙ্গে ছুরি রাখে এবং মৃত ব্যক্তির মাথায় পাঁচটি পিন দিয়ে দেওয়া হয়। মারাঠা রমণী যদি সন্তান প্রসবকালে মারা যায় সেক্ষেত্রে রমণীটি যেখানে মারা যায় সেখানে পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয় তার শেষকৃত্য যেখানে সম্পন্ন হয় সেই স্থানটির চারধারেও পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়ে থাকে। বাড়ীর প্রবেশ দ্বারেও পেরেক পোঁতা হয়, মৃত স্ত্রীর আত্মা যেন আত্মপ্রকাশ না করে সেই জন্যে। কোন লিঙ্গায়েতের মৃত্যু হলে শেষকৃত্যের পর সমাধিস্থলের ওপর একটি তীক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট কুঠার এবং একটি কোদাল স্থাপন করে তাদের ওপর গুরুকে দাঁড় করান হয়। তারপর গুরুর পায়ে ঢালা হয় জল। সংস্কার হ'ল, এই জল মৃত ব্যক্তির আত্মাকে অশুভ আত্মায় রূপান্তরিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে। কেউ মারা যাবার পর দশদিন ধরে ব্রাহ্মণ লৌহ নির্মিত একটি অস্ত্র নিয়ে যে স্থানে মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদিত হয় সেখানে উপস্থিত হয়, তারপর সেই অস্ত্রটিকে জলে ডুবিয়ে সেই জল মৃত ব্যক্তির পিণ্ডের ওপর সিঞ্চন করা হয়, শেষ দিনের দিন ব্রাহ্মণকে ঐ অস্ত্রটি দিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মার পিতৃলোক যাবার পথে আর কোন বিপত্তির সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকে না। বরং মৃত ব্যক্তির আত্মার ক্ষেত্রে এ'টি রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়ায়।

গর্ভবতী রমণী এবং তার সদ্যোজাত সন্তানকে রক্ষা করতে নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়ে থাকে। যেমন দাক্ষিণাত্যে সদ্য প্রসূতী যে, তার বিছানার প্রতি কোণে পেরেক পুঁতে দেওয়া হয়। যে অস্ত্র নিয়ে নবজাতকের নাভী কাটা হয়, সেই অস্ত্রটিই অশুভ আত্মাদের হাত থেকে রক্ষা পেতে জননীর বালিশের তলায় স্থাপন করা হয়। কুম্ভেরা অস্ত্রটিকে বালিশের তলায় এগার দিনের জন্যে স্থাপন করে রাখে। পাঞ্চালেরা রাখে পাঁচদিনের জন্যে আর কোরবেরা রাখে তিন দিনের জন্যে। সারস্বত ব্রাহ্মণপত্নী সন্তান প্রসবের পর দশদিন পর্যন্ত নাড়ী ছেদনকারী অস্ত্রটি নিজের সঙ্গে রাখে, বিশেষত যখনই সে নিজের ঘরের বাইরে যায়, লিঙ্গায়েত মহিলারা গর্ভবতী হবার পরমুহূর্ত থেকেই মাথার চুলে একটি লোহার ছুঁচ ধারণ করে। মহার পিতামাতার সন্তান হলে সন্তানের কানের কাছে একটা লৌহ নির্মিত পাত্র স্থাপন করা হয় এবং পাত্রটিতে একটি পেরেকও লাগান হয়

এর পর শিশুটির ওপর জল সিঞ্চন করা হয়। রাজপুত রমণী গর্ভবতী হলে তার মাথায় একটা মুকুট পরান হয় অবশ্য তা পাঁচ মাসের মাথায় এবং মুকুটটিতে একটি লোহার ছুঁচ থাকে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের বিবাহেও লোহার ব্যবহার বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। যেমন লিঙ্গায়েতরা বর ও বধূকে অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষার জন্যে এদের বসার স্থানে একটি কাঁটা এবং একটি লৌহখণ্ড স্থাপন করে। বৈশ্যরা বিবাহের আগে যে সমাবর্তন নামক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তাতে বরের কোমরে একটি লৌহনির্মিত অস্ত্র বেঁধে দেওয়া হয়। কোলীকনে বিবাহ মণ্ডপে আসার সময় হাতে একটা তীর ধরে থাকে। গুজরাটে বর-কনের হাতে মদনফুল বাঁধার সময় লোহার আংটিও পরিয়ে দেওয়া হয়। মারাঠা বর সঙ্গে তরবারি আর ঢাল দুই-ইনেয়। কংসার বর নিজের বাড়ী থেকে কনের বাড়ীতে বিয়ে করতে যাবার সময় সঙ্গে নেয় ছুরি। এই ভাবে বিয়ে করতে যাবার সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের বরকে সঙ্গে ছুরি অথবা তরবারি নিতে দেখা যায়।

এইবার পৃথিবীর অন্যান্য দেশের সংস্কারে লোহার কি স্থান দেখা যেতে পারে। ইটালিতে চোখের রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয় লৌহনির্মিত মাক্ষিক, চীন দেশে ড্রাগনের হাত থেকে রক্ষা পেতে ব্যবহৃত হয় লোহা ; বর্মায় কুমীরকে ভগ্নোদ্যম করা হয় লৌহের ব্যবহারে। সমগ্র ইউরোপে বজ্রের হাত থেকে রক্ষা পেতে লোহার বহুল ব্যবহার প্রচলিত। ইংলণ্ডের বহু কুটীরের বহির্গাত্রে দেখা যায় পেঁচাল লোহার বন্ধনী, উদ্দেশ্য অগ্নিদাহের হাত থেকে রক্ষা লাভ। মিশরে কোন ব্যক্তি যখন অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং অপরিচিত কোন স্থানে উপস্থিত হয়, তখন প্রথমে 'লোহা' শব্দটি উচ্চারণ করে, বিশ্বাস এর ফলে যদি কোন ক্ষতি-কারক 'জিন' সেস্থানে থাকে, তা সরে যায়। ইংলণ্ডে ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর বাড়ীতে ঝুলিয়ে রাখা সংস্কার। কারণ এর ফলে গৃহ অশুভ আত্মার আক্রমণ থেকে মুক্ত থাকে। শিশুদের দোলনায় অথবা গর্ভবতী রমণীর বিছানায় রেখে দেওয়া হয় লৌহ থেকে প্রস্তুত পেরেক। উদ্দেশ্য, শিশু এবং গর্ভবতী রমণীকে অশুভ আত্মার ক্ষতিকারক আক্রমণ থেকে রক্ষা। বাড়ী থেকে ডাইনীকে দূরে রাখতে অথবা গৃহে প্রবেশ করলেও যাতে ডাইনী শক্তিহীন হয়ে পড়ে, সেই উদ্দেশ্যে বালিশ অথবা মেঝের কার্পেট বা অন্য আবরণের তলায় রেখে দেওয়া হয় লৌহ নির্মিত কাঁচি। Herefordshire-এর মানুষেরা বিশ্বাস করে যে কোন ব্যক্তি যদি কোন ধাতব দ্রব্য এবং অর্থ বিশেষত লৌহ

নির্মিত কোন দ্রব্য গুপ্ত অবস্থায় রেখে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহলে তার আত্মা শান্তিলাভ করেনা। Crasswall জেলায় এই ধরণের সংস্কার প্রচলিত আছে যে দেওয়ালে লোহার টুকরো রাখলে সেই টুকরো স্থানান্তরিত করার পূর্বেই স্থাপনকারীর মৃত্যু ঘটে। অশুভ শক্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে ঘোড়ার ক্ষুরের ব্যবহার লণ্ডনের পশ্চিমাংশে এককথায় তুলনারহিত, বিশেষত নবনির্মিত গৃহ রক্ষার ক্ষেত্রে। কৃষকেরা গোশালায় এবং ঘোড়ার আস্তাবলে বিজোড় সংখ্যায়—যেমন একটি, তিনটি অথবা সাতটি ঘোড়ার ক্ষুর ঝুলিয়ে রাখে, উদ্দেশ্য এক্ষেত্রে একটিই, আর তা হোল গোশালায় গরু অথবা আস্তাবলের ঘোড়াদের ডাইনি-বিদ্যার হাত থেকে রক্ষা করা।

পাশ্চাত্য দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েরা এখনও অনেক শীতল লৌহ স্পর্শ করে বাঞ্ছিত সৌভাগ্য লাভের আশায়, আর মুখে বলে 'Touch wood, no good, Touch iron, rely on'। ১৩৫০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে উল্কা থেকে সংগৃহীত লোহা থেকে প্রস্তুত রক্ষাকবচ Sarcophagusকে অশুভ আত্মার হাত থেকে রক্ষা করতে তুতানখামেনের গম্বুজে স্থাপন করা হয়েছিল। রোমান ঐতিহাসিক Pliny-এর সূত্রে জানা যায় ভ্রাম্যমান সকল প্রকার আত্মার হাত থেকে রক্ষা-লাভের জন্যে শবাধারের লৌহনির্মিত পেরেক দরজা বা জানলার ওপরের কাঠে লাগান হ'ত। এ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের প্রচলিত সংস্কারে লোহার স্থান বা লোহার ব্যবহার সম্পর্কে কিছু পরিচয় লাভ করা গেল। এবং মূলতঃ সর্বত্রই লৌহকে অশুভ শক্তির প্রতিরোধকারী ধাতু হিসাবেই গৃহীত হতে দেখা গেছে। কিন্তু প্রশ্ন হ'ল বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে বিশেষভাবে এই ধাতুটিকেই বা সংস্কারে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেওয়া হল কেন এবং কেনই বা এই ধাতুটিকে প্রতিরোধ-কারী ধাতু হিসাবে গ্রহণ করা হ'ল? এর কারণ একাধিক। প্রথমত এবং প্রধানত বিভিন্ন ধাতুর মধ্যে লোহার শ্রেষ্ঠত্ব। সত্যি কথা বলতে কি মানব সভ্যতার ইতিহাসে আগুনের আবিষ্কার এবং তার ব্যবহার যেমন এক যুগান্তকারী ঘটনা, অনুরূপ যুগান্তকারী ঘটনা, হ'ল লৌহের আবিষ্কার। লোহার আবিষ্কারের ফলে মানব সভ্যতার চেহারাটারই আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। লোহার আবিষ্কারের আগেই যদিও ধাতব যুগের সূত্রপাত হয়েছিল, আবিষ্কৃত হয়েছিল ব্রোঞ্জ। ধাতব যুগের আগের যুগ ছিল প্রস্তরযুগ, কিন্তু প্রস্তরের তুলনায় ধাতবযুগ সভ্যতার ইতিহাসকে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিল সন্দেহ নেই; তার ওপর লোহার আবিষ্কার পূর্ববর্তী সমস্ত কিছুর শ্রেষ্ঠত্বকে অনায়াসে অতিক্রম করে যায়।

বিশেষত যুদ্ধে লোহার শ্রেষ্ঠত্ব অবিসংবাদিত ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এর ফলে লোহা এক ঐন্দ্রজালিক শক্তিসম্পন্ন ধাতু বলে মানুষের মনে বিশ্বাস জন্মায়। প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন এবং দুর্ভেদ্য লোহা শুধু মর জগতের ক্ষেত্রেই নির্ভরশীল ধাতু হিসাবে গৃহীত হয় না, পরী, ডাইনি, ভূত, প্রেত এবং অন্যান্য অতিলৌকিক ও অশরীরী শক্তির মোকাবিলাতেও নির্ভরযোগ্য উপাদানের স্বীকৃতি অর্জন করে।

দ্বিতীয়ত, লোহাকে আদিম যুগের মানুষ এক স্বর্গীয় উপাদান হিসাবে গণ্য করেছিল। প্রাচীন কালে মিশরীয়রা লোহাকে বলত আকাশ থেকে আগত ধাতু, আর Aztecs-দের ধারণায় লোহা হ'ল স্বর্গের উপহার। আসলে মানুষের এই রকম এক ধারণা হয় যে পৃথিবীতে উল্কাপিণ্ডের মধ্য দিয়েই লোহার প্রথম আবির্ভাব। তাই এ হেন ধাতু যে অতিলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বলে বিবেচিত হবে সেটাই ত স্বাভাবিক, যা নাকি অবাঞ্ছিত অথচ শক্তিশালী অশুভ শক্তির মোকাবিলায় সক্ষম। সর্বোপরি এক-একটি ধাতুকে এক-একটি গ্রহের থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি আহরণকারী হিসাবে মনে করা হয়। এই হিসাবে লোহা শক্তি সংগ্রহ করে শনির কাছ থেকে। সংস্কার এই যে লোহার ব্যবহারে যেমন শনির সন্তোষ বিধান করা সম্ভব, তেমনিই সম্ভব এই গ্রহের অশুভ শক্তিকে প্রতিহত করা। এইভাবেই লোহা মানবজাতির সংস্কারে গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের মর্যাদা লাভ করেছে ক্রমে ক্রমে।

৯. গর্ভবতী রমণীদের পালনীয় সংস্কার : আধুনিক দৃষ্টিতে

আমাদের দেশে অজস্র লোক-সংস্কারের মধ্যে গর্ভবতী রমণীদের পালনীয় সংস্কার উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় বর্তমান। বর্তমান গ্রন্থে এই সম্পর্কিত সংকলিত সংস্কারগুলি ছাড়াও আমাদের দেশের নানা স্থানের মানুষের মধ্যে গর্ভবতী রমণীদের প্রসঙ্গে আরও কত যে সংস্কার ছড়িয়ে আছে, তার সম্পূর্ণ হিসাব এখনও আমাদের অনায়ত্ত। তবে সংকলিত সংস্কারগুলি থেকে সাধারণভাবে আমরা যে ধারণা করার সুযোগ পাই তা হ'ল এগুলিতে গর্ভবতী রমণীদের ক্ষেত্রে নানা বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ খাদ্য গ্রহণে, বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য বস্তুর দর্শনে, এমন কি যাতায়াত ও প্রসাধনের ব্যাপারেও নানা বিধি-

নিষেধ আরোপ করা হয়েছে। এই বিধি-নিষেধ আরোপের মূল লক্ষ্য হ'ল ভাবী সন্তানের মঙ্গল বিধান করা যাতে তার কোন ভাবে ক্ষতি সাধন না হয়। ভাবী জাতকের ক্ষতি আবার দু'প্রকারের হতে পারে বলে অনুমান করা হয়েছে, দৈহিক এবং মানসিক। যখন বলা হয় যে গ্রহণের সময় পোয়াতী রমণী যদি ফল-ফুলুরি কিছু কাটে তাহলে জাতক ঠোঁট নাক কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে, তখন এক্ষেত্রে জাতকের দৈহিক ক্ষতির সম্ভাবনার প্রতিই বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দান করা হয়। কিন্তু আবার যখন বলা হয় অন্তঃসত্বা অবস্থায় বেশি ঝাল খেলে জাতকের রাগী হবার সম্ভাবনা কিংবা গর্ভবতীর সাধ অপূর্ণ থাকলে জাতক লোভী হয় তখন সেক্ষেত্রে ভাবী সন্তানের মানসিক দিকটির প্রতিই গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এখন প্রশ্ন হ'ল ভাবী জাতকের দৈহিক অথবা মানসিক গঠনের সঙ্গে তার জননীর গর্ভাবস্থার আচরণ এবং অভিজ্ঞতাটি কোনও ভাবে কি সংযুক্ত, নাকি নিছক অর্থহীন কতকগুলি পালনীয় কর্তব্যের কথা সংকলিত সংস্কারগুলিতে নির্দিষ্ট হয়েছে? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর লাভের আগে দেখা যাক পাশ্চাত্য দেশসমূহে গর্ভবতীদের আচরণীয় কোন সংস্কারের সন্ধান লাভ সম্ভব কিনা। ইংলণ্ড এবং প্রায় তাবৎ ইউরোপীয় দেশগুলিতে গর্ভবতী নারীর পক্ষে আচরণীয় বহুবিধ সংস্কারের কথা আমরা জানতে পারি। যেমন প্রসূতি রমণীর পক্ষে কোন কবর অতিক্রম করতে নেই, করলে ভাবী সন্তানটির মৃত্যু হতে পারে। ওয়েলসে গর্ভবতী রমণীর পক্ষে কোন কিছুর বয়ন নিষিদ্ধ, কারণ তাহলে ভাবী জাতকের শণ বা পাটের তৈরী দড়িতে ফাঁসী হবার সম্ভাবনা থাকে। এমন কথাও বলা হয়েছে যে প্রসূতি রমণীর কোমর যদি কোন রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তাহলে ভাবী সন্তানের অকল্যাণ হয়। প্রসূতি তার হাত যদি নোংরা বা অপরিশ্রুত জলে ডোবায় পরিণামে ভাবী জাতকের হাত হয় অশিষ্ট। এমন কি গর্ভাবস্থায় খুব বেশি ফুল নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করলে ভাবী জাতকের ঘ্রাণেন্দ্রিয় খুব দুর্বল হয়ে পড়ে। কোন কোন অঞ্চলে গর্ভবতী রমণীকে ত নদীতে কাপড় কাচতেও নিষেধ করা হয়, কারণ তার উপস্থিতিতে নদীর মাছ পালিয়ে যায় আর তাতে ভাবী সন্তানের অমঙ্গল হয়। অর্থাৎ আমাদের দেশের মত পাশ্চাত্য দেশেও গর্ভবতী রমণী নানা অশরীরী আত্মা, ভূত, প্রেত এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক অশুভ শক্তির দ্বারা সহজেই আক্রান্ত হতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয় এবং এই আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিশেষ ভাবে প্রসূতিদের বেশ কিছু সংস্কার মেনে চলতে

হয়। মোটের ওপর আমাদের মত পাশ্চাত্য দেশগুলিতেও সদ্যোজাত সন্তানের দৈহিক ও মানসিক গঠনের সঙ্গে গর্ভবতী রমণীর অভিজ্ঞতা ও আচরণকে যুক্ত করে দেখা হয়ে থাকে। এমনকি নবজাতকের জন্ম চিহ্ন সম্পর্কেও বলা হয়ে থাকে যে এক্ষেত্রেও প্রসূতির ভূমিকাই মুখ্য—

'Birthmarks on a baby's face or body are often said to be caused by something seen or touched by the mother during her pregnancy.' (page 53 ; Encyclopedia of Superstition)

আমরা জানি যে ঐহিক কল্যাণ বিধানে এবং সর্বোপরি একপ্রকার অনিশ্চয়তা-বোধ থেকেই মূলতঃ সংস্কারগুলির উদ্ভব। ভাবী সন্তান কিংবা প্রসূতির কল্যাণে, আর সর্বোপরি ভাবী জাতকটি নির্বিঘ্নে এবং নিখুঁত অবয়ব নিয়ে যাতে ভূমিষ্ঠ হতে পারে সেই কারণেই গর্ভবতী রমণীর আচরণীয় অসংখ্য সংস্কারের উদ্ভব। আর জাতকটি নির্বিঘ্নে ভূমিষ্ঠ হবে কিনা, কিংবা তার দৈহিক ও মানসিক গঠন ত্রুটিমুক্তই শুধু নয়. নিখুঁত হওয়ার ব্যাপারটি আজও এক অনিশ্চয়তার ব্যাপার। তাই সেই কারণেও প্রসূতিকেন্দ্রিক অসংখ্য সংস্কারের উৎপত্তি। গর্ভবতী রমণী-দের আচরণীয় যে সব সংস্কার রয়েছে সেগুলি কি অযৌক্তিক, অর্থহীন, কার্যকারণ সম্পর্করহিত? কিংবা—

'Unreasoning awe or fear of something unknown, mysterious or imaginary ; a tenet, scruple habit etc founded on fear or ignorance' ('Page 3 ; The Psychology of Superstition'.)

আমরা বিষয়টিকে দু'দিক দিয়ে বিচার করতে পারি। প্রথমত সাধারণ বুদ্ধির নিরিখে আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি, বেশ কিছু সংস্কার যা নাকি গর্ভবতী রমণীদের আচরণীয় বলে বলা হয়েছে, তা কতখানি যুক্তিসঙ্গত। যেমন আটমাসে গর্ভবতী রমণীকে যে খুব সাবধানে থাকার কথা বলা হয়েছে, নিষেধ করা হয়েছে উঁচু খাটে বা অন্য কোন উঁচু জায়গায় শোয়ার ব্যাপারে, তার কারণ কোন ভাবে যদি প্রসূতি এই সময় উঁচু জায়গা থেকে নীচে পড়ে যায়, তাহলে গর্ভস্থ সন্তানের গুরুতর ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। কিংবা বাঁধা অবস্থায় গরু বা ছাগলকে যে অতিক্রম করার প্রয়াস থেকে বিরত থাকার কথা বলা হয়েছে, তারও মূলে রয়েছে বৃহত্তর ক্ষতি হবার সম্ভাবনাকে তিরোহিত করার মানসিকতা।

কারণ বাঁধা অবস্থায় এইসব প্রাণীদের ডিঙ্গোতে গিয়ে প্রসূতির পায়ে যদি দড়ি জড়িয়ে যায় তাহলে তার পড়ে যাবার সম্ভাবনা আর পরিণামে গর্ভস্থ সন্তানের অকল্পনীয় ক্ষতি সাধিত হতে পারে।

এইবার বিজ্ঞান কি বলে দেখা যাক। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেছে গর্ভবতী রমণীর শারীরিক অসুস্থতাই কেবল তার গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করেনা, সেইসঙ্গে মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিও গর্ভস্থ সন্তানের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। বিশেষত যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে অসংখ্য বিকৃত দেহ ও মানসিক গঠন-বিশিষ্ট শিশুর জন্ম এই ধারণার সূচনা করে। Dr. Stott-ও বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করে মোটের ওপর গর্ভিনী অবস্থায় পালনীয় সংস্কারগুলির তাৎপর্যের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই প্রসূতির পালনীয় আচরণ সম্পর্কে দীর্ঘদিন ধরে যা বলে আসা হয়েছে সেগুলিকে নিছক অর্থহীন সংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়ার পরিবর্তে গ্রহণযোগ্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। এখন এটা একটা স্বীকৃত সত্য যে, 'not only physical illness of the mother but also the experience of Psychological stress can adversely affect the foetus ; this may result in malformations or defects in the nervous system producing intellectual or behaviour disturbances'। (Page 7 ; 'The Psychology of Superstition.')

অতএব সম্ভব মত প্রসূতি অবস্থায় ভাবী জননীর স্বাস্থ্য রক্ষার প্রতি নজর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার মানসিক আনন্দবিধানও একান্তভাবে প্রয়োজন। Bergan Evans যে 'The Natural History of Nonsense'-এ প্রাক্‌প্রসবাবস্থার অভিজ্ঞতা ভাবী জাতকে ক্রিয়াশীল হয় এই ধারণাকে অর্থহীন বলে উল্লেখ করেছেন, আজকের আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা তা কিন্তু আর স্বীকার করে না। পরিশেষে অধ্যাপক A. E. Heath-এর একটি মন্তব্য উদ্ধার করা যেতে পারে, যেখানে তিনি বলেছেন, 'If there is evidence for a belief, if its probabilities are calculable and of reasonable amount, then there is nothing irrational in taking a chance in believing it.' (Probability, Science and Superstition ; The Rationalist Annual, 1948)

অতএব অন্য অনেক সংস্কারের মত গর্ভবতী রমণীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সংস্কার-

গুলিতে সব না হলেও অনেকগুলিতেই যে বৈজ্ঞানিক সত্য নিহিত রয়েছে তা অনস্বীকার্য্য।

১০. বৃষ্টি ও সংস্কার

অশুভ ও অবাঞ্ছিত শক্তির প্রভাব থেকে মুক্তিলাভ এবং ঐহিক কল্যাণবিধান যদি সংস্কার সৃষ্টির মূলে প্রেরণা স্বরূপ কাজ করে থাকে, তাহলে বৃষ্টি সম্পর্কিত সংস্কার যে অনিবার্যভাবে উদ্ভূত হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। বৃষ্টি বলতে এ ক্ষেত্রে অতিবৃষ্টি এবং অনাবৃষ্টি উভয়কেই বোঝান হচ্ছে। দুইই আমাদের স্বার্থের শুধু প্রতিকূলই নয়, আমাদের অস্তিত্ব বিপন্নের গুরুত্বপূর্ণ কারণ। আর সেই জন্যেই প্রতিটি দেশেই এই দুইয়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে কত অসংখ্য সংস্কারই না সৃষ্টি হয়েছে এবং সেগুলি অনুসৃত হয়ে আসছে। এ ব্যাপারে বিজ্ঞানে পিছিয়ে পড়া দেশ কিংবা বিজ্ঞানে অগ্রগতি ঘটেছে গুরুত্ব-পূর্ণ ভাবে এমন যে দেশ তাদের মধ্যে কোনও পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ভারত-বর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে অনাবৃষ্টি এবং অতিবৃষ্টি সম্পর্কিত সংস্কারগুলিও কম বৈচিত্র্য-পূর্ণ নয়। গুজরাটে অন্ত্যজশ্রেণীর বয়স্ক মহিলা এবং বালিকারা সারিবদ্ধ ভাবে বাড়ী বাড়ী যায় আর তাদের মাথায় থাকে কাঠের তক্তার ওপর রাখা মাটির ঢিবি। এই মাটির ঢিবি আবার নানা শাক-সবজি দিয়ে সাজানো হয়। মহিলার দল যখন এগোতে থাকে, তখন একদিকে তারা যেমন মুখে মেঘরাজকে আহ্বান জানায়, তেমনি অপরদিকে অন্যান্য মহিলারা তাদের গায়ে জল ঢেলে ভিজিয়ে দেয়। এর ফলে বৃষ্টি নামে বলে বিশ্বাস। সাতারা জেলায় বৃষ্টি আনতে আবার অন্য রকম সংস্কার অনুসৃত হতে দেখা যায়। একটি উলঙ্গ শিশুর মাথায় একটি পাটাতনের ওপর পাঁচটি গোবরের ঢিবি স্থাপন করে সেই ঢিবিগুলি হলুদ আর সিঁদুর দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। শিশুটি পাটাতনটি মাথায় নিয়ে লোকের বাড়ী বাড়ী যখন যায় তখন প্রতিটি বাড়ী থেকে একজন করে মহিলা বেরিয়ে এসে শিশুটির ওপর জল ঢালে। শিশুটি তখন পাক খেতে থাকে। সাতারা জেলায় প্রচলিত আর একটি সংস্কার হ'ল বেশ কিছু ছেলে উলঙ্গ অবস্থায় একটি পাত্রে মহাদেব অথবা একটি জীবন্ত ব্যাঙকে নিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরে। গ্রাম-বাসীরা এইসব ছেলেদেরও জলে ভিজিয়ে দেয়। শোলাপুর জেলায় মেয়েরা সন্ধ্যেবেলা একসঙ্গে কিছু মাটি সংগ্রহ করে তা দিয়ে একটা মাটির গোলা তৈরী

করে। গোলাটিকে একটি ছোট পাত্রে স্থাপন করে তাতে একটি ঘাসের ডগা বসিয়ে নেয়। এরপর এটিকে নিয়ে তারা বাড়ী বাড়ী ঘোরে আর গান গায়। কর্ণাটকে পায়রা জলে ভিজিয়ে ছেড়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, এতে বৃষ্টি হবে। তলোয়ার এবং কোরব মেয়েরা পেতলের থালায় গোবরের একটা গোলক নিয়ে তাতে দূর্বাঘাস লাগিয়ে বাড়ী বাড়ী ঘোরে; কখনও কখনও আবার গোবরের গোলকটি যা নাকি 'গর্জি' নামে পরিচিত, সেটিকে শঙ্কুর আকৃতি বিশিষ্ট করে তা আবার ষাঁড়ের চুল দিয়ে সাজিয়ে নিয়ে বেড়ায়। উভয় ক্ষেত্রেই মেয়েরা গান গায় আর তাদের জলে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় মেয়েরা গোবরের ওপর একটা বিরাট আকারের ব্যাঙকেও বসিয়ে নেয়।

এ পর্যন্ত গেল বৃষ্টি নামানোর প্রয়াস সম্পর্কে। এইবার অতিবৃষ্টি বন্ধ করতে কি করা হয় দেখা যাক। জলের সঙ্গে আগুনের সম্পর্ক অনেকটা খাদ্য-খাদকের। তাই অতিবৃষ্টি বন্ধে বিশেষ ভাবে আগুনের সহায়তা নেওয়া হয়ে থাকে। দাক্ষিণাত্যে কোন মহিলা উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টির মধ্যে যদি জ্বলন্ত আগুন বহন করে নিয়ে যায় তাহলে বৃষ্টি বন্ধ হয় বলে বিশ্বাস। শোলাপুরে, স্ত্রীলোকের পরিবর্তে কোন পুরুষ যদি উলঙ্গ হয়ে বৃষ্টির মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে নাকি বৃষ্টি থামে। মারাঠা এবং ভীলেরা অতিবৃষ্টি বন্ধ করতে বাড়ী থেকে জ্বলন্ত অঙ্গার বৃষ্টির মধ্যে বাইরে ছুঁড়ে দেয়। কর্ণাটকে জ্বলন্ত মশাল বৃষ্টির মধ্যে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া হয়, তাছাড়া বৃষ্টি বন্ধ করতে আগুনে পাথরও গরম করা হয়। এছাড়া কর্ণাটকে উলঙ্গ অবস্থায় কোন পুরুষ মানুষ আধপোড়া কাঠ বা কয়লা অন্যের ছাদে নিক্ষেপ করলেও বৃষ্টি বন্ধ হয় বলে ধারণা। লবণ আর্দ্রতা আনে। তাই বৃষ্টি বন্ধ করতে লবণের ব্যবহারও লক্ষণীয়। পাঁচমহলে বৃষ্টি থামাতে একজন উলঙ্গ মানুষকে একটি নারকেলকে লবণের মধ্যে সমাহিত করে রাখতে হয়। বৃষ্টি থামাতে পুতুলেরও ব্যবহার আছে। যেমন ভীলেরা একটি পুতুলকে বেঁধে বৃষ্টির মধ্যে ফেলে রাখে। গুজরাটে আবার স্ত্রী-পুরুষেরা শোভাযাত্রা করে কোন নদী বা জলাশয়ে গিয়ে হাজির হয়। সেখানে তারা জলে একটি মৃৎ পাত্রকে ভাসিয়ে দেয়। মৃৎ পাত্রে থাকে দই। পাত্রকে লাল কাপড়ে মুড়ে দেওয়া হয়। ফুলের মালাও বেঁধে দেওয়া হয় পাত্রে। পাত্রটি যখন জলে ভাসতে থাকে তখন তার ওপর চাল ছুঁড়ে দেওয়া হয়। অনেক সময় পাত্রের সঙ্গে পাতার তৈরী প্রদীপ ঘি দিয়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। যদি প্রদীপ জ্বলতে থাকে এবং পাত্রটি ভাসতে ভাসতে এগিয়ে যায় তাহলে বিশ্বাস বৃষ্টি বন্ধ হবেই, কিন্তু পাত্রটি যদি পাড়ের

দিকে ফিরে আসে তাহলে আর বৃষ্টি বন্ধ হবার সম্ভাবনা থাকেনা।

এইবার বিদেশের সংস্কারগুলি কি রকম তার পরিচয় নেওয়া যেতে পারে। সমগ্র ইউরোপে বৃষ্টি নামানো উপলক্ষে যে সংস্কারটি প্রচলিত আছে, তা হ'ল কোন পবিত্র ধ্বংসাবশেষকে নদী বা হ্রদের জলে নিমজ্জিত করা। ইংলণ্ডে বৃষ্টির জন্যে ফার্ণ পোড়ানোও হয়ে থাকে। অনেক সময় শিশুরা বৃষ্টি বন্ধ করতে বারংবার আবৃত্তি করে বলে—

"Rain, Rain go away,
Come again another day."

ইংলণ্ডের গ্রামাঞ্চলে একটি অদ্ভুত সংস্কার প্রচলিত আছে বৃষ্টি বন্ধ করার ব্যাপারে। মাতা-পিতার প্রথম কোন সন্তানকে উলঙ্গ অবস্থায় বৃষ্টির মধ্যে মাথায় ভর দিয়ে পা উঁচু করে থাকতে হয়। অনেক সময় ব্যাঙ হত্যা করলেও বৃষ্টি আসে বলে সংস্কার। বৃষ্টি বন্ধ করতে New Britain এর Sulka-রা আগুনে পাথরকে গরম করে সেই পাথর বৃষ্টির মধ্যে বাইরে নিক্ষেপ করে। অথবা বাতাসে গরম ছাই নিক্ষেপ করে। প্রচণ্ড খরার সময় Central Australia-র Dieri-রা চীৎকার করে তাদের নিজেদের অর্ধাহার কিংবা অনাহার জনিত করুণ অবস্থার কথা আর সেইসঙ্গে খরাপীড়িত দেশের কথা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে নিবেদন করে আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি দেওয়ার জন্যে আবেদন জানায়। আবিসিনিয়ার Egghiou-রা প্রতি বছর জানুয়ারী মাসে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে কিংবা গ্রামে গ্রামে রক্তস্রাবী বিরোধে লিপ্ত হয়; এবং এটা চলে এক সপ্তাহ ধরে। এর ফলে নাকি বৃষ্টি নামে। জাভায় বৃষ্টি নামানোর জন্যে দু'জন ব্যক্তি দু'টি নমনীয় দণ্ড নিয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয় এবং যে পর্যন্ত না রক্তপাত ঘটে, সে পর্যন্ত সংঘাত চালিয়ে যায়। রক্তকে এক্ষেত্রে বৃষ্টির দ্যোতক হিসাবে গণ্য করা হয়। Macedonia এবং Thessaly-র গ্রীকেরা বৃষ্টির প্রয়োজনে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দিয়ে শোভাযাত্রা করিয়ে নিকটস্থ সব ক'টি কূপ বা জলাশয়ে পাঠায়। শোভাযাত্রার প্রথমে থাকে একটি মেয়ে। তাকে ফুল দিয়ে সাজান হয়। যেখানেই শোভাযাত্রা থামে, সেখানেই মেয়েটির ওপর তার সঙ্গীরা জল ছিটোয় আর গান গায়। দক্ষিণ রাশিয়ার Kursk প্রদেশে বৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হলে স্ত্রীলোকেরা কোন পথচারীকে হরণ করে নদীতে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করে অথবা জলে তার আপাদমস্তক ভিজিয়ে দেয়। জর্জিয়ার Caucasian

প্রদেশে একই উদ্দেশ্যে দু'টি অবিবাহিতা কন্যাকে ষাঁড়ের জোয়ালে লাগান হয়। তারপর জোয়ালে বসেন একজন পুরোহিত, তাঁরই হাতে থাকে লাগাম। এর পর মেয়ে দু'টি জোয়াল টেনে নদীতে যায়। সেখানে তারা চীৎকার করে, প্রার্থনা জানায় এমন কি কাঁদেও। বৃষ্টি নামানোর কাজে জন্তু-জানোয়ারকেও বিশেষ ভাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন জাভায় একটি অথবা দু'টি বেড়ালকে স্নান করিয়ে দেওয়া হয়। দু'টি বেড়ালের কখনও কখনও একটি হয় মদ্দা, অপরটি মাদী। Batavia-তে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটি বেড়ালকে সঙ্গে নিয়ে সঙ্গীতসহ শোভাযাত্রা বার করে। কোন জলাশয়ে গিয়ে বেড়ালটিকে জলে চুবিয়ে দিয়ে তারপর তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়। সুমাত্রায় বৃষ্টি আনয়নের উদ্দেশ্যে গ্রামের সমস্ত মহিলারা মিলে নদীতে যায়। তাদের পরিধানে থাকে সামান্যমাত্র পরিধেয়। নদীতে গিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা জল ছোঁড়াছুঁড়ি করে। একটি কালো রঙের বেড়ালকে জলে ফেলে দিয়ে তাকে কিছুক্ষণ সাঁতার কাটান হয়, তারপর সেটিকে পাড়ে তুলে দেওয়া হয়। Bechuan-রা একই উদ্দেশ্যে ষাঁড়ের পাকস্থলী পোড়ায়। বিশ্বাস, কালো ধোঁয়া বৃষ্টির জন্যে প্রয়োজনীয় মেঘকে সংগ্রহ করে দেবে। Timorese-রা একই কারণে কালো রঙের শূকরকে পৃথিবী-দেবীর কাছে বলি দেয়। চীনে বৃষ্টির জন্য কাগজ দিয়ে বিশালাকৃতির ড্রাগন তৈরী করে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে যাওয়া হয়। বৃষ্টি না হলে এই ড্রাগনকে ছিঁড়ে ফেলা হয় অবশ্য। ড্রাগনটি হল বৃষ্টি-দেবতার প্রতীক। জাপানের উচ্চভূমিতে বৃষ্টির জন্যে গ্রামের একদল মানুষ শোভাযাত্রা করে একটি পাহাড়ের পাদদেশে যায়। সঙ্গে পুরোহিত যান সকলের আগে একটি কালো কুকুর নিয়ে। নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে পাথর দিয়ে কুকুরটির রজ্জুর বন্ধনকে কেটে দেওয়া হয়। এরপর সকলে মিলে তীর-ধনুক অথবা আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে কুকুরটিকে আক্রমণ করে। কুকুরটি মারা গেলে পর গ্রামবাসীরা তাদের সমস্ত অস্ত্র ফেলে দেয়। তারপর উচ্চৈঃস্বরে বৃষ্টির দেবতার উদ্দেশে প্রার্থনা জানায় বৃষ্টির জন্যে, যাতে বৃষ্টির জলে কুকুরের রক্তে মাখা পার্বত্যাঞ্চলটি কলুষমুক্ত হতে পারে।

অনাবৃষ্টির সঙ্গে সম্পর্কিত সংস্কারগুলি বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হলেও মোটামুটিভাবে এগুলির মধ্যে একটা ঐক্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বৃষ্টি আনয়নে অথবা বন্ধে ব্যাঙের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে লক্ষ্য করা যায়। আমরা এর কারণটি সহজেই বুঝতে পারি। ব্যাঙ জলচর জীব। জলের সঙ্গে এই প্রাণীটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে বলেই বৃষ্টি আনয়নে অথবা বন্ধে ব্যাঙের ভূমিকাটি বিশেষ গুরুত্ব

লাভ করেছে। কুকুর, বেড়াল বা অন্য যে সব প্রাণীর ব্যবহার এইসব সংস্কারে করা হয়ে থাকে, প্রতিটি ক্ষেত্রেই সেগুলির রঙ হয় কৃষ্ণবর্ণের। কালো রঙএর যাদু ক্ষমতায় মানুষের গভীরতর বিশ্বাসই হ'ল এর কারণ। শোভাযাত্রা এবং নৃত্য-গীতানুষ্ঠানও এইসব সংস্কারের উল্লেখযোগ্য অঙ্গ। নৃত্য, বৃষ্টি এবং ঝড়ের দ্যোতক। আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল অনেক ক্ষেত্রেই উল্লিখিত সংস্কারে অংশ-গ্রহণকারী অথবা অংশগ্রহণকারিণী বিবস্ত্র হয়ে থাকে। ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিবস্ত্র অবস্থার কোন স্থান নেই ; কিন্তু যাদুকরী বা আত্মার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত বলেই আলোচ্য সংস্কারগুলিতে অনেক ক্ষেত্রেই বিবস্ত্রতাকে যুক্ত করা হয়েছে। বৃষ্টি আনয়নের উদ্দেশ্যে আচরিত সংস্কারে চীৎকারও একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। শোভা-যাত্রার কলকোলাহল বৃষ্টির জন্যে সমবেত কণ্ঠে নিবেদিত প্রার্থনা—এ সবই বৃষ্টির ধারাপতন ও ঝড়ের শব্দের সূচক। অনেক ক্ষেত্রেই অনাবৃষ্টি অথবা অতিবৃষ্টির জন্যে দেবতাদের ভৎ'সনা করাও এইসব সংস্কারের একটা বৈশিষ্ট্য। সর্বোপরি সমবেত ভোজনও এই সব সংস্কারের একটা বিশেষ দিক। বিশেষ কোন বস্তুকে নিয়ে শোভাযাত্রা যখন বাড়ী বাড়ী যায়, তখনই একদল ছেলেমেয়ে প্রতিটি গৃহ থেকে সংগ্রহ করে নানাবিধ ভোজ্যসামগ্রী। পরবর্তী সময়ে এগুলি দিয়ে তাদের সমবেত ভোজনপর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

১১. মৃত্যু ও সংস্কার

মানুষের জীবনের তিনটি প্রধান ঘটনার মধ্যে একটি হ'ল মৃত্যু। অপর দু'টি ঘটনা হ'ল যথাক্রমে জন্ম এবং বিবাহ। এরমধ্যে বিবাহ অনিবার্য ঘটনা বলে স্বীকৃত না হলেও প্রাণী মাত্রের ক্ষেত্রেই যে মৃত্যু এক অনিবার্য ঘটনা, তা বলা বাহুল্য মাত্র। আর এই মৃত্যুকে নিয়ে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের সব সমাজেই এমন কিছু কিছু সংস্কার রচিত হয়েছে যা আজও অনুসৃত হয়ে থাকে। মৃত্যুকে নিয়ে রচিত সংস্কারের মূলে রয়েছে সেই অতি বলিষ্ঠ কারণ—অনিশ্চয়তা। সব অনিশ্চিত ঘটনাকে নিয়ে যেমন অজস্র সংস্কার তৈরী হয়েছে, মৃত্যুও তার ব্যতিক্রম থাকেনি। আমরা আগেই বলেছি প্রাণী মাত্রের ক্ষেত্রেই মৃত্যু হ'ল এক অনিবার্য ঘটনা। এখন প্রশ্ন হ'ল—তাহলে এক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার স্থান কোথায়? যা নাকি অনিবার্য, তার সঙ্গে অনিশ্চয়তার যোগ থাকে কি করে? পাঠককে তাই আগেই সাবধান করে দেওয়া প্রয়োজন যে মৃত্যু ঘটবে কি ঘটবে না, সে নিয়ে

মানুষের মাথা ব্যথা অন্ততঃ সংস্কারের জগতে লক্ষিত হয় না। কারণ মানুষ যতই সংস্কারাচ্ছন্ন হোক, যা অনিবার্য ঘটনা, তাকে প্রতিহত করার ব্যাপারে সে তেমন উৎসাহী নয়, অন্ততঃ সংস্কার সৃষ্টির ক্ষেত্রে। মৃত্যুরূপ অনিবার্য ঘটনাকে স্বীকার করে নিলেও কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়। সে প্রশ্ন হ'ল যে ব্যক্তির মৃত্যু হ'ল, সেই ব্যক্তি মৃত্যুর পরবর্তী জগতে বা তার বাঞ্ছিত জগতে যথাযথভাবে উপস্থিত হতে পারবে কিনা, আর এ ব্যাপারে তার যারা জীবিত আপনজন তারা কিছু সাহায্য করতে সমর্থ কিনা। স্পষ্টতঃই এ ব্যাপারটির সঙ্গে অনিশ্চয়তা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। দ্বিতীয় অনিশ্চয়তা হ'ল মৃত ব্যক্তি কি তার জীবিত আপনজনদের কোনো না কোনো ভাবে ক্ষতি করতে সমর্থ, সমর্থ হলে এই সম্ভাবনাকে প্রতিহত করা যায় কিনা, গেলে তার পদ্ধতি কি ?

বস্তুতঃপক্ষে মৃত্যু সম্পর্কিত সংস্কারগুলিতে আমরা বিশেষ ভাবে সদ্যোল্লিখিত এই দু'টি চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলনই লক্ষ্য করি। আর মূলতঃ এই দিক দিয়ে পৃথিবীর সব দেশের সব সমাজের মৃত্যু সম্পর্কিত সংস্কারগুলির ক্ষেত্রে এক ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্যের সন্ধান পাই।

আমরা হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। কর্মফল অনুযায়ী, প্রাণীকে অসংখ্যবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়—নানা রূপে। সেই সঙ্গে আমরা আবার মুক্তি লাভের জন্যও ব্যাকুল। সেই ব্যাকুলতা থেকেই সংস্কারের উদ্ভব হয়েছে যে মৃত্যু-পথযাত্রী ব্যক্তির কোন আকাজ্ক্ষা অপূর্ণ রাখতে নেই। কারণ কোন আকাজ্ক্ষা যদি অপূর্ণ থেকে যায়, তাহলে তাকে তা পূরণের জন্য আবার পৃথিবীতে জন্ম-গ্রহণ করতে হয়। শনি-মঙ্গলবারে মৃত্যু হ'লে মৃত ব্যক্তি নাকি দোষ পায়। আর তার ফলে তার আত্মার সদগতি হয় না। সেই কারণে শনি-মঙ্গলবারে মৃত্যু হ'লে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে মোচা দিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, এর ফলে সব দোষ খণ্ডিত হয়ে যায়। মৃতদেহ সৎকারের পর শ্মশান প্রত্যাগতদের কয়েকটি আচার পালন করে তবে গৃহে প্রবেশ করার সংস্কার প্রচলিত রয়েছে। আগুনের তাপ নিয়ে, তেতো জাতীয় কিছু মুখে দিয়ে তবেই গৃহে প্রবেশ করতে হয়। এসবের কারণ অত্যন্ত স্পষ্ট। শ্মশানযাত্রী বা শব বহনকারী যেন মৃত ব্যক্তির দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। এমন কি মৃত ব্যক্তির নিকটতম যে নাকি পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করবে, অশৌচকালে তাকে গলায় লৌহ নির্মিত চাবি ঝুলিয়ে রাখতে হয়। লোহা যেহেতু অশুভ শক্তির বিনাশকারী ধাতু বলে বিবেচিত, তাই লৌহ নির্মিত চাবি পরার বিধান প্রচলিত।

পাশ্চাত্য দেশগুলিতে মৃত্যুর মুহূর্ত থেকে শেষকৃত্য সম্পাদন হওয়া পর্যন্ত যে সময়, তাকে অনিশ্চয়কাল বলে মনে করা হয়। এই সময়টুকু জীবিত ব্যক্তিদের সক্রিয় সহযোগিতালাভ মৃত ব্যক্তিদের কাছে বিশেষ ভাবে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়। যে মুহূর্তে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটে, তৎক্ষণাৎ যে কক্ষে মৃত ব্যক্তির অবস্থান, সেই কক্ষটির সমস্ত জানালা, দরজা পুরোপুরি খুলে দেওয়া হয়। তাছাড়া ঘরের মধ্যে গিঁট দেওয়া কোনো কিছু থাকলে তাও খুলে দেওয়া হয়। ঘরের মধ্যেকার আয়না কোনো আবরণের দ্বারা আবৃত করে দেওয়া হয়। তা না হলে দেওয়ালের দিকে আয়না ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস এরকমটা করা না হলে মৃত শক্তির আত্মা স্বচ্ছন্দে দেহ এবং কক্ষ ত্যাগ করে যেতে পারে না। এমন কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে ঘড়ি চলাচলও বন্ধ করে দেওয়া হয়। রান্নার আগুনও নিভিয়ে ফেলা হয়। মাখন, দুধ, মাংস, পিঁয়াজ এবং এই ধরণের অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী বাইরে ফেলে দেওয়া হয়। নতুবা মৃত ব্যক্তির আত্মা এইসব খাদ্যবস্তুতে অনুপ্রবেশ করে এই সব খাদ্যদ্রব্যের ভক্ষণকারীদের অনিষ্ট সূচিত করতে পারে বলে বিশ্বাস প্রচলিত। যে পর্যন্ত না মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্য সম্পাদিত হচ্ছে, সে পর্যন্ত তাকে একলা ফেলে রাখতে নেই। কাউকে না কাউকে মৃতদেহ ছুঁয়ে থাকতে হয়। সন্ধ্যাবেলায় যে কক্ষে ব্যক্তিবিশেষের মৃত্যু ঘটেছে, সেই কক্ষে বাতি বা অন্য কিছু জ্বালিয়ে রাখতে হয়। স্পষ্টতঃই আগুন অশুভ-শক্তির বিনাশকারী বলে এইরূপ সস্কংার প্রচলিত।

কঙ্গোয় কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হলে, অব্যবহিত পরেই মৃত ব্যক্তির শেষকৃত্যের আয়োজন শুরু করা হয় কয়েকটি মুরগীকে হত্যা করে। মুরগী হত্যা করে তার রক্ত ঘরের ভেতরে এবং বাইরে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। তারপর মৃত দেহটিকে বাড়ীর সর্বাপেক্ষা উঁচু জায়গায় স্থাপন করা হয়। বিশ্বাস, এর ফলে মৃত ব্যক্তির আত্মা সহজেই চলে যেতে পারবে।

গ্রীসে অল্প বয়সী তরুণদের মৃত্যুকে খুবই ভীতির দৃষ্টিতে দেখা হয়। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এক্ষেত্রে শেষ রাত্রে ভোরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গেই মৃত ব্যক্তিকে কবর দিতে হয়। কোনো মতেই সূর্যালোকে এদের শেষ কৃত্য সম্পাদিত হয় না। বলাবাহুল্য এক্ষেত্রেও নিজেদের এবং মৃতের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষাই প্রচলিত সংস্কারটির সঙ্গে যুক্ত।

গ্রীণল্যাণ্ডে কোনো মহিলার মৃত্যু হলে মৃতদেহের সঙ্গে তার ব্যবহৃত ছুঁচ ও ছুরি দিয়ে দেওয়া হয়। অপর পক্ষের শিশুর মৃত্যু হলে তার কবরের ওপর

কুকুরের মাথা দিয়ে দেওয়া হয়ে থাকে। বিশ্বাস তা না হলে শিশুটির আত্মা তার পরবর্তী জগতে যাবার পথের সন্ধান লাভে ব্যর্থ হয়।

পারস্য দেশে মৃত ব্যক্তি মৃত্যুর পর সুখী হবে কিনা তা জানার জন্য মৃত দেহটিকে একটি প্রাচীরের ওপর স্থাপন করা হয়। বলা বাহুল্য, মৃতদেহটিকে কাকের দল ঘিরে ধরে। কাকে যদি মৃতদেহের ডান চোখটি খুবলে নেয়, তাহলে বিশ্বাস করা হয় ব্যক্তিটির মৃত্যুর পরবর্তী জীবন মোটেই সুখের হবে না। পারস্যে আরও একটি সংস্কার প্রচলিত আছে। সেটি হ'ল—মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির বুকের ওপর একটি ছোট কুকুরকে স্থাপন করা হয়। একেবারে মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব-মুহূর্তে মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিটির মুখের ভেতর কুকুরের মুখটিকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, এর ফলে কুকুরটি মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিটির আত্মাকে সংগ্রহ করে আত্মা সংগ্রহকারী দেবদূতকে প্রদান করবে। বলা বাহুল্য, এক্ষেত্রেও মৃত ব্যক্তির আত্মার সদগতি করাই উদ্দেশ্য।

মৃত্যুর পরবর্তীকালে মানুষ কোথায় যায়—এ প্রশ্নের সমাধান আজও সুনিশ্চিত ভাবে হয় নি। মোটের ওপর পরলোকে আত্মা যেন সুখে শান্তিতে থাকে সেই ব্যাপারেই আমাদের সকলের ব্যাকুলতা। আমরা মৃত ব্যক্তিদের মঙ্গল কামনায় যা করি, জানি আমাদের মৃত্যুর পর আমাদের আত্মার হিতার্থেও তাই অনুষ্ঠিত হবে। অন্য সব অনিশ্চিত ব্যাপার শেষ পর্যন্ত জানা যায়, কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী কালের ব্যাপার আমাদের পক্ষে জীবিতাবস্থায় জানা সম্ভব নয়, তাই এই অনিশ্চিত ব্যাপার নিয়ে মানুষের দুর্ভাবনা যেমন, তেমনি সেই অনুপাতে সংস্কারও রচিত হয়েছে অসংখ্য।

১২. সংখ্যা ও সংস্কার

আপাতভাবে মনে হতে পারে সংখ্যার সঙ্গে সংস্কারের সম্পর্ক বোধহয় তেমন একটা কিছু নেই। কিন্তু যে সকল উপকরণকে যাদু শক্তি সম্পন্ন বলে সুদীর্ঘ অতীত-কাল থেকেই কল্পনা করে আসা হয়েছে, তাদের মধ্যে সংখ্যার একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। বিশ্বাস, বিশেষ বিশেষ সংখ্যার আছে শুভ অথবা অশুভ করার ক্ষমতা। তাই যে সব সংখ্যা ক্ষতিকারক বলে বিশ্বাস করা হয়, সংস্কার বিশ্বাসী মানুষ সকল কাজে না হোক, শুভ কিংবা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কার্যের সঙ্গে অন্ততঃপক্ষে সেই সব সংখ্যার যাতে কোন ভাবে যোগ না থাকে, সে বিষয়ে সচেতন থাকেন। সংখ্যা

বলতে তা দিনেরও হতে পারে, আবার অর্থের পরিমাণ বোঝাতেও প্রযোজ্য হতে পারে, এমন কি কথা দেওয়া বা নেওয়ার ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। পরীক্ষার ক্রমিক সংখ্যা, যে গৃহে অবস্থান তার সংখ্যা, যে গাড়ীতে করে নিত্যকার যাতায়াত তার সংখ্যা—সব কিছুই অন্তর্ভুক্ত। ধরা যাক বিশেষ একটি সংখ্যাকে যিনি অশুভ বলে মনে করেন, তিনি ঐ সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত দিনে কোনো শুভকার্য আরম্ভ করতে ইতস্তত করেন, কিংবা ঐ সংখ্যক গৃহে অবস্থান করতে তীব্র অনীহা প্রকাশ করেন। বলাবাহুল্য অন্যান্য সকল ক্ষেত্রের মত এক্ষেত্রেও বিশেষ বিশেষ সংখ্যার শুভ কিংবা অশুভ শক্তি সম্পর্কে যে বিশ্বাস, তা কখনই বিজ্ঞানের দিক দিয়ে স্বীকৃত নয়। তবু এদেশে ও বিদেশে সংখ্যাকে নিয়ে যে সব সংস্কার প্রচলিত আছে, সেগুলি নিয়ে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে Pythagoras-এর সময় থেকেই সংখ্যার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কিত ধারণার বিস্তার। এই প্রসঙ্গে বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য হ'ল যে, এক থেকে ত্রয়োদশ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত সংখ্যাগুলির ক্ষেত্রেই অলৌকিক ক্ষমতা কল্পিত হয়ে থাকে।

সাধারণভাবে বলা হয় যে ভাল অথবা মন্দের তিন প্রকার অবস্থা। যেমন একবার যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায়, তবে বিশ্বাস করা হয় যে অনুরূপ দুর্ঘটনা আরও দু'বার ঘটবে। বিশেষত এক অঞ্চলে যদি একজনের মৃত্যু ঘটে, তবে এক সপ্তাহের বা এক মাসের মধ্যে ঐ অঞ্চলে আরও দু'জনের মৃত্যু ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হয়। অনুরূপভাবে যদি কিছু ভেঙ্গে যায়, সেক্ষেত্রেও আরও দু'বার ঐ একই ধরণের জিনিসের ভাঙ্গার ঘটনা ঘটবে বলে আশঙ্কা করা হয়। এমনকি চিঠি প্রাপ্তি, উপহার লাভ কিংবা অতিথি আগমনের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে তিন তিনবার ঘটবে বলে বিশ্বাস করা হয়। যদি কোন গৃহে এমন তিনটি শব্দ শোনা যায়, যেগুলির ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়, সেক্ষেত্রে আশঙ্কা করা হয় ঐ শব্দ আসলে মৃত্যুর দ্যোতক। অথচ প্রাচীন কালের পৌত্তলিকদের কাছে তিন সংখ্যাটি পবিত্র সংখ্যা রূপেই গৃহীত হয়েছিল বলে জানা যায়। খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বীদের কাছেও এই সংখ্যাটি পবিত্র সংখ্যা রূপে গৃহীত। অবশ্য এর কারণ হ'ল এই সংখ্যার সঙ্গে ত্রিত্বের সম্পর্ক। খ্রীষ্টান ধর্মে ঈশ্বরের ত্রিত্বভাব কল্পিত হয়েছে। অর্থাৎ এঁদের বিশ্বাস, ঈশ্বরের মধ্যে পিতা-পুত্র ও পরম আত্মা এই তিনের একীভবন ঘটেছে। এইভাবে অনেকের কাছে তিন সংখ্যাটি সৌভাগ্য-সূচক হিসাবে বিবেচিত। অনেকেই বলে থাকেন 'Three times lucky'।

হিন্দু এবং মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষই শেষ নিষ্পত্তির সঙ্গে তিন সংখ্যাটিকে যুক্ত করে দেখে। যেক্ষেত্রে উপসংহার বা শেষ নিষ্পত্তি বাঞ্ছিত, সেক্ষেত্রে স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে তিন সংখ্যাটিকে শেষ পরিণাম হিসাবে নির্বাচন করতে দেখা যায়। কিন্তু শেষ নিষ্পত্তি অর্থে যখন ধ্বংস বা মৃত্যুকে বোঝায় সেক্ষেত্রে যথাসম্ভব তিন সংখ্যাটিকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। কোন মুসলমান যদি কোন কাজ তিনবার সম্পাদন করে অথবা কোনো কথা তিনবার উচ্চারণ করে, তাহলে তা আইন সঙ্গত হয়ে যায়। এমনকি বিবাহ করার সময় কিংবা বিবাহ বিচ্ছেদের সময় তিনবার মাত্র গ্রহণ বা ত্যাগ করার কথা বলার রীতি। ভগবানের কাছে আশীর্বাদ যাজ্ঞা করবার জন্য প্রার্থনা শেষে হাত তিনবার ওপরের দিকে তোলার রীতি। হিন্দুরা কোনো কথা যদি তিনবার বলে, তবে তা তিন সত্যে পরিণত হয় এবং সেক্ষেত্রে যাকে উদ্দেশ করে বলা হয়, তিনি তা বিশ্বাস করেন। তিনবার বলার তাৎপর্য হ'ল বর্তমান, অতীত এবং ভবিষ্যতের পক্ষে বিশেষ কিছু অঙ্গীকার করা। কোনো কিছু বিক্রয়ের পর, বিশেষত নিলামের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত মূল্য তিনবার মাত্র হাঁক দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয় আর সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ বস্তুটির নিলাম ডাকও বন্ধ হয়ে যায়। হিন্দুরা দেবতার উদ্দেশে ভক্তির উপচার স্বরূপ যে অর্ঘ্য প্রদান করে থাকে, সংখ্যায় তা হয় তিন। বিবাহের মঙ্গল সূত্রে কিংবা ব্রাহ্মণের উপবীত তিন প্রস্থ সূতা দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে। আবার অন্যদিকে তিন ব্রাহ্মণের একত্রে কোনো শুভকার্যে যাত্রা করা একান্তভাবে অবিধেয়। শব কখনও তিনজনে বহন করতে নেই। এমনকি যে প্রাণীকে হত্যা করা হবে, তাকে কখনও তিন ব্যক্তিতে ধরতে নেই। কোনো কৃষক গৃহের তিনটি পৃথক স্থানে কখনও শস্য সঞ্চয় করেনা। তিনটি বলদকে কখনও একটি লাঙ্গলে জুড়তে নেই। তিনবার ডাকে কখনও সাড়া দিতে নেই। বিশ্বাস করা হয় অশুভ শক্তিই এরকম করে ডাকে। কাউকে তিনটি জিনিস দিতে নেই, দিলে ঐ ব্যক্তি শত্রু হয়ে যায় বলে বিশ্বাস। যে গৃহে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ অবস্থায় রয়েছে, সেখানে যদি পরপর তিনবার খট্ খট্ শব্দ শোনা যায়, তাহলে বিশ্বাস করা হয় মৃত্যু তার উপস্থিত ঘোষণা করছে এবং অসুস্থ ব্যক্তিটির প্রাণটুকু নিয়ে যেতে চাইছে।

হিন্দুদের কাছে পাঁচ সংখ্যাটি খুব শুভ বলে পরিচিত। তাই দেব দেবীর কাছে আরতি করা হয় পঞ্চ প্রদীপ দিয়ে, দান করা হয় পঞ্চফল, পুণ্যার্জনের জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণকে ভোজন করানো হয়। পূজার ঘটে স্থাপন করা হয় পঞ্চ পল্লব,

বেদীতে ছড়ানো হয় পঞ্চ শস্য, তাছাড়া পূজার বেদী সাজানো হয় পঞ্চগুঁড়ি দিয়ে।

সপ্তম সংখ্যাটি প্রায় সর্বত্রই শুভ সংখ্যা রূপে গৃহীত। ভবিষ্যৎ গণনাকাররা বলে থাকেন যে বিশ্ব জগৎ সাতটি গ্রহের দ্বারা পরিচালিত। এমন কি জীবনকেও সাত সাতটি যুগে বিভক্ত করে কল্পনা করা হয়ে থাকে। সপ্তম সন্তানকে খুব প্রতিভাবান বলে বিবেচনা করা হয়। সর্ববিধ অশুভ শক্তির আক্রমণ থেকে রক্ষা লাভের জন্য গৃহে সাতটি ঘোড়ার নাল লাগান হয়ে থাকে পাশ্চাত্য দেশে।

এমনিতেই বলা হয় আকাশে দৃশ্যমান তারকারাজি গুণতে নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে এই সংস্কারটি প্রচলিত যে, কোনো অববাহিত ছেলে বা মেয়ে যদি পর পর সাতদিন আকাশে সাতটি তারা গণনা করে, তবে অষ্টম দিবসে প্রথমে যার সঙ্গে তার করমর্দন হয় সেই হবে ভাবী জীবন সঙ্গী বা সঙ্গিনী। সাত সংখ্যাটিকে শুভ সংখ্যা রূপে বিবেচনার কারণ হ'ল বিশ্বাস করা হয়—এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টিতে নাকি সাতটি দিনেরই প্রয়োজন হয়েছিল। তাই যদি কোনো ব্যক্তির জন্ম তারিখ এমন হয় যা নাকি সাত সংখ্যাটির দ্বারা বিভাজ্য, তাহলে ঐ ভদ্র-লোক খুব সৌভাগ্যবান বলে বিশ্বাস করা হয়।

তের সংখ্যাটি পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই অশুভ বলে পরিচিত। এই সংখ্যাটিকে নিয়ে সংস্কার প্রথমে পাশ্চাত্য দেশেই গড়ে ওঠে, পরে ক্রমে তা সমগ্র পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়ে।

১৩. সংস্কারে ভাল—মন্দ

মানুষের সব থেকে সজাগ দৃষ্টি নিজের ভালর প্রতি। কথায় বলে—নিজের ভাল কেনা চায়? কিন্তু ভাল চাইলেই যে তা পূরণ হবে এমন নয়। তাই মানুষ যতখানি সম্ভব যাতে তার চাহিদার পূরণ হয় সেজন্য সচেষ্ট থাকে। অজানাকে জানার ব্যাপারে মানুষের কৌতূহল ও আগ্রহ সীমাহীন, এই আগ্রহ সমানভাবে বিদ্যমানতার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কেও। অর্থাৎ কিনা ভবিষ্যতে আমি যা চাইছি তা কতখানি সত্য হয়ে উঠবে, আগে থেকেই তা মানুষের জানার কৌতূহল। এই আগে থেকে জানার কৌতূহলের প্রধান কারণ হ'ল সেইমত মানসিক ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন। জ্যোতিষ চর্চার মূল নিহিত রয়েছে এইখানেই। সংস্কারের জগতেও মানুষ নানা উপকরণকে সু অথবা কু আখ্যায় আখ্যায়িত করে একদিকে

ভবিষ্যতের ঘটনাকে আগে থেকে জানতে চেয়েছে, আর সেই সঙ্গে সম্ভাব্য ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়াস করেছে অভীষ্ট লক্ষ্যে নির্বিঘ্নে উপনীত হতে।

বর্তমানে আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত এমন কিছু সংস্কার নিয়ে আলোচনা করব যেগুলিকে ভবিষ্যতের পক্ষে শুভ অথবা অশুভ ইঙ্গিতবাহী বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য, প্রাত্যহিক জীবনে এসবের গুরুত্ব কতখানি তা আধুনিক দৃষ্টিতে তেমন বোধগম্য না হলেও সুদীর্ঘ কাল ধরে যে পৃথিবীর সর্বপ্রান্তের মানুষ এগুলিকে শুধু বিশ্বাস করে আসছেন তাই নয়, সেইসঙ্গে নিজেদের জীবনে অনুসরণ করেও আসছেন—এই সত্যটুকুকে মনে রাখতে হবে।

নেদার ল্যাণ্ডের মানুষ সোমবার দিনটিকে অত্যন্ত অশুভ বলে বিবেচনা করেন বিশেষত বাড়ী থেকে যাত্রার ক্ষেত্রে। তাই যথাসম্ভব এই দিনটিকে তারা এড়িয়ে যান। Rev. S. S. wilson তাঁর 'Sixteen years in Malta and Greece' এ বলেছেন যে গ্রীসের অধিবাসীরা তাদের ডান চোখ মিটমিট করলে এবং বাঁ চোখ সঙ্কুচিত হলে সেটাকে সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে বিবেচনা করেন। তাছাড়া গ্রীসে খাবার টেবিল পরিষ্কার করার সময় যদি কেউ হাঁচে, তাহলে সেক্ষেত্রে ব্যাপারটিকে খুবই অশুভ বলে গণ্য করা হয়। যে পরিষ্কার করবে তার বাঁ দিকে যদি কেউ হাঁচে তাহলে সেটা যেমন দুর্ভাগ্যের সূচক তেমনি ডান দিকে হাঁচলে তা আবার সৌভাগ্যের দ্যোতক বলে গণ্য করা হয়।

বিদ্যুৎকে সকলেই ভয় পায়। কিন্তু সংস্কারে দেখা যাচ্ছে, ঘুমন্ত অবস্থায় বজ্রাঘাতে কারো কখনও মৃত্যু হয় না। এমনকি বিদ্যুতের আলোয় যদি কারো ঘুম ভেঙ্গে যায় তবে তা খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে মনে করা হয়। তবে বিদ্যুৎের চমকানি দেখার পরই এই বিষয়ের উল্লেখ খুবই অমঙ্গলজনক ব্যাপার। Calmucks রা কখনও যে পাত্রে দুগ্ধ অথবা দধি রক্ষিত হয় তা জলে ধোয়না, কারণ তাদের বিশ্বাস দুধ অথবা দধি জলে ধৌত করলে যেচে দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনা হয়।

ব্যাঙ জলচর জীব। তাই ব্যাঙকে কেন্দ্র করে যে সব সংস্কার রচিত হয়েছে, সেগুলি মূলতঃ বৃষ্টি সম্পর্কিত। কিন্তু ব্যাঙকে কেন্দ্র করে অন্য যে সব সংস্কার প্রচলিত তা হ'ল কোন ব্যাঙ যদি আপনা থেকেই কারো গৃহে এসে উপস্থিত হয় তবে তার অদূর ভবিষ্যতে সৌভাগ্য লাভ ঘটবে।

রাতের বেলায় চুল আঁচড়ালে তা অত্যন্ত মন্দ বলেই পরিগণিত হয়। তবে চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ানোকে খারাপ বিবেচনা করা হলেও ব্রাস দিয়ে চুল

আঁচড়ানোকে কিন্তু খারাপ বলা হয়নি। চুল আঁচড়াতে গিয়ে যদি হাত থেকে চিরুনী পড়ে যায়, তবে বুঝতে হবে শীঘ্রই কোন ব্যাপারে হতাশ হবার ঘটনা ঘটতে চলেছে।

অতিরিক্ত অঙ্গ নিয়ে জন্মগ্রহণ করাকেও সংস্কারের জগতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। যেমন কেউ যদি পাঁচের অধিক আঙ্গুল নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তবে সৌভাগ্যবান বলে গণ্য করা হয়। বিশ্বাস করা হয় এমন জাতক অসাধারণত্বের স্বাক্ষর রাখবে। সংস্কারে হাত-পায়ের নখকেও দেহের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গরূপেই গণ্য করা হয়। তাই নখ কাটারও নির্দিষ্ট দিন আছে। নির্দিষ্ট দিনের বাইরে নখ কাটলে অশুভ কিছু ঘটার আশঙ্কা থাকে। যেমন শুক্রবার কিংবা রবিবার নখ কাটলে অশুভ কিছু ঘটার আশঙ্কা থাকে। বিপরীতক্রমে সোম এবং মঙ্গলবার নখ কাটার পক্ষে শুভদিন। শিশুর নখ কখনও কাটতে নেই। এক বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত শিশুর নখ মুখ দিয়ে কাটতে হয়, তা না হলে শিশুটির বড় হয়ে চৌর্যবৃত্তি অবলম্বনের সম্ভাবনা থাকে।

জিপসীরা বিশ্বাস করে কোন কুকুর যদি নিজের থেকে কারো বাগানে প্রবেশ করে বাগানের মধ্যে বিরাট একটি গর্ত খোঁড়ে, তাহলে বাগানের মালিকের পরিবারের শীঘ্রই কারোর মৃত্যু ঘটবে। আইরিশরা বিশ্বাস করেন সকাল বেলায় যদি কেউ চীৎকার রত কোন কুকুরকে প্রথমে দেখে তাহলে তার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের নানাস্থানেই যে সংস্কারটি প্রচলিত তা হ'ল যদি কোন অপরিচিত কুকুর নিতান্ত আকস্মিক ভাবে কাউকে অনুসরণ করতে থাকে তবে তা সেই ব্যক্তিটির সৌভাগ্যকেই সূচিত করে। ব্যবসা সংক্রান্ত কার্যে যাবার সময় সাদা—কালো মিশ্রিত কোন কুকুর যদি পথ অতিক্রম করে যায় তবে ঐ কার্যে সামান্য লাভের সম্ভাবনা। গৃহের বাইরে রাত্রে যদি কোনও কুকুর চীৎকার করে, তবে তা মৃত্যু অথবা এই জাতীয় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে চলেছে বলে বিশ্বাস করা হয়। কোন কুকুর যদি একবার বা তিনবার চীৎকার করেই নীরব হয়ে যায়, তবে বুঝতে হবে কোথাও মৃত্যু ঘটেছে।

অস্ট্রিয়ার প্রচলিত একটি সংস্কার হ'ল যদি ঝড় বৃষ্টির মধ্যে কেউ কোন মুদ্রা কুড়িয়ে পায়, তবে তা খুবই সৌভাগ্যের সূচক। কারণ বিশ্বাস করা হয় মুদ্রাটি সরাসরি স্বর্গ থেকে পতিত হয়েছে আর তাই মুদ্রাটি বিশেষ যাদুশক্তি সম্পন্ন।

সংস্কারের জগতে বেড়াল একটা বিশেষ স্থানের অধিকারী, বিশেষতঃ তাকে সৌভাগ্যের প্রতীক হিসাবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। মিশরের অধিবাসীরা

বেড়ালকে দেবতা হিসাবে গণ্য করে এসেছেন। হুলো বেড়াল হ'ল সূর্য দেবতার প্রতীক, অপরপক্ষে মেনী বেড়াল চন্দ্রের প্রতীক। বেড়ালের হাঁচিকে সৌভাগ্যের সূচক বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু বেড়াল যদি তিনবার হাঁচে তবে ধরা হয় গৃহে শৈত্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

সংস্কারে ঝাঁটারও এক পৃথক ভূমিকা লক্ষণীয়। পড়ে থাকা ঝাঁটায় পা দিতে নেই, কিংবা চলবার সময়ে যদি গায়ে ঝাঁটা এসে পড়ে, তবে বুঝতে হবে দুর্ভাগ্য শুরুর আর বিশেষ বিলম্ব নেই। ইংলণ্ডের কোনো কোনো অঞ্চলে বিশ্বাস প্রচলিত যে মাসে ঝাঁটা ক্রয় করলে ক্রয়কারী দুর্ভাগ্যের অধিকারী হয়। পুরনো ঝাঁটা সহ নব নির্মিত গৃহে উপস্থিত হতে নেই, হলে পুরনো দুর্ভাগ্যগুলিও সঙ্গী হয়। সন্ধ্যার পর ঝাঁট দিলে সৌভাগ্যকে বিদায় দেওয়া হয়।

বিয়ের ব্যাপারে নানাবিধ সংস্কার প্রচলিত আছে। কারণ শেষ পর্যন্ত বিবাহ যে সফল হবেই এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত একটা অনিশ্চয়তা থেকেই যায়। আর সেই কারণেই বিবাহকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সংস্কারের উদ্ভব। একটি সংস্কারে বলা হয়েছে যে কনে যদি তার বিবাহের পোষাক নিজেই তৈরী করে, অথবা বিবাহের পূর্বেই যদি সে তার পোশাকটি পরিধান করে কিংবা বিবাহের পূর্বেই সে যদি নিজেকে একটি পূর্ণ দৈর্ঘের আয়নায় দেখে ফেলে, তবে তার অশেষ দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা। বিবাহের পরিচ্ছদ যদি সাটিনে তৈরী হয়, তবে তার দুর্ভাগ্যকেই আহ্বান করে আনে।

প্রয়োজনে মানুষের অন্যের কাছে হাত পাততে হয়, ঋণ করতে হয়। কিন্তু এই ঋণ চাইবার জন্যও নির্দিষ্ট দিন আছে। তা না হলে জীবনে অশেষ দুর্ভাগের কালো ছায়া নেমে আসে। যেমন ফেব্রুয়ারীর প্রথম তিন দিন এবং মার্চ মাসের শেষ তিন দিন কখনও কারো কাছ থেকে ঋণ চাইতে নেই। চাইলে তা অত্যন্ত অশুভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। স্কটল্যাণ্ডে এমন বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে ঐ সময়ে কোনো ধান বপন করলে তার আর অঙ্কুরোদগম হবে না কিংবা চারা গাছ বসালে তাও শেষ পর্যন্ত টিঁকে থাকবে না।

আকাশের নক্ষত্রদের কেন্দ্র করেও সংস্কারের জগতে শুভাশুভ নির্দিষ্ট হয়েছে। যেমন কেউ যদি তার ডান দিকে আকাশের তারা খসা দেখে, তবে তার পক্ষে তা খুবই শুভ, বিপরীতক্রমে বাঁ দিকে দেখলে তা তার দুর্ভাগ্যকে সূচিত করে। কচ্ছপ দেখার ব্যাপারটিকেও শুভ ঘটনার ইঙ্গিতবাহী বলে বলা হয়ে থাকে। কোন শিশু যদি জন্মের সময় দাঁত নিয়ে জন্মায়, তবে তার সারাটা জীবনই খুব

অশান্তির মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। এই ভাবে দেখা যায় যে সংস্কারগুলি মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত। কতকগুলি ক্ষেত্রে সৌভাগ্যের অথবা দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে এমন সব ঘটনা যুক্ত থাকে যেগুলি মানুষের নিয়ন্ত্রণের অতীত, আবার কিছু ব্যাপারে মানুষ নিজেই নিয়ন্ত্রক।

১৪. যাত্রা ও সংস্কার

সংস্কার সৃষ্টির মূলে রয়েছে অনিশ্চয়তা। আগেকার দিনে বিজ্ঞানের যখন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটেনি, তখন আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের নানা ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তার পরিমাণ ছিল অনেকখানি। আর সেই কারণে আগেকার দিনে সংস্কারের আধিপত্য ছিল এক কথায় রাজকীয়। আজ বিজ্ঞানের চরমোন্নতি সত্ত্বেও জীবন থেকে অনিশ্চয়তা সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়েছে এমন কথা আমরা কেউ বলতে পারি না। আর সেই কারণে আধুনিক কালেও সংস্কার একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি।

বর্তমান নিবন্ধে আমরা যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশ্বাস এবং সংস্কার বিষয়েই বিশেষ ভাবে অলোকপাত করব। যাত্রা বলতে আমরা এক্ষেত্রে এক স্থান থেকে অপর স্থানের উদ্দেশে গমনকেই বোঝাতে চাইছি। যে সব বিষয় নিয়ে সংস্কার এবং বিশ্বাসের অত্যধিক প্রাচুর্য, যাত্রা তার মধ্যে অন্যতম। প্রশ্ন হ'ল যাত্রাকে কেন্দ্র করে লোক-বিশ্বাস অথবা সংস্কারের প্রাচুর্যের কারণ কি? উত্তর খুবই সহজ—সেই অনিশ্চয়তা, যার কথা আমরা প্রথমেই উল্লেখ করেছি। এক জন যখন এক স্থান থেকে অপর স্থানের উদ্দেশে যাত্রা করে, তখন তার যাত্রাপথ যে নির্বিঘ্ন হবে, নিরাপদে গন্তব্যস্থলে পৌছানো যাবে, এমন কথা নিশ্চিত করে বলা যায় না। পথে নানা বাধা, নানা বিঘ্নই ঘটতে পারে যার ফলে হয়ত গন্তব্য-স্থলে পৌছান সম্ভব হ'ল না। তাছাড়া আরও একটা বিষয়ে অনিশ্চয়তা রয়ে গেছে। মানুষ যখন এক স্থান থেকে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করে, তখন কোনো না কোনো একটা লক্ষ্য তার সঙ্গে যুক্ত থাকে। একেবারে উদ্দেশ্যহীন যাত্রা প্রায়শই ঘটে না। অবশ্য একথাও ঠিক যে লক্ষ্যের গুরুত্ব সব ক্ষেত্রে সমান থাকে না। বাড়ী থেকে যে মানুষ দোকান থেকে বিশেষ কিছু উপকরণ ক্রয় করার অভিপ্রায়ে বেরোয় তার লক্ষ্যের সঙ্গে যে ব্যক্তি চাকরীর ইণ্টারভিউ কিংবা ফাইনাল পরীক্ষা দেবার জন্য বেরোয় তার লক্ষ্য সমান নয়। লক্ষ্যের এই

গুণগত পার্থক্যের ওপরই যাত্রা সম্পর্কিত সংস্কার পালনের বাধ্যবাধকতা বিশেষ-ভাবে যুক্ত। মূল কথা হ'ল অনিশ্চয়তার পরিমাণ যে ক্ষেত্রে যত বেশী, সেক্ষেত্রে মানুষকে তত বেশী পরিমাণে সংস্কারের ওপর নির্ভরশীল হতে দেখা যায়। আর এ ব্যাপারে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত কিংবা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যায় উন্নত অথবা অনুন্নত দেশের মানুষের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

এইবার যাত্রার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংস্কারগুলির সন্ধান নেওয়া যেতে পারে। বাড়ী থেকে তিনজন মানুষ কখনই একসঙ্গে যাত্রা করে না, এমন কি তিন ব্রাহ্মণেরও এক সঙ্গে যাত্রা করতে নেই। বিশ্বাস, এর ফলে যাত্রা শুভ হয় না। কারণ তিন সংখ্যাটিকে অন্যান্য নানা ব্যাপারের মত যাত্রার ক্ষেত্রেও অশুভ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। যাত্রার ব্যাপারে রঙের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। লাল রঙকে যাত্রার ব্যাপারে শুভ বলে গণ্য করা হলেও, কালকে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত দৃষ্টিতে দেখা হয়ে থাকে। তাই যাত্রা করে পথে যদি কাউকে কৃষ্ণ বর্ণের কিছু বহন করে নিয়ে যেতে দেখা যায়, যেমন তেল বা আলকাতরা জাতীয় কোন দ্রব্য, সেক্ষেত্রে সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা বাতিল করে গৃহে ফিরে আসতে হয় এবং আবার নতুন করে যাত্রারম্ভ করতে হয়। ঠিক যাত্রার মুখে কোন কিছুর থেকে আঘাত পেলে বিশ্বাস করা হয় যে যাত্রায় বাধা পড়েছে। আঘাত লাভের পরও যাত্রা করলে পথে কোন বড় দুর্ঘটনার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা। তাই এক্ষেত্রে আঘাত লাভের পর সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা না করে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে তবেই যাত্রা করার রীতি। যাত্রাকালীন হাঁচিকে কি দৃষ্টিতে দেখা হয়, তা আমরা আগেই দেখেছি।

যাত্রাকালে যদি কোন বেড়ালকে কাঁদতে শোনা যায় তাহলে তা খুবই অশুভ ইঙ্গিতবাহী বলে গণ্য করা হয়। সেক্ষেত্রে যাত্রা বাতিল করে ফিরে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এবং শুধু তাই নয়, ক্রন্দনরত বেড়ালটির ক্রন্দন দূরীকরণে প্রয়াসী হতে হবে। অন্যদিকে যাত্রা পথে যদি কালো রঙের বেড়ালকে রাস্তা অতিক্রম করে যেতে দেখা যায়, তাহলে তা খুব শুভ ইঙ্গিতবাহী বলে মনে করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশেই এই সংস্কারটির প্রচলন রয়েছে।

আমাদের দেশে কয়লা নিয়ে তেমন গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার গড়ে ওঠে নি, অন্ততঃ পক্ষে যাত্রা সম্পর্কে। কিন্তু পাশ্চাত্য দেশে সংস্কারের ক্ষেত্রে কয়লার একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। যেমন বিশ্বাস করা হয় যে যাত্রাপথে কয়লার টুকরো দেখতে পেলে যাত্রা শুভ হয়। অবশ্য ইংলণ্ডের কোন কোন অঞ্চলে সংস্কার প্রচলিত আছে যে

যাত্রার আগে বাঁ কাঁধের ওপর দিয়ে একখণ্ড কয়লা ছুঁড়ে ফেলে দিলে যাত্রা সার্থক হয়। এক্ষেত্রে যাত্রা করে আর পেছনের দিকে তাকান চলে না। ইংলণ্ডে এমন সংস্কার প্রচলিত আছে যে যাত্রাকে সার্থক করে তুলতে পকেটের মধ্যে কিংবা হাতে রাখা থলিতে একখণ্ড কয়লা রাখতে হয়।

যাত্রা পথে বেড়ালকে অতিক্রম করে যেতে দেখার মত যদি সাদা এবং কালো কুকুরকে অতিক্রম করে যেতে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে যাত্রা শুভ হবে বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে, বিশেষত যদি তা ব্যবসায়িক সম্পর্ক যুক্ত যাত্রা হয়। ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের প্রায় সর্বত্রই এই সংস্কারটি প্রচলিত।

ইউরোপের প্রায় সর্বত্রই এই বিশ্বাস প্রচলিত যে কোন কারণ ছাড়া যদি পা চুলকোয়, তাহলে বুঝতে হবে শীঘ্রই এমন কোন জায়গায় যাওয়া ঘটতে চলেছে যেখানে ইতিপূর্বে যাওয়া হয়নি।

ইংলণ্ডে এবং ইউরোপের বিস্তৃত অঞ্চলে একটি সংস্কার প্রচলিত আছে, সংস্কারটি হ'ল বিবাহোপলক্ষ্যে ভাবী বধূ যখন গীর্জায় যায়, সেই সময়ে পথে যদি সে কোন টিকটিকি দেখে, তবে বুঝতে হবে যে তার দাম্পত্য জীবন মোটেই সুখের হবেনা। ইউরোপের বহু মানুষ রাত্রে পথে বের হবার সময় সঙ্গে এক চিমটে নুন নেয়, উদ্দেশ্য রাত্রের অন্ধকার থেকে রক্ষা পাওয়া। অন্ধকারকে মানুষ ভয় পায়। অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে নানা বিপদ ঘটার সম্ভাবনা। বিষাক্ত সাপ বা অন্য কোন জীবজন্তুর দ্বারা আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে, তাছাড়াও চোর ডাকাতের দ্বারা আক্রান্ত হবারও সমূহ সম্ভাবনা। সর্বোপরি ভূত-প্রেত বা এই ধরণের অশরীরী আত্মার দ্বারাও ক্ষতিগ্রস্ত হবার ভয় থাকে। সেই কারণেই রাত্রিকালীন যাত্রাকে নিরাপদ করার অভিপ্রায়েই এই সংস্কারটির উদ্ভব।

সংখ্যা নিয়েও অসংখ্য সংস্কার প্রচলিত। কোন সংখ্যাকে মনে করা হয় শুভ, আবার কোন সংখ্যাকে বিবেচনা করা হয় অশুভ। যেমন সাত সংখ্যাটিকে খুব সৌভাগ্যের বলে মনে করা হয়। তাই সাত তারিখে যদি কেউ যাত্রা করে, ধরে নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে তার যাত্রা হবে শুভ এবং সার্থক।

প্রাচীন আবিসিনিয়ায় নানা ধরণের সংস্কার প্রচলিত ছিল। এসবের মধ্যে একটি হ'ল— যাত্রাকালে বিশেষত যুদ্ধ বা শিকারের উদ্দেশ্যে যে যাত্রা, সে যাত্রায় বাঁ দিকে যদি কোন ক্ষুদ্রাকৃতির পাখীকে ডাকতে শোনা যায়, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে ঐ যাত্রা পরিত্যক্ত হ'ত। অবশ্য আবিসিনীয়দের কাছে ফেরার সময় বাঁ দিকটি শুভ বলে পরিগণিত হলেও যাত্রা কালে বাঁ দিকটি অশুভ বলে গণ্য হয়ে থাকে।

যাত্রার ব্যাপারে বিশেষ বিশেষ দিনকেও গুরুত্ব দেওয়ার রীতি। আমরা বিশ্বাস করি যাত্রার পক্ষে বুধবারটি আদর্শ। আর এর থেকেই উদ্ভূত হয়েছে এই প্রবাদটির—

মঙ্গলে উষা বুধে পা
যথা ইচ্ছা তথা যা॥

নেদারল্যাণ্ডে সোমবারটিকে যাত্রার পক্ষে অশুভ বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। মালয়ের অধিবাসীরা যাত্রার ব্যাপারে অন্তবিধ সংস্কার মেনে চলে। যাত্রারম্ভের পরই যদি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া চোখে পড়ে, কিংবা নিশাচর কোন পাখীর চীৎকার কানে যায়, অথবা মাথার ওপর দিয়ে কাক উড়ে যায়, তাহলে বুঝতে হবে শীঘ্রই কোন বিপদ ঘটতে চলেছে। এক্ষেত্রে তাই কর্তব্য হ'ল অবিলম্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করা। যাত্রাকালে যে কেবল আমরাই হাঁচিকে অশুভ বলে মনে করি তা নয়, পলিনেশিয়ার মানুষও যাত্রাকালে হাঁচিকে অশুভ বলে বিবেচনা করে থাকে।

১৫. রঙ ও সংস্কার

মনস্তত্ত্ববিদেরা মানব মনের ওপর বিভিন্ন রঙের বিভিন্ন প্রকার প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়েছেন, সংস্কারে বিশ্বাসী মানুষও মানুষের মনের ওপর রঙের প্রভাবকে মেনে নিয়েছেন, তবে এ প্রভাব মানুষের ভাগ্যকে প্রভাবিত করে বলেই শেষোক্তদের বিশ্বাস। অর্থাৎ সংখ্যা, প্রাণী, বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক বস্তুকে কেন্দ্র করে যেমন অসংখ্য সংস্কারের উদ্ভব, তেমন সংস্কারের জগতে বিভিন্ন প্রকার রঙের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকৃত।

অন্যান্য সব উপকরণের মত রঙগুলিকেও দু'টি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক শ্রেণীর রঙ কে শুভ বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। শুভ এবং মাঙ্গলিক কাজে এইসব রঙের বহুল ব্যবহার লক্ষণীয়। তাছাড়া এমন কিছু রঙ আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ করলে মানুষের লক্ষ্য চরিতার্থতা লাভ করে বিশ্বাস। বিপরীতক্রমে আবার কিছু বিশেষ রঙকে অশুভ বলে চিহ্নিত করা হয়ে এসেছে। এই সব তথাকথিত অশুভ রঙ আমাদের দুর্ভাগ্যের সূচক, এগুলি আমাদের ক্ষতির সম্ভাবনাকে ত্বরান্বিত করে। তাই স্বভাবতই মানুষ এইসব রঙকে সর্ব প্রযত্নে পরিহার করে চলতে চেষ্টা করে। রঙকে বিশেষ বিশেষ ধ্যান ধারণার প্রতীক হিসেবে গণ্য করার রেওয়াজ দীর্ঘ দিনের। প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে যেমন আমরা বিভিন্ন ধরণের রঙের সংস্পর্শে আসি, তেমনি বিশেষ বিশেষ রঙের

প্রতি ব্যক্তিবিশেষের দৌর্বল্য কিংবা বিতৃষ্ণা—এটাও এক বাস্তব সত্য। রঙকে বিভিন্ন ধ্যান-ধারণার প্রতীক হিসাবে গণ্য করার সার্থক প্রমাণ বিভিন্ন দেশের জাতীয় পতাকা। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় পতাকায় ভিন্ন ভিন্ন রঙ এবং প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাসকে পরিস্ফুট করতে চাওয়া হয়েছে। যেমন আমাদের দেশের ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকায় যে তিনটি রঙ ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি হ'ল সাদা সবুজ এবং গেরুয়া। সাদাকে সত্য ও পবিত্রতার প্রতীক বলে বলা হয়েছে। সবুজ হ'ল বীর্য তথা তারুণ্যের প্রতীক, অপর পক্ষে গেরুয়া হ'ল ত্যাগের প্রতীক। অতএব সংস্কারের জগতে যদি বিশেষ বিশেষ রঙকে যাদুশক্তি সম্পন্ন শুভ কিংবা অশুভ শক্তির প্রতীক হিসাবে দেখা হয়ে থাকে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই থাকেনা।

বিভিন্ন প্রকার রঙের মধ্যে যেটিকে সংস্কারের জগতে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে সেটি হ'ল কালো। সাধারণভাবে আমরা কৃষ্ণ বর্ণকে যেন ঠিক ভাবে মেনে নিতে পারিনা। বিবাহের জন্য পাত্র অথবা পাত্রী নির্বাচনের সময় কৃষ্ণ বর্ণকে খুব সুনজরে দেখা হয় না। একটা অজানা আশঙ্কা যেন আমাদের মনের ভর করে। দিনের বেলায় আমরা যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি, রাতের বেলায় ঠিক ততটা করি না। আসলে রাতের রঙ কালো, নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নানা প্রকার অশুভ শক্তির উপস্থিতি কল্পিত হয়। বাড়ীতে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে আমরা দিনের বেলার তুলনায় রাত্রিবেলায় তাকে নিয়ে বেশী চিন্তিত হই। কারণ রাত্রি হ'ল অন্ধকারাচ্ছন্ন। অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বা শক্তিদের আমরা কৃষ্ণ বর্ণের বলেই কল্পনা করি। ভূত, প্রেত, চোর ডাকাত ইত্যাদিদের আমরা ভুলেও অন্য বর্ণের বলে ভাবতে পারিনা। যা কিছু অশুভ বা যা কিছু ক্ষতিকারক, তাদের সকলের সঙ্গেই কালোর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। সংস্কারের জগতেও কালো রঙের সম্পর্কে একই ধারণা। বলা হয় সকাল বেলায় কাল রঙের বেড়াল বা কুকুর দেখা খুবই খারাপ। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করার যে প্রাণীদের অশুভ বলা হচ্ছেনা, যত অশুভ ব্যাপারের জন্য তাদের গায়ের রঙকেই দায়ী করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রকার পাখীদের মধ্যে কাককে যে একটু বেশী বিতৃষ্ণার দৃষ্টিতে দেখি, তার জন্যে তার অন্যান্য সব ত্রুটির সঙ্গে গায়ের রঙও দায়ী। সংস্কারের জগতে মুখ্যতঃ রঙের জন্যই কাককে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। গৃহ থেকে যাত্রা করেই কোন ব্যক্তি যদি কাউকে কৃষ্ণ বর্ণের কিছু বহন করে নিয়ে যেতে দেখে,তাহলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে সে এবং নতুন করে আবার যাত্রারম্ভ করতে হয়। কারণ তা না হলে যাত্রা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা।

একেবারে সকালবেলায় কৃষ্ণ বর্ণের পোশাকে সজ্জিত কাউকে দেখাটাও অশুভ ব্যাপার বলে গণ্য করার রীতি। কোন শুভ বা মাঙ্গলিক কাজে হিন্দুরা কখনও কৃষ্ণ বর্ণের পাত্র ব্যবহার করেনা। আনন্দোৎসবে কখনও কালো শাড়ী মেয়েরা পরিধান করেনা, এমনকি কাউকে এই রঙের শাড়ী উপহারও দেয়না। বিবাহের সময় নববধূ কখনই কালো রঙের শাড়ী পরিধান করেনা। সর্পাঘাতে আহত ব্যক্তি যদি কালো রঙের শাড়ী পরিহিতা কোন স্ত্রীলোককে দেখে তাহলে তার জীবনের আশা খুব কম থাকে বলে বিশ্বাস। এমন কি কোন বালিকা যদি কালো রঙের পোশাকে ভূষিত থাকাকালীন অবস্থাতে প্রথম যৌবন অবস্থায় উন্নীত হয়, সেক্ষেত্রে ব্যাপারটিকে খুব অশুভ বলে গণ্য করা হয়। হিন্দুরা কোন শুভ কাজেই কালো রঙের কোন কিছু ব্যবহার করেনা। সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে কেবল শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পত্রই শুধু কালো রঙে মুদ্রিত হয়। মুসলমানরাও এই রঙটিকে তেমন সুনজরে দেখেনা। মহরমের দশদিনের দিন এরা আটা দিয়ে প্রস্তুত পিঠে তৈরী করে খায় এবং শহীদ ইমমে হোসেনের স্মৃতিচারণ করে। এই পিঠে যে কক্ষে বা স্থানে প্রস্তুত হয়, সেখানে কালো রঙের শাড়ী পরিহিতা কোন স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার নেই।

কৃষ্ণ বর্ণের ব্যাপারে আবার বিপরীত বিশ্বাসের পরিচয়ও পাওয়া যায়। আমাদের প্রিয় দেবতা কৃষ্ণের গায়ের রঙ কালো, সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী দেবী কালী মূর্তির গায়ের রঙও কালো। বিশ্বাস প্রচলিত আছে যে কৃষ্ণ বর্ণের গাভীর দুধ সুস্বাদুই নয়, অধিকতর পুষ্টিকারক। বিগ্রহের অভিষেকের সময়েও কালো গরুর দুধ অপরিহার্য উপকরণ। দেবতার কাছে বলিদানের জন্য বিশেষ ভাবে যে প্রাণীটি নির্বাচিত হয়, সেই ছাগলও কৃষ্ণ বর্ণের হওয়া চাই। কালো ঘোড়াকে অত্যন্ত মহার্ঘ সম্পদ রূপে বিবেচনা করা হয়। অশুভ শক্তিকে প্রতিরোধ করার ব্যাপারেও এই রঙটির উপরে অনেকখানি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। বেড়াল নিয়ে যত সংস্কার প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরিচিত হ'ল কালো বেড়াল সম্পর্কিত সংস্কারটি। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কালো বেড়ালকে শুভ ও সৌভাগ্যের প্রতীক বলে গণ্য করা হয়। বিশেষত যাত্রাকালে কোন কালো বেড়াল যদি পথ অতিক্রম করে যায় তবে তাকে খুবই সৌভাগ্যের ব্যাপার বলে গণ্য করা হয়।

কালোর পরেই যে রঙটির উল্লেখ করতে হয়, সেটি হ'ল লাল। হিন্দুরা এই রঙটিকে বিশেষ গুরুত্ব দান করে থাকে, কারণ শক্তির সঙ্গে এই রঙের গভীর

সম্পর্ক। শক্তির উপাসক সর্বদাই লাল রঙের কাপড় পরিধান করে। লালের শুভ ও মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের গভীর যোগ। তাই অন্নপ্রাশন, বিবাহ, উপনয়ন ইত্যাদির মত অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ পত্র রক্তিম বর্ণে মুদ্রিত করা হয়। বিবাহিতা রমণী মাথায় লাল সিঁদুর দেয়, পায়ে দেয় আলতা, হাতে থাকে লাল পলা বা রুলী। আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে লাল রঙকে যুক্ত করে দেখা একটা অতি প্রচলিত সংস্কার। এর কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, রক্তের রঙও যেহেতু লাল, তাই এই রঙটির যাদু ক্ষমতায় মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস সুগভীর। বিশেষতঃ ডাইনী বিদ্যার প্রতিরোধে এবং সাধারণ ভাবে সকল প্রকার অশুভ শক্তির প্রতিরোধে এই রঙটির বিশেষ ভূমিকা স্বীকৃত। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের বহু গ্রামবাসী বিশ্বাস করে থাকেন লাল রঙয়ের গরুর মাংস সর্বাপেক্ষা উপাদেয়। ইংলণ্ডে দীর্ঘদিন ধরে একটি ছড়া প্রচলিত আছে। ছড়াটি হ'ল—

Something old, something new,
Something borrowed, something blue,

ছড়াটি বিবাহ সম্পর্কিত। বিবাহে কি কি আচার আচরণ পালন করা কর্তব্য, তারই নির্দেশ রয়েছে ছড়াটিতে। আপাতত ছড়াটির অন্যান্য প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে 'Something blue' এই অংশটির ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা যেতে পারে। বলা হয়েছে বিবাহিত জীবন সার্থক করে তোলার জন্যে বিয়ের কনেকে পরতে হবে আকাশী রঙের পরিচ্ছদ। আকাশের রঙ হল নীল, তাই নীলকে স্বর্গের রঙ বলে কল্পনা করা হয়েছে। বর্তমানে অবশ্য এই রঙ রূপান্তরিত হয়েছে সাদায়। অর্থাৎ এখনকার দিনে ইংলণ্ডে বিবাহের সময় কনে সাদা পরিচ্ছদে ভূষিত হয়ে থাকে। কারণ সাদা হ'ল পবিত্রতা ও সরলতার প্রতীক। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, আমাদের সমাজে লালকে যতই শুভ বলে বিবেচনা করা হোক, ইংলণ্ডে বিবাহে লালের কোন স্থান নেই। এমন কি এখানে লালকে অত্যন্ত অশুভ রঙ বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। আর তাই কনের পোশাকে যদি এক ফোঁটা রক্তের দাগ পড়ে, তাহলে বিশ্বাস করা হয় যে কনে মোটেই দীর্ঘজীবী হবে না।

অন্যান্য রঙের মধ্যে সবুজ রঙটিকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। বলা হয় সবুজ হ'ল হিংসার প্রতীক। কেউ যদি সর্বপ্রথম সোনালী রঙএর কোন প্রজাপতি দেখে তাহলে বিশ্বাস অদূর ভবিষ্যতে সে রোগে আক্রান্ত হবে। তবে সাদা প্রজাপতি দেখা ভাল। অবশ্য স্কটল্যাণ্ডে প্রচলিত সংস্কার হ'ল যে কোন

মরণাপন্ন রোগীর কাছে যদি কোন সোনালী রঙের প্রজাপতিকে উড়তে দেখা যায় তবে তা শুভ ইঙ্গিতবাহী। এইভাবে বিভিন্ন রঙ নিয়ে কত যে সংস্কার তৈরী হয়েছে, তার আর ইয়ত্তা নেই। আর এইসব সংস্কার থেকে আমরা মানুষের বিচিত্র মানসিকতা সম্পর্কে জানতে পারি। তবে সংস্কারের অন্যান্য ক্ষেত্রে যে স্ববিরোধিতা লক্ষণীয়, রঙ সম্পর্কিত সংস্কারও তার ব্যতিক্রম নয়, এটা মনে রাখা দরকার।

১৬. হাঁচি ও সংস্কার

সংস্কারের জগতে 'হাঁচি' এক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। ঠিক বেরোবার মুখে যদি কেউ হেঁচে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে যাত্রা করতে উদ্যত ব্যক্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাময়িকভাবে যাত্রায় বিরতি দিয়ে অপেক্ষা করে। কারণ এ ক্ষেত্রে ধরে নেওয়া হয়, যাত্রায় বাধা পড়েছে। অতএব এক্ষেত্রে কিছু সময় অপেক্ষা করে তবে গন্তব্যস্থলের উদ্দেশে যাত্রা করা বিধেয়। আবার কোন বিষয়ে কথা বলার সময় যদি কেউ হেঁচে ফেলে, তাহলে আমরা ধরে নিই যে কথা হচ্ছিল তা যথার্থই সত্য। তাই কথার পিঠে হাঁচি হলে তাকে বলা হয় 'সত্যি হাঁচি'। তাহলে দেখা যাচ্ছে আমরা হাঁচিকে সময় বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে গ্রহণ করি। কখনও তা বাধাস্বরূপ বিবেচিত, আবার কখনও তা সমর্থন সূচক হয়ে দেখা দেয়।

অথচ আমরা জানি কোনো রোগ জীবাণু বা মানুষের পক্ষে ক্ষতিকারক এমন কোনো পদার্থ যদি নাকের ভেতর দিয়ে শরীরে ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে সেক্ষেত্রে নাকের স্নায়ু কেন্দ্রগুলি জোর করে তাকে বহিষ্কার করে দিতে উদ্যত হয়, আর তার ফলেই হাঁচি হয়। কিন্তু এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সংস্কারের ক্ষেত্রে অচল। আর মজার কথা হ'ল, হাঁচিকে নিয়ে সংস্কার যে কেবল আমাদের দেশেই বিদ্যমান তা নয়; পৃথিবীর বহু দেশেই হাঁচি নিয়ে অসংখ্য সংস্কার তৈরী হয়েছে। এবং বহু ক্ষেত্রেই হাঁচিকে কোনো না কোনো অর্থে বাধাস্বরূপ বলেই গণ্য করা হয়েছে। যেমন, ইংলণ্ডে তো এক এক বারে হাঁচির অর্থ এক একরকম বলে ধরা হয়। সোমবার হাঁচি হলে তার যা ইঙ্গিত, মঙ্গলবার হাঁচি হলে তার তাৎপর্য থেকে তা ভিন্ন। এই প্রসঙ্গে ইংলণ্ডে হাঁচি নিয়ে বহুল প্রচলিত ছড়াটি উদ্ধার করে দেওয়া গেল—

Sneeze on Mondey, sneeze for danger,
Sneeze on Tuesday, kiss a stranger,

Sneeze on wednesday, get a letter,
Sneeze on Thursday, something better,
Sneeze on Friday, sneeze for sorrow,
Sneeze on Saturday, see your true love tomorrow,
Sneeze on Sunday, The Devil will have you
the rest of the week.

এইবার দেখা যাক পৃথিবীর অপরাপর দেশের মানুষেরা হাঁচিকে কিভাবে গ্রহণ করে থাকে। ওয়েল্‌সের অধিবাসীরা হাঁচিকে দুর্ভাগ্যের প্রতীক বলে বিশ্বাস করে; আমেরিকায় কোন ব্যক্তি কথা বলতে বলতে যদি হেঁচে ফেলে তাহলে বিশ্বাস করা হয় যে সেই ব্যক্তি সত্য কথা বলছে। কিন্তু খাবার টেবিলে খেতে বসে যদি কেউ হেঁচে ফেলে, তাহলে ধরে নেওয়া হয় যে ঐ ব্যক্তির পরবর্তী আহার্য গ্রহণের আগেই এক নতুন বন্ধু লাভ ঘটবে। আমেরিকানরা আমাদের মতই বিশ্বাস করে থাকে যে কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে যাত্রা করার মুখে যদি কেউ হেঁচে ফেলে, তাহলে সেই ব্যক্তির যাত্রা ব্যর্থ হবে। অর্থাৎ যে উদ্দেশ্যে ব্যক্তিটি যাত্রা করছিল, তা সাফল্যমণ্ডিত হবে না। আবার যদি এমন হয় যে হাঁচবার চেষ্টা করেও হাঁচি হ'ল না, তাহলে সেক্ষেত্রে ধরে নিতে হবে যে কেউ একজন ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসে, কিন্তু সাহস করে সে তার ভালবাসার কথা প্রকাশ করতে পারছে না। চীনারা বিশ্বাস করে নববর্ষের ঠিক প্রাক্কালে যদি কেউ হাঁচে, তাহলে তার নতুন বছরটাই খারাপভাবে অতিবাহিত হবে। কিন্তু জাপানীরা আবার বিশ্বাস করে যে একটি হাঁচির অর্থ হ'ল অপর কেউ, যে হাঁচছে তার সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় রত। কিন্তু হাঁচির সংখ্যা যদি এক ছাড়িয়ে দুইয়ে পৌছায়, তাহলে বুঝতে হবে অপরে নিন্দা-মন্দ করছে। সায়ামিজরা (Siamese) বিশ্বাস করে ভগবান সর্বদা বিচারের খাতার পাতা উল্টে চলেছেন। আর যখনই তিনি ব্যক্তি বিশেষের নাম নিয়ে পর্যালোচনা করেন, তখনই বিবেচ্য ব্যক্তির হাঁচি হয়, কিংবা বলা যায় বিবেচ্য ব্যক্তি হাঁচতে বাধ্য হয়। অপর পক্ষে গ্রীক এবং রোমানরা বিশ্বাস করে যে হাঁচি হ'ল আত্মার সতর্কীকরণ। ভবিষ্যতে ভাল অথবা মন্দ কিছু যে একটা ঘটতে চলেছে, হাঁচি তারই পূর্বাভাস। তবে কথোপকথনের সময় হাঁচি হলে এরা আমাদের মতই বিশ্বাস করে যে বিষয়ে কথা হচ্ছে সেটি যথার্থ।

হাঁচিকে আবার কখনও কখনও অফুরন্ত জীবনী শক্তির দ্যোতক হিসাবেও

গণ্য করা হয়ে থাকে। আর এইভাবে গণ্য করার কারণ হলেন প্রমিথিউস। বলা হয়, স্বর্যের কাছে থেকে মৃন্ময় মূর্তি অপহরণ করে আগুনের সাহায্যে প্রমিথিউস সেই মৃন্ময় মূর্তিতে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। আর এই কার্য সম্পাদনের সময় তাঁর হাঁচি হয়েছিল।

সাম্প্রতিককালে আমেরিকানরা অবশ্য আহারের সময়ে হাঁচি হলে তা পরিবারের কারোর মৃত্যুর সম্ভাবনার ইঙ্গিতবাহী বলে বিবেচনা করে।

স্থদূর অতীতকালে হাঁচিকে মানসিক আক্রমণ বলে গণ্য করা হ'ত। কিংবা ধরে নেওয়া হ'ত যে পিশাচের অধিকারভুক্ত হওয়ার ইঙ্গিত এ'টি। কারণ বিশ্বাস করা হ'ত যে পিশাচ বা দানবেরা মানুষের দেহে প্রবেশ করার জন্য উদ্‌গ্রীব, আর তাদের প্রবেশের পথ হ'ল মানুষের দেহের রন্ধ্র, বিশেষত নাসারন্ধ্র। তাই নাসারন্ধ্র দিয়ে যাতে পিশাচ বা দানব দেহের মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে, সেজন্যে রেওয়াজ চলে এসেছে নাকে মাকড়ী জাতীয় কিছু পরার, অথবা মাদুলী বা এই জাতীয় কিছু ধারণ করার। আমাদের দেশের মেয়েরা যে নাকে নাকছবি পরে, তারও মূল হয়ত বা এই বিশ্বাসের মধ্যেই নিহিত। ইন্দোনেশিয়ার celebes দ্বীপের অধিবাসীরা মৃত ব্যক্তির দেহের মধ্যে যাতে শয়তান প্রবেশ করতে না পারে সেজন্যে মাছ ধরার বঁড়শি মৃত ব্যক্তির নাসারন্ধ্রে দিয়ে দেয়। চীন দেশে আবার মৃত ব্যক্তির নাসারন্ধ্র তেজোহীন কিংবা শ্রান্ত অথবা অকর্মণ্য ঘোড়ার মাংস খণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়ার রীতি ছিল। এক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য ছিল একই।

হাঁচির পর ইংরেজরা বলে, 'ভগবান আশীর্বাদ করুন' (May god bless you !)। কিন্তু জুলুরা বলে, 'আমি আশীর্বাদ ধন্য।' সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে রেওয়াজ ছিল কেউ হাঁচলে সঙ্গে সঙ্গে মাথার টুপিটি খুলে ধরা। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে বিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক থুকিদিদিস হাঁচিকে মড়ক বা মহামারীর লক্ষণ বলে গণ্য করার মানসিকতা লক্ষ্য করেছিলেন। তখনকার দিনে হাঁচি হলে তার প্রতিকারের জন্য অনৈসর্গিক ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার ওপর যে জোর দেওয়া হ'ত, তাও থুকিদিদিসের দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। হাঁচি হলে আমরা যেমন বলি 'জীব জীব,' তেমনি পাশ্চাত্য দেশে হাঁচি হলে সকলে 'god bless you' বলে প্রার্থনা জানায়। এইভাবে হাঁচি হলে প্রার্থনা জানাবার রীতি চালু হয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর যিনি এ'টি চালু করেন, তিনি হলেন 'পোপ গ্রেগরী দি গ্রেট।'

রোমে এক সময় ভয়ঙ্কর মহামারী দেখা দেয়। তখন পোপ গ্রেগরী এর প্রতিষেধক হিসাবে সকলকে 'god bless you' বলার পরামর্শ দেন। এর সঙ্গে ক্রশ চিহ্ন ব্যবহার করার কথাও অবশ্য বলা হয়েছিল। মোটের ওপর দেখতে গেলে আধুনিক কালেও হাঁচি সংক্রান্ত সংস্কারগুলিকে একটা অনৈসর্গিক ব্যাপার বলেই গণ্য করা হয়ে থাকে। যাত্রার সময় যদি ডানদিকে হাঁচি হয়, তাহলে যাত্রা শুভ বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু ডানদিকের পরিবর্তে যদি বাঁ দিকে হাঁচি হয়, তবে তা অশুভ বলেই বিবেচিত হয়। ইউরোপের কোন কোন অংশে পর পর তিনবার হাঁচি হলে ধরে নেওয়া হয় চারটি চোরের উপস্থিতি ঘটবে। অনেক জাপানী বিশ্বাস করে, একবার হাঁচির অর্থ—ভগবানের আশীর্বাদ ধন্য হওয়া, কিন্তু দু'বার হাঁচির অর্থ দোষী বলে সাব্যস্ত হওয়া। আর তিনবার হাঁচি হলে বুঝতে হবে অসুখে পড়তে আর বেশী দেরী নেই। Estonia তে যদি দু'জন গর্ভিনী একযোগে হাঁচে, তাহলে তারা যমজ সন্তান লাভ করে বলে সংস্কার প্রচলিত। এতসব পড়ে পাঠক ভাবতে পারেন, তাহলে হেঁচে আর দরকার নেই, এমন কি নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচার আগেও অনেকে ভাবতে পারেন যেচে ঝামেলায় যাবার প্রয়োজন কি? না, নাকে কাঠি দিয়ে জোর করে হাঁচির ব্যবস্থা করলে তার তাৎপর্য কি হবে, সংস্কারে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি। তাই এই প্রসঙ্গে লেখকের নিবেদন, হাঁচি যদি একান্ত পায়ই, পরিণামের কথা ভেবে তাকে বলপূর্বক আটকে রাখার কোন মানে নেই। বরং ভালভাবে হেঁচে তার পরে যদি কিছু ঘটেই তো তার মোকাবিলা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কিত (Taboo)

১। সোম ও বুধবারে সঞ্চয়ে হাত দিতে নেই। এমন কি এই দু'দিন খাবার জন্যেও ঋণ করতে নেই—

সোমে বুধে দিওনা হাত
ধার করে খেয়োনা ভাত।

২। বাসি মুখে, বাসি কাপড়ে কাসুন্দি ছুঁতে নেই, ছুঁলে নষ্ট হয়ে যায়।

৩। সকালে বাসিমুখে এবং ভর সন্ধ্যেবেলা মিথ্যা কথা বলতে নেই।

৪। ফলন্ত গাছ কাটতে নেই। কাটলে পরিবারের অকল্যাণ হয়।

৫। চালের পাত্র একেবারে শূন্য রাখতে নেই ;

৬। পয়সা রাখার ব্যাগ বা পাত্রও শূন্য রাখতে নেই।

৭। শেষে শূন্য অঙ্ক বিশিষ্ট টাকা দিতে নেই। তাই ১০, ২০, ৩০, ৪০— অঙ্কের টাকা না দিয়ে ১১, ২১, ৩১, ৪১—এই রকম অঙ্কের টাকা দিতে হয়।

৮। বৃহস্পতিবারে বাড়ী থেকে টাকা বার করতে নেই।

৯। কোন জিনিস তিনটি সংখ্যায় কাউকে দিতে নেই। দিলে গ্রহণকারী ব্যক্তি শত্রু হয়। 'তিনশত্রু দিতে নেই' প্রবাদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

১০। কোন জিনিস চিরকালের মত কাউকে দিয়ে তা আর ফেরৎ নিতে নেই। নিলে কালীঘাটের কুকুর হয়।

১১। বিদায় নেবার সময় 'যাই' বলতে নেই। বলতে হয় 'আসি'। 'যাই' বললে চিরকালের মত যাওয়া বোঝায়।

১২। বালিশে বসতে নেই, বসলে পেছনে ফোঁড়া হয়।

১৩। ভাঙ্গা আয়নায় মুখ দেখতে নেই, দেখলে বদনামের ভাগী হতে হয়।

১৪। লঙ্কা কখনও কারো হাতে তুলে দিতে নেই। দিলে লঙ্কাগ্রহণকারীর সঙ্গে সম্পর্ক খুব বিষিয়ে যায়। তাই লঙ্কা একটা জায়গায় রেখে দিতে হয়। সেখান থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিজে নিজেই গ্রহণ করে।

১৫। টাকা কখনও বাঁ হাত দিয়ে কাউকে দিতে নেই। দিলে গ্রহণকারী তা বিস্মৃত হয়ে যায়। অর্থ হল লক্ষ্মী, বাঁ হাত দিয়ে টাকা দিলে লক্ষ্মীরও অমর্যাদা হয়।

১৬। সন্ধ্যার পর জোনাকি পোকা ধরতে নেই। ধরলে পায়খানা পায়।

১৭। শাঁখ (বাজাবার) শুধু মেঝেয় রাখতে নেই। কোন কিছুর ওপর রাখতে হয়।

১৮। মঙ্গলবার খরবার, সেদিন নতুন কাপড় পরতে নেই।

১৯। বুধবারেও নতুন কাপড় পরতে নেই। কারণ—

'বুধে সাত পুতে নেঙটা'।

২০। কাঁজি কাউকে দিতে নেই। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

কান্‌জি চাইলে ঝাড়া মারিও,
দুধ চাইলে হাঠ্যা দিও।

'কাঁজি' শব্দটি এসেছে 'কাঞ্জিক' থেকে। যার অর্থ হ'ল আমানি বা সজল ভাত থেকে প্রস্তুত সিরকা।

২১। রাত্রিবেলা কর্পূর বিক্রয় নিষিদ্ধ।

২২। বাস্তু সাপ মারতে নেই।

২৩। ক্ষুদ্রাকৃতি তেঁতুলে বিছে সচরাচর যা সরস্বতী বিছে নামে পরিচিত, তা মারতে নেই।

২৪। দরজার চৌকাটে বসতে নেই। বিশেষত সন্ধ্যার সময়।

২৫। কোন মানুষকে ডিঙ্গিয়ে যেতে নেই।

২৬। সন্ধ্যের পর বেলগাছে উঠতে নেই, উঠলে ব্রহ্মদত্যি আক্রমণ করে।

২৭। আসন, বাসন ও নিজের গা বাজাতে নেই। বাজালে লক্ষ্মী ছেড়ে যান—আসন, বাসন, গা তিন বাজাবে না।

তিন বাজাবে যখন ; লক্ষ্মী ছাড়বে তখন॥

২৮। রজ্জুবদ্ধ অবস্থায় গরুকে ডিঙ্গোতে নেই।

২৯। কালির দোয়াত মেঝেতে রাখতে নেই।

৩০। নতুন বস্ত্র নিখুঁত পরতে নেই! তাই সচরাচর মেয়েরা নতুন কাপড় একটু খুঁত যুক্ত করে নিয়ে পরে।

৩১। বঁটি খাড়া রাখতে নেই। রাখলে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সব কাটা যায়।

৩২। রাতের বেলায় 'চোর' শব্দ উচ্চারণ করতে নেই। তার বদলে বলতে হয় 'রাতের কুটুম'। যেমন 'রাতের কুটুম চাঁড়ালের বাড়ী যা'।

৩৩। ঘুমন্ত শিশুকে আদর করতে নেই। করলে শিশুটি ভীষণ জেদী হয়।

৩৪। খেতে বসে গান করতে নেই, করলে লক্ষ্মী ছেড়ে যায়।

৩৫। পায়ে আলতার দাগ থাকলে আলতা পরতে নেই।

৩৬। নষ্টচন্দ্র দেখতে নেই, দেখলে বদনাম হয়। ভাদ্রমাসের চতুর্থীর চন্দ্র নষ্টচন্দ্র নামে অভিহিত হয়।

৩৭। চাল বাছতে বসে কাঁচা চাল মুখে দিতে নেই, দিলে দুঃখী হয়।

৩৮। কারো বগলের তলা দিয়ে গলে যেতে নেই। গেলে বগলে ফোঁড়া হয়।

৩৯। কাউকে চিমটি কাটতে নেই, কাটলে যার গায়ে চিমটি কাটা হয়, তার দেহের রোগ যে চিমটি কাটে তার দেহে চলে আসে।

৪০। ছোট ছেলে-মেয়েদের জাঁতা বা শিলের ওপর বসতে নেই। বসলে অনেক দেরীতে বিয়ে হবার সম্ভাবনা হয়।

৪১। কাউকে ধরে ওঠা-বসা করতে নেই। কারণ এর ফলে যাকে ধরে ওঠা-বসা করা হয়, সে অলস হয়ে যায়।

৪২। সন্তানের জননীকে ডিম ভাঙ্গতে নেই।

৪৩। বিজোড় সংখ্যায় জিনিস কাউকে দিতে নেই।

৪৪। কাউকে একটি জিনিস দিতে নেই, দিলে দাতার মামার হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

৪৫। শিশুকে পশ্চিমদিকে মাথা করে শোয়াতে নেই। কারণ সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়ে পশ্চিমদিকে অস্তমিত হয়। তাই পশ্চিমদিকে মাথা করে ঘুমালে পূর্বদিকে থাকে পা। এতে সূর্যের অসম্মান হয়।

৪৬। পৌষ মাসে বাড়ী থেকে কাউকে তাড়াতে নেই। এমন কি কুকুর বেড়ালকেও নয়। পৌষ মাসে গোলা থেকে ধানও বার করতে নেই।

৪৭। শনি-মঙ্গলবারে মেয়েদের মাথা ধোওয়া নিষিদ্ধ।

৪৮। প্রদীপের তেল গায়ে মাখতে নেই, মাখলে সর্বনাশ অনিবার্য। বিশেষতঃ মহিলাদের, কারণ তাহলে স্বামীর মৃত্যু ঘটে।

৪৯। পৌষ ও মাঘ মাসে গৃহপ্রবেশ, ভিতপূজা ও অন্যান্য শুভকাজ করা বারণ।

৫০। গ্রহণের সময় মলমূত্র ত্যাগ করতে নেই, করলে গ্রহণী রোগ হয়।

৫১। ছেঁড়া ধুতি স্চ নিয়ে সেলাই করে পরলে অতীত বারো বৎসরের দুঃখের পুনরাবৃত্তি ঘটে। তাই ছেঁড়া ধুতি সেলাই করে পরতে নেই।

৫২। কোন শিশুকে বাঁদর বলতে নেই, বললে শিশুর বুদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

৫৩। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের ডিঙ্গিয়ে যেতে নেই। ডিঙ্গোলে বৃদ্ধির ক্ষতি হয়।

৫৪। বাড়ন্ত ফল-ফুলের গাছ আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে নেই। দেখালে গাছের বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়।

৫৫। রাতের বেলায় বাঘকে 'বাঘ' বলতে নেই। বললে বাঘের আবির্ভাব

ঘটে। বলতে হয় 'বড় শিয়াল' বা 'বাবা'। মধ্য ইউরোপে বা স্কাণ্ডিনেভিয়ার লোক-সমাজেও নেকড়ে বাঘকে রাত্রে বলা হয় 'Wood-runner' বা 'Silent one.'

৫৬। মেয়েদের কাটা বা ফেটে যাওয়া চুড়ি পরতে নেই। পরলে অমঙ্গল হয়।

৫৭। ভাজা পিঠের প্রথমটি মেয়েদের খেতে নেই।

৫৮। বাড়া ভাতের প্রথমটা মেয়েদের খেতে নেই।

৫৯। পান কখনও কারো শরীরের উপর দিয়ে অন্য কাউকে দিতে নেই।

৬০। সন্ধ্যার পর মাছ ধরার গল্প বলতে নেই।

৬১। শনি ও মঙ্গলবারে কাউকে গোবর দিতে নেই। অন্য মতে বৃহস্পতিবার ও মঙ্গলবারে বাড়ীর বাইরে গোবর দেওয়া নিষেধ।

৬২। সন্ধ্যের পর চুন ও খয়েরকে চুন ও খয়ের বলতে নেই।

৬৩। অশৌচ অবস্থায় কাউকে প্রণাম করতে নেই।

৬৪। কোন শুভকাজে মেয়েদের কালোপেড়ে কাপড় পরতে নেই।

৬৫। মা ও বাবা জীবিত থাকতে ছেলেকে থান পরতে নেই।

৬৬। দেবীপক্ষ ছাড়া কিছু না খেয়ে, স্নান করে নতুন কাপড় পরতে নেই।

৬৭। স্বামীকে সিঁদুর আনতে বলতে নেই।

৬৮। শাঁখা ভেঙ্গে গেছে বলতে নেই, বলতে হয় শাঁখা বেড়ে গেছে।

৬৯। এলোচুলে সিঁদুর পরতে নেই।

৭০। শনি-মঙ্গলবারে কাউকে গঙ্গাজল কিংবা গব্যঘৃত দিতে নেই।

৭১। কুনকে যা দিয়ে ধান চাল মাপা হয়, তা খালি রাখতে নেই।

৭২। গায়ে জামা পরা অবস্থায় তা সেলাই করতে নেই। সেলাই করলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।

৭৩। অশৌচের সময় তেল মেখে স্নান করতে নেই।

৭৪। সাধারণ সময়ে রুক্ষ স্নান করতে নেই।

৭৫। সেলাইকরা জামা পরে পূজো করতে নেই।

৭৬। বৃহস্পতিবারে নখ কাটতে নেই।

৭৭। ছেলের জন্মবারে মায়েদের নখ কাটতে নেই।

৭৮। দা অথবা কাঁচির ওপর বসতে নেই, বসলে দাঁতে পোকা হয়।

৭৯। কুয়ার জলে নিজের ছায়া দেখতে নেই। দেখলে গা-ফোলা রোগ হয়।

৮০। আগুনে নুন পোড়াতে নেই। পোড়ালে মুখে দাগ পড়ে যায়।

৮১। এক পায়ে প্রণাম করতে নেই। করলে যাকে প্রণাম করা হয় তার পায়ে গোদ হয়।

৮২। শনিবারে নখ কাটতে নেই, কাটলে ভাইয়ের দোষ হয়।

৮৩। কুষ্ঠ রোগের নাম ধরতে নেই, বলতে হয় বড়রোগ বা মহারোগ।

৮৪। শিশুদের হাম হলে বলতে নেই, বলতে হয় মাসীপিসি বেরিয়েছে।

৮৫। হলুদকে হলুদ বলতে নেই, বলতে হয় বর্ণ বা বন্ন।

৮৬। বুধবারে এবং শুক্রবারে কোন কিছু পোড়ানো নিষিদ্ধ। বুধবারে পোড়ালে বুদ্ধিনাশ, আর শুক্রবারে পোড়ালে সুখনাশ হয়।

৮৭। ভাত খাওয়ার কাপড় পরে শুতে নেই, শুলে রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়।

৮৮। সধবাদের মাসিক হলে চারদিনের দিন স্নান করে তবে শুদ্ধ হয়। তার আগে সিঁদুর পরতে নেই, কিংবা কোনো শুভকাজে বা ঠাকুর পূজায় অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ।

৮৯। নবজাতককে ছ'দিনের আগে নতুন জামা পরতে নেই।

৯০। কারো বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার পর পাতা তুলতে নেই। তুললে ভবিষ্যতে ঐ ব্যক্তির বাড়ীতে আর পাতা পড়ে না।

৯১। ছাঁচি কুমড়ো যা বলির কুমড়ো নামে পরিচিত, তা মেয়েদের কাটতে নেই।

৯২। সন্ধ্যাবেলা গোলমরিচ বিক্রয় নিষিদ্ধ। সংস্কার, গোলমরিচ হারানো দোষের। একটি গোলমরিচ হারাবার ফলে এক বছর পর্যন্ত দুঃখ ভোগ করতে হয়।

৯৩। মেয়ের, বাপের কাঁধে বসতে নেই। বসলে চালের দাম বাড়ে।

৯৪। মেয়ের চুল ধরতে নেই, ধরলে যে ধরে তার আয়ু কমে।

৯৫। বোনেদের রাত্রিবেলায় আঙুল মটকাতে নেই, মটকালে ভায়েদের অমঙ্গল হয়।

৯৬। নুন নাম করে চাইতে নেই, বলতে হয় 'চিনি'।

৯৭। পশুবলির সময় পশুর ডাক শুনতে নেই।

৯৮। নারকেল গাছ ব্রাহ্মণ গাছ, তাই কাটতে নেই।

৯৯। ভাদ্র ও পৌষ মাসে গরু বিক্রয় করা হয় না। এই সময়ে কাউকে

গোবর দেওয়া নিষিদ্ধ। এই সময় গোয়ালে মাটি লেপানোও নিষিদ্ধ।

১০০। রাত্রে সোডা, আমলকি, বয়ড়া, হলুদ এবং সিঁদুর বিক্রয় নিষিদ্ধ।

১০১। রাত্রে খালি বস্তা বা টিন বিক্রয় করতে নেই।

১০২। সন্তানের জন্মবারে উনুন তৈরী করতে নেই। উনুনে মাটিও দিতে নেই।

১০৩। দু'ধারে দু'জন লোক দাঁড়িয়ে থাকলে মেয়েদের মাঝখান দিয়ে জল নিয়ে যেতে নেই। দুজনে একপাশে সরে দাঁড়ালে তবেই জল নিয়ে যেতে পারে।

১০৪। ভিখারীকে বাড়ীর ভেতর ভিক্ষা দিতে নেই। বাড়ীর বাইরে থেকে ভিক্ষা দিতে হয়।

১০৫। মেয়েদের এলোমাথায় ভিক্ষে দিতে নেই, ঘোমটা মাথায় দিয়ে ভিক্ষা দিতে হয়।

১০৬। গোয়ালে মেয়েদের স্নানের পর খোলা মাথায় ঢুকতে নেই।

১০৭। রাত্রে জোনাকি পোকা ধরতে নেই, ধরলে জ্বর হয়।

১০৮। ভাদ্র ও পৌষ মাসে সন্ধ্যার পর কাউকে কিছু ধার দিতে নেই।

১০৯। মা ও বাবা জীবিত থাকতে তাঁদের ছবি টাঙ্গাতে নেই।

১১০। গামছা রোদে দিতে নেই।

১১১। বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের খুঁটি বা দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসতে নেই।

১১২। সিঁদুর ফুরিয়ে গেলে নেই বলতে নেই, বলতে হয় বাড়ন্ত।

১১৩। সধবাদের খালি হাত করতে নেই।

১১৪। সন্ধ্যেবেলা শুয়ে থাকতে নেই।

১১৫। সধবাদের শাড়ীর আঁচল মাটিতে ফেলে বসতে নেই।

১১৬। চুল মাটিতে ঠেকিয়ে বসতে নেই।

১১৭। বেলা বারোটার পর চাল ভিক্ষা দিতে নেই।

১১৮। ছেঁড়া গেঞ্জি পরতে নেই, সেলাই করেও পরতে নেই।

১১৯। মাথায় হাত দিয়ে বসতে নেই।

১২০। শাঁখ একবার বাজাতে নেই।

১২১। দরজার মাথায় গামছা রাখতে নেই।

১২২। থালায় শুধু ভাত দিতে নেই।

১২৩। কুমারী মেয়েদের আলতার ওপরে আলতা পরতে নেই।

১২৪। ভাত বেড়ে চলে যেতে নেই।

১২৫। শনি-মঙ্গলবারে গোবর গঙ্গাজলের ছড়া দিতে নেই।

১২৬। শুক্রবারে নখ কাটা নিষেধ। কারণ—

শুক্রবারে কাটে নখ,
সেই সঙ্গে কাটে সুখ॥

১২৭। ভাদ্রমাসে ঝাঁটা কিনতে নেই।

১২৮। শুক্রবারে মোচা কুটতে নেই।

১২৯। শিশুর অন্নপ্রাশনের সময় সন্তানের খাওয়া মা-বাবার দেখতে নেই।

১৩০। সন্ধ্যাবেলা মেয়েদের খালিচুলে বাইরে যেতে নেই, তাতে দুঃখ বাড়ে, স্বামী অনাদর করে।

১৩১। ছেলেদের পাতের এঁটো নুন খেতে নেই।

১৩২। জন্মদিনে নখ ও চুল কাটতে নেই।

১৩৩। চৈত্র, পৌষ, ভাদ্র এবং কার্তিক মাসের সংক্রান্তিতে নিজের বাড়ীর বাইরে রাত কাটাতে নেই।

১৩৪। হিন্দু বিধবার এক সূর্যে দু'বার ভাত খেতে নেই।

১৩৫। ছেলেদের জন্মবারে ক্ষার সেদ্ধ করতে নেই।

১৩৬। মেয়েদের কালো টিপ পরতে নেই।

১৩৭। সকালে ধোপার নাম বলতে নেই।

১৩৮। কাঠবিড়ালীকে হত্যা করতে নেই, করলে ব্রাহ্মণ হত্যার পাপে লিপ্ত হতে হয়।

১৩৯। গরুর গোবর দিয়ে গরুকে মারতে নেই।

১৪০। প্রদীপ বিশেষত পূজার, ফুঁ দিয়ে নিভোতে নেই।

১৪১। শিশুদের ছায়া দেখতে নেই, দেখলে অসুখ করে।

১৪২। সকালে বাসি উঠোন ঝাঁট দেওয়ার আগে কাউকে ধার দিতে নেই।

১৪৩। রবিবারে বাঁশ কাটতে নেই।

১৪৪। মঙ্গলবারে উত্তর দিকে যেতে নেই।

১৪৫। জালা বা কলসী থেকে ঢাকনা বন্ধ না করে জল খেতে নেই। খেলে পূর্ণভাণ্ডার শূন্য হবার সম্ভাবনা।

১৪৬। রান্নার জন্য চাল মাপার সময় মুখে চাল দিতে নেই।

১৪৭। রাত্রিবেলা 'মড়া' শব্দটি উচ্চারণ করতে নেই।

১৪৮। গোটা লাউ মেয়েদের দু'আধখানা করতে নেই। এই নিখুঁত গোটা জিনিসটা কাটা অমঙ্গলজনক। পুরুষেরা এই গোটা জিনিসটা কেটে বা দাগ দিয়ে দিলে তবে মেয়েরা তা কাটতে পারে।

১৪৯। দাহ সেরে শ্মশান থেকে ফেরার সময় পেছনের দিকে তাকাতে নেই। অমঙ্গল হয়।

১৫০। সদ্য যে বিধবা হয়েছে এমন স্ত্রীলোক স্নান সেরে ঘাট থেকে যখন ফেরে তখন কোন সধবার তার মুখ দেখতে নেই, এমন কি সঙ্গেও আসতে নেই।

১৫১। শনিবার ও মঙ্গলবার বাঁশ কাটা নিষেধ।

১৫২। তেল মাথায় দিয়ে গোয়াল ঘরে যাওয়া নিষেধ, গাছপালাতেও হাত দেওয়া নিষেধ।

১৫৩। কালীপূজার দিন এক ডাকে সাড়া দিতে নেই।

১৫৪। বৃহস্পতিবার ধান বিক্রি, চাল সিদ্ধ, কাপড় সিদ্ধ করা নিষেধ।

১৫৫। কোন ঠাকুরতলায় একা যাওয়া নিষেধ।

১৫৬। কোন তাবিজ বা মাদুলি নিয়ে, মারা গেছে যে বাড়ীতে, সে বাড়ীতে যেতে নেই।

১৫৭। কারো বাগান থেকে রাত্রে না বলে ফুল তুলতে নেই।

১৫৮। গরু-বাছুর মারা গেলে কাঁদতে নেই, এতে আরো অমঙ্গল হয়।

১৫৯। শুধু কলা কাটতে নেই, গাছ সমেত কলা কাটতে হয়।

১৬০। শনিবার ও মঙ্গলবার গভীর রাতে বাড়ীতে মাছ নিয়ে আসা নিষেধ।

১৬১। রাত্রিবেলায় বিড়াল এলে তাকে তাড়াতে নেই।

১৬২। সন্ধ্যাবেলায় চাল ধার দিতে নেই।

১৬৩। মালপো, পিঠা খেয়ে কোন শুভ কাজে যেতে নেই।

১৬৪। অশৌচ অবস্থায় গা-হাত পা কাটতে নেই।

১৬৫। রাস্তায় যদি বাঁশ পড়ে থাকে, তবে তা ডিঙ্গোতে নেই।

১৬৬। সন্ধ্যাবেলায় দই-এর সাজা দিতে নেই। দিলেও বলতে হয় 'দম্বল'।

১৬৭। সন্ধ্যায় ধুনো বিক্রয় নিষিদ্ধ।

১৬৮। বাড়ীতে কেউ অসুস্থ থাকলে ভিক্ষা দিতে নেই।

১৬৯। বাড়ীতে গর্ভবতী নারী থাকলে অন্য বাড়ীর লোককে সরষে অথবা হলুদ দিতে নেই।

১৭০। লবণ চারদিকে ছড়াতে নেই, ছড়ালে অসুখে গা জ্বালা করে।

১৭১। এঁটো পাতে ঘি নিতে নেই।

১৭২। মাছি মারতে নেই, মারলে অসুখ হয়।

১৭৩। ডিং মেরে হাঁটা নিষেধ।

১৭৪। মেয়েদের পানের পিক, পানের জল মাড়াতে নেই, মাড়ালে মাসিকের গণ্ডগোল হয়।

১৭৫। দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা নিষেধ।

১৭৬। রাত্রে গাছের ডাল কাটতে নেই।

১৭৭। এঁটো হাতে কারো প্রণাম নিতে নেই অথবা করতে নেই।

১৭৮। রাতে আয়নায় মুখ দেখতে নেই, দেখলে কলঙ্ক রটে।

১৭৯। বিবাহিতা মহিলাকে শায়িত অবস্থায় সিঁদুর বা আলতা পরাতে নেই।

১৮০। দক্ষিণমুখে বঁটি নিয়ে কিছু কুটতে নেই।

১৮১। ভিজে কাপড়ে জল থেকে স্নান করে উঠতে নেই।

১৮২। রাত্রে চুনের হাঁড়িতে হাত দিতে নেই।

১৮৩। এক কাঁধে হাত দিতে নেই, বাবা মারা যান।

১৮৪। পানের জলের ছিটে লাগাতে নেই, ঘা হয়।

১৮৫। স্নান করতে যাবার আগে ভাত বাড়তে নেই, অকল্যাণ হয়।

১৮৬। ক্ষুদ ভিক্ষা দিতে নেই, পরিবারের অকল্যাণ হয়।

১৮৭। গরুর গাড়ীর জোয়ালে বসতে নেই।

১৮৮। খাবার পর এঁটো কুড়োবার সময় জল খেতে নেই, খেলে দরিদ্রতা বাড়ে।

১৮৯। আঁচল গায়ে দিতে নেই, দিলে চুল ওঠে।

১৯০। ঘাটে বসে পা দোলাতে নেই।

১৯১। হাতে লেবু দিতে নেই।

১৯২। পৌষ মাসে ঝাঁটা কিনতে নেই।

১৯৩। বিধবা বা বন্ধ্যা স্ত্রীলোকের মুখ সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে নেই।

১৯৪। এক সন্তানের মা আস্ত লাউ কাটে না, কাটলে সন্তানের ক্ষতি হয়।

১৯৫। রাত্রে চুনে জল দিতে নেই, ভায়ের অসুখ হয়।

১৯৬। সদ্যোজাত শিশুর নখ আঠার মাসের আগে কাটতে নেই।

১৯৭। সদ্যোজাত শিশুর মাথার চুল আঠার মাসের আগে কাটা নিষেধ।

১৯৮। সদ্যোজাত শিশুর মাথার চুল আঠার মাসের আগে আঁচড়াতে নেই।

১৯৯। একই দেশলাই কাঠির আগুনে তিন ব্যক্তির সিগারেট বা বিড়ি ধরাতে নেই।

২০০। গাছের কাঁচা পাতা পোড়াতে নেই।

২০১। কাউকে এক গালে চড় মারতে নেই, মারলে যাকে মারা হয় তার বিবাহ হয় না।

২০২। মামার, ভাগ্নেকে বা ভাগ্নীকে মারতে নেই, মারলে মামার হাত কাঁপে।

২০৩। বিছানায় বসে গায়ে তেল মাখতে নেই।

২০৪। লোহার হাতিয়ার বা দা-কুড়ুল ডিঙ্গোতে নেই।

২০৫। সন্ধ্যার পরে মহিলাদের পোশাক পরিচ্ছদ যা রোদে শুকোতে দেওয়া হয়েছিল, তা বাইরে রাখতে নেই, রাখলে মানসিক রোগ দেখা দেয়।

২০৬। মাসিক হলে পাথরের জিনিস ছুঁতে নেই।

২০৭। দু'জনের মাঝখান দিয়ে আলো নিয়ে যেতে নেই।

২০৮। ঝুনো নারকেল ভাঙ্গার সময় দা' এর ধারাল দিক দিয়ে নারকেলের গায়ে আঘাত করতে নেই, করলে যে গাছের নারকেল, সেই গাছের ভাবী নারকেলের শাঁস খুব পাতলা হয়।

২০৯। রাত্রে বাসনের শব্দ করতে নেই, করলে চোর আসে।

২১০। বাস্তুভিটার কোন বড় গাছ মরে গেলে সেই মরে যাওয়া গাছকে ফেলে রাখতে নেই, যথাসম্ভব শীঘ্র কেটে ফেলতে হয়।

২১১। ধান ঝাড়া ও মাপা এবং খামারে তোলার সময় দাঁড়াতে নেই।

২১২। কাজল পরাবার সময় হাসতে নেই। হাসলে অসুখ করে।

২১৩। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে নেই, কাটলে পরের জন্মে নাপিত হয়ে জন্মাতে হয়।

২১৪। রাস্তায় পড়ে থাকা কাঁচকলার শিরদণ্ড ডিঙ্গোতে নেই, ডিঙ্গোলে অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

২১৫। রবিবার আঁটকুড়োবার, এইদিন নূতন কাপড় পরতে নেই।

২১৬। শনিবার খরবার, এদিন নতুন কাপড় পরতে নেই।

২১৭। নিজের ছায়া মাড়ালে রোগা হয় তাই নিজের ছায়া মাড়াতে নেই।

২১৮। ছোট ছেলে-মেয়ের দাঁত পড়ে গেলে পড়ে যাওয়া দাঁত যে কোন জায়গায় ফেলতে নেই। ফেলতে হয় ইঁদুরের গর্তে। তাহলে নাকি ইঁদুরের মত দাঁত গজায়।

২১৯। রাত্রিবেলায় দোকানদার সূঁচ বিক্রয় করে না।

২২০। মেয়েরা প্রথম ঋতুমতী হওয়ার পর, ঋতুঃস্রাব হবার পরমুহূর্ত থেকে সাতদিন পর্যন্ত কোনো পুরুষ মানুষের দর্শন নিষেধ। এই ক'দিন পারত-পক্ষে মেয়েটিকে ঘরের বাইরে যেতে নেই। বাড়ীর মধ্যে একটি ঘরে সমবয়সী মেয়েদের সঙ্গে ক'টা দিন কাটাতে হয়। এই ক'দিন স্নানও করতে নেই। সাত্ত্বিক আহার্য গ্রহণ করতে হয়।

২২১। ভাদ্র মাসের সংক্রান্তি তিথিতে রাঁধতে নেই। সেদিন অরন্ধন, উনুন জ্বালানো নিষেধ।

২২২। সন্ধ্যাবেলা গাছে হাত দিতে নেই।

২২৩। বাচ্চা নিয়ে সন্ধ্যাবেলা উঠানে বসতে নেই।

২২৪। কুমারী মেয়েদের তুলসী গাছে জল দিতে নেই, দিলে অকাল বৈধব্য ঘটে।

২২৫। ভিখারীকে সের বা কোনাতে (যাতে চাল মাপা হয়) করে ভিক্ষা দিতে নেই।

২২৬। সন্ধ্যাবেলা কোনো জিনিস ছুঁড়ে ফেলতে নেই।

২২৭। শাঁখা খুলে রাখার কথা বলতে নেই, বলতে হয় ঠাণ্ডা করে রাখার কথা।

২২৮। বিয়ের কনের কনকাঞ্জলি দিয়ে আর ফিরে তাকাতে নেই।

২২৯। মেয়েদের সন্ধ্যাবেলা ঘুমাতে নেই।

২৩০। ভাদ্র, কার্তিক, পৌষ এবং চৈত্র মাসে ঝাঁটা-ঝাড়ন নতুন করে কাড়তে নেই।

২৩১। হিন্দুদের পদ্মপাতা উল্টো করে তাতে খেতে হয়, পদ্মপাতা সোজা করে পেতে খেতে নেই।

২৩২। আঁতুড় ঘরে শিশুর নাড়ী না কাটা পর্যন্ত ছেলে বা মেয়ে কি হয়েছে বলতে নেই।

২৩৩। ঘরের মধ্যে কুলো উত্তর মুখ করে রাখতে নেই।

২৩৪। পূর্ণিমা-অমাবস্যায় মাছ মাংস খেতে নেই।

২৩৫। বৃহস্পতিবারে মাছ পোড়া খেতে নেই।

২৩৬। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কোন ভাঙ্গা বা ফুটো থালায় খেতে দিতে নেই।

২৩৭। ঘরের দরজার ঠিক মাঝখানে বসে কিছু খাওয়া নিষেধ।

২৩৮। বরের তুলনায় কনে যদি দীর্ঘ হয়, তাহলে সেই কনের সঙ্গে বিবাহ-দান নিষিদ্ধ।

২৩৯। জামাই ষষ্ঠীর দিন গায়ে সরষের তেল মাখা নিষেধ।

২৪০। জামাইষষ্ঠীর দিন চুল কাটা বা দাড়ি কামানোও বারণ।

২৪১। অগ্রহায়ণ মাসে প্রথম গর্ভজাত কন্যার বিবাহ নিষিদ্ধ।

২৪২। রাত্রিবেলা 'হাতি' বলতে নেই।

২৪৩। সন্তানের জননীর পক্ষে খালি গলায় থাকা বারণ।

২৪৪। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তার ভাল নামে ডাকা বারণ।

২৪৫। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেল, শ্যাওড়া এবং ফুল গাছের কাঠ পোড়ান বারণ।

২৪৬। ঘরে ঝাঁট দেবার সময় ঝাঁটার সামনে দিয়ে যেতে নেই।

২৪৭। শনি-মঙ্গলবার মেয়েদের হাতে শাঁখা পরতে নেই।

২৪৮। চাল এবং ঘর ধোওয়া জল ঘরের দরজায় ফেলা বারণ।

২৪৯। ঘুমোবার সময়ে বুকের ওপর দু'হাত জোড় করে রাখতে নেই।

২৫০। বৃহস্পতিবারে দক্ষিণ দিকে যাত্রা করতে নেই।

২৫১। তুলসী পাতা দাঁতে কেটে খেতে নেই।

২৫২। চৌকাঠের একদিক থেকে অপর প্রান্তে দাঁড়ান ব্যক্তিকে প্রণাম করতে নেই।

২৫৩। ঋতুর সাত দিন পর্যন্ত স্ত্রীসঙ্গ নিষেধ, এতে দুর্বল, মেধাহীন, হীনভাগ্য ও অপদার্থ সন্তানের জন্ম হয়।

২৫৪। শ্রাদ্ধের দিন তিন জনের বেশী ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করতে নেই।

২৫৫। শ্রাদ্ধে আমিষ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

২৫৬। রবিবারে আমিষ ভোজন নিষিদ্ধ, খেলে স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

২৫৭। শোল-মূলা, দুধ-দই-ঘোল একসঙ্গে খাওয়া বারণ।

২৫৮। শাক, সজনা, মাছ ইত্যাদির সঙ্গে দুধ খাওয়া নিষিদ্ধ। এতে নানা প্রকারের চর্মরোগ হয়, এমন কি কুষ্ঠ রোগও হতে পারে।

২৫৯। এনামেল করা বাসনে খেতে নেই, অশুদ্ধ।

২৬০। এ্যালুমিনিয়মের বাসনে খেতে নেই।
২৬১। বিনা মৃত্তিকাতে শৌচকার্য অনুচিত।
২৬২। স্ত্রীলোকের তুলসী চয়ন নিষিদ্ধ।
২৬৩। দেব-দেবীর অতি নিকটে প্রণাম নিষিদ্ধ।
২৬৪। আরতি, ভোগ ও নিদ্রাকালে দেবতাকে প্রণাম করতে নেই।
২৬৫। কার্তিক মাসে বেগুন খাওয়া নিষেধ।
২৬৬। রবিবারে নিমপাতা খাওয়া বারণ।
২৬৭। রবিবার, একাদশী বা পার্বণে পোড়া খাওয়া নিষিদ্ধ।
২৬৮। একাদশীতে শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া নিষিদ্ধ।
২৬৯। দ্বাদশীতে দিবাভাগে নিদ্রা যাওয়া বারণ।
২৭০। মধু মিশ্রিত গুড় খাওয়া বারণ।
২৭১। তৈল ও গুড় এবং আদা ও গুড় খাওয়া বারণ।
২৭২। উচ্ছিষ্ট ঘি খেতে নেই।
২৭৩। তাম্র পাত্রে নারকেল জল, গুড় ও ফলমূল খাওয়া বারণ।
২৭৪। তাম্রপাত্রে দুগ্ধ ও লৌহ পাত্রে অন্ন পাক নিষিদ্ধ।

প্রতিকার ও উপশম সংক্রান্ত

১। রাত্রে বিছানায় শুয়ে ঘাড়ে ব্যথা হলে পরদিন সকালে মাথার বালিশ রোদে দিতে হয়। দিলে ঘাড়ের ব্যথা সারে।
২। চোখে আঞ্জুনি হলে কোন ছোট ছেলের পুরুষাঙ্গটি চোখে বোলাতে হয় তাহলে আঞ্জুনি সেরে যায়।
৩। দুর্গার বরণের পান খেলে ছুলি সেরে যায়।
৪। কুল গাছের পাতা প্রতিদিন একটি করে নিয়ে আঞ্জুনি হয়েছে যে চোখে সেই চোখে বুলিয়ে একটি ঝাঁটার কাঠিতে গিঁথে রাখতে হয়। এই রকম পর পর সাতদিন করার পর পাতাগুলি যখন শুকিয়ে যাবে, তখন সেগুলিকে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়। এতেই আঞ্জুনি নিরাময় হয়।
৫। ছোট ছেলেমেয়েদের মাথায় মারতে নেই। মারলে তারা বিছানায়

প্রস্রাব করে ফেলে বলে সংস্কার। তাই মাথায় মারলেও তাদের মাথায় ফুঁ দিয়ে দিতে হয়। তাহলে আর বিছানায় প্রস্রাব করে না।

৬। খুব বেশি খাওয়া হয়ে গেলে খাওয়ার পর বাঁ হাতটি দিয়ে পেটে বোলাতে হয়, বোলালে সহজেই হজম হয়ে যায়।

৭। কঞ্চি দিয়ে কাউকে মারতে নেই। মারলে প্রহৃতজন কঞ্চির মতন রোগা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে প্রতিকার হল প্রহৃতজনকে দিয়ে কঞ্চি-টিকে কামড়িয়ে তারপর শোঁকাতে হয়।

৮। কারো গায়ে কনুইয়ের আঘাত দিতে নেই। আঘাত লাগলে আঘাত-প্রাপ্তকে দিয়ে কনুই শুঁকিয়ে নিতে হয়।

৯। কাউকে বাঁ হাত দিয়ে মারতে নেই। মারলে প্রহৃতজন রোগা হয়ে যায়। রাগের মাথায় কাউকে বাঁ হাত দিয়ে মেরে বসলেও প্রতিকার-স্বরূপ বাঁ হাতটি মাটিতে ঠুকতে হয়। তাহলে দোষ খণ্ডন হয়ে যায়।

১০। সন্ধ্যার সময় আকাশে তিনটি পর্যন্ত তারা দেখে বাড়ীতে ঢুকতে নেই। বিশেষত ছোট ছেলেমেয়েদের। চারটে তারা আকাশে দেখে তবে বাড়ীতে ঢুকতে হয়। আকাশে তারা দেখাজনিত দোষ খণ্ডন করতে বলতে হয়—

এক তারা লারাপারা
দু'তারা কাপাস তারা
তিন তারায় কোষে কোষ
চার তারায় নাহি দোষ।

১১। প্রিয়জন সম্বন্ধে দুঃস্বপ্ন দেখলে চাল বেটে তা দিয়ে পিঠে তৈরী করে শালপাতায় মুড়ে সেটা প্রিয়জনকে খাওয়াতে হয়। তাহলে আর দুঃস্বপ্নটি ফলে না।

১২। দুগ্ধপোষ্য শিশুর হেঁচকি উঠলে নিকটবর্তী বয়স্ক কাউকে একটুকরো সুতো শিশুর মাথায় রেখে বলতে হয়—'মা ষষ্ঠীর বোঝা বও।' তাহলেই হেঁচকি থেমে যায়।

১৩। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক শিশুর হেঁচকি উঠলে তাকে ভয় দেখাতে হয়। তাহলেই হেঁচকি থেমে যায়।

১৪। কোন ছোট শিশুকে পড়ে যেতে দেখলে এবং পরিণামে যদি তার রক্ত-পাত হয় তাহলে সেখানে উপস্থিত বয়স্ক ব্যক্তিকে তৎক্ষণাৎ মধু ও ঘি

মিশিয়ে ঐ ক্রন্দনরত শিশুকে খাইয়ে দিতে হয়।

১৫। ঘরের চাল থেকে বর্ষাকালে যেখানে জল ঝরে পড়ে সেই ছাঁচতলায় বাড়ীর কোন ছেলেমেয়ে পড়ে গেলে বা আছাড় খেলে তাকে আর বাড়ীতে ঢুকতে দেওয়া হয় না। বাড়ীর অভিভাবক স্থানীয় কেউ একটি পাত্রে করে জল এনে পড়ে যাওয়া ছেলে বা মেয়েকে ঐ ছাঁচতলায় দাঁড় করিয়ে ঐ জল তার মাথায় ছুঁড়ে দেন। ছুঁড়ে দেওয়া জল মাথায় এসে পড়লে তবে বাড়ী ঢোকার অনুমতি পায় পড়ে গেছে যে সে।

১৬। ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখার হাত থেকে বাঁচতে হলে বিছানার নীচে লোহা রেখে শুতে হয়। বিশেষত লৌহ নির্মিত কোন অস্ত্র হওয়াই এক্ষেত্রে বাঞ্ছনীয়।

১৭। স্বপ্ন দেখার হাত থেকে রেহাই পেতে বালিশের নীচে শোবার ঠিক আগে আঙ্গুলে করে তিনবার 'মা' লিখতে হয়।

১৮। অনবধানতাবশতঃ বঁটি বা এই ধরণের তীক্ষ্ণধার অস্ত্রে যদি পা ঠেঁকে, তাহলে খুব আলতোভাবে সেই জিনিসটির আঘাত দেহে নিতে হয়। এর ফলে বঁটি বা অনুরূপ অস্ত্রের বড় আঘাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

১৯। স্ত্রীলোকের কেশের অগ্রভাগ কারো গায়ে লাগান নিষেধ। লাগলে সেই ব্যক্তি চুলের মত সরু হয়ে যায়। আকস্মিকভাবে লেগে গেলে বলতে হয়, 'চুল নয় ফুল'।

২০। দাঁতে ব্যথা হলে মুখের যে দিকে ব্যথা, সেই দিকের কানের সঙ্গে সুতোয় বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হয় ডালিম গাছের শেকড়।

২১। আধকপালি হলে কপালের যে দিকে ব্যথা সেদিকের চুলে মিষ্টি কুমড়োর ডাঁটা বেঁধে দিতে হয়।

২২। বেড়াল মারতে নেই। মেরে ফেললে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। প্রায়শ্চিত্তে মৃত বেড়ালের ওজনের সমান সোনা অথবা লবণ দান করতে হয়।

২৩। সন্তানলাভে বঞ্চিত দম্পতিকে দু'টি বট পাকুড় এনে সমারোহের সঙ্গে বিবাহ দিতে হয়। জল সিঞ্চনের মাধ্যমে যদি গাছ দু'টিকে বাঁচিয়ে রাখা যায় তাহলে দম্পতি সন্তান লাভ করে।

২৪। হাতে পায়ে ঘা হলে বা নখের আঁচড়ে কিংবা অন্য কারণে যদি বিষিয়ে যায়, তাহলে হুঁকোর বাসি জলে ঘুঁটের ছাই মিশিয়ে তাতে একগাছা

চুল দিয়ে তারপর তাই দিয়ে ঘা-টাকে কয়েকবার মুছে দিতে হয় সকাল-বেলায়। এতে ঘা শুকিয়ে যায়।

২৫। মায়ের আঁচল লেগে যদি ছেলে শুকিয়ে যায়, তাহলে সেক্ষেত্রে কাল গরুর কাঁচা দুধের সঙ্গে জল মিশিয়ে তাইতে ছেলেকে স্নান করাতে হয়। তাহলেই ছেলের সব দোষ কেটে যায়।

২৬। পেটে প্লীহা হলে গোয়ালে গরুর খোঁটায় সাত দিন পেট ঘষতে হয়। এতে পেটের প্লীহা সারে।

২৭। গায়ে ঘামাচি হলে গলায় পরতে হয় শ্যামলতার মালা। শ্যামলতার মালা যেমন শুকোতে থাকে, ঘামাচিও তেমনি কমতে থাকে।

২৮। কুকুর কামড়ানো ব্যক্তি যদি সঙ্গে সঙ্গে সাতটে মাসকলাই সাতটে পাত-কুয়ায় ফেলে দেয় তাহলে তার আর কোন ভয় থাকে না।

২৯। অনেক সময় চোখে টুসি পোকা হয়। এক্ষেত্রে ভোরবেলা মুখ না ধুয়ে একগাছা দূর্বা দিয়ে চোখের দু'টি পাতায় ঘষতে হয়। এতে টুসি পোকা চলে যায়।

৩০। গলায় ব্যথা হলে কলার শুকনো খোসা বাঁধতে হয়। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে খোসা বাঁধার কারণ, সঙ্গে সঙ্গে খোসাটি খুলে ফেলতে হয়। এতে প্রশ্নকর্তার গলায় ব্যথাটা সঞ্চারিত হয়ে যায়।

৩১। শিশু যাতে তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারে সেজন্যে গুড় ও আতপ চাল দিয়ে গোলাকার এক রকমের পিঠে তৈরী করে সেই পিঠে ঘরের চাল থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে দিতে হয়। তাহলেই শিশু হাঁটতে পারে।

৩২। চুল আঁচড়াবার পর চিরুনিটি তিনবার শুঁকে তারপর রাখতে হয়। নইলে মাথার চুল উঠে যায়।

৩৩। বরাকর নামক কাল্পনিক পীরকে বন্ধ্যা রমণী যদি চিঁড়ে খাওয়ানোর মানত করে, তবে তার সন্তান লাভ হয়।

৩৪। সাইটোর অনুষ্ঠান করলেও বন্ধ্যা রমণী সন্তান লাভের অধিকারিণী হয়।

৩৫। মায়ের আঁচল সন্তানের গায়ে লাগলে সন্তানের আয়ুঃক্ষয় হয়। এক্ষেত্রে আঁচলটাকে মাটিতে ঠেকাতে হয়, তাহলেই দোষ কেটে যায়।

৩৬। যে চোখে আঞ্জুনি হয়, সেই দিকের পায়ের বুড়ো আঙ্গুলে কষে সুতো

বাঁধলে আস্তে আস্তে আঞ্জুনি সেরে যায়।

৩৭। গরু, ছাগল ইত্যাদির যেখানে প্রসব হয়, সেখানে কোদাল দিয়ে একবার কোপ মারতে হয়। তাহলে গরু বা ছাগলের কোন ক্ষতি হয় না।

৩৮। পর পর কয়েকটি সন্তান মারা গেলে মৃত সন্তানের কান বা নাকের অংশ বিশেষ কেটে দিতে হয়। তাহলে সন্তান আর মারা যায় না। কিংবা যদি মারা যায়ও তাহলে পরবর্তীকালে নাক বা কানকাটা অবস্থায় জন্ম-গ্রহণ করে। তার ফলে তাকে দেখলেই চেনা যায়।

৩৯। গরুর প্রসব হলে ফুল পড়ার আগে গরুটির লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত মেপে সাতগাছি কলমীলতা গরুকে খাইয়ে দিলে গরুর দুধ খুব ভাল হয়। এরপর ছেঁড়া জালের টুকরোতে কচ্ছপের খোলা, কড়ি, ঝাঁটার টুকরো একসঙ্গে বেঁধে গরুর গলায় ঝুলিয়ে দিলে তার দুধ কেউ চালতে পারে না।

৪০। বাড়ীতে বাজ পড়া একটা ভয়ের ব্যাপার। বাজ পড়ার ফলে শুধু বাড়ীরই ক্ষতি হয় না, এর ফলে মানুষেরও মৃত্যু ঘটতে পারে। অথচ বাজ পড়ার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার বিজ্ঞান সম্মত কারণ মানুষের ছিল অজানা। তাই 'বাজবরণ' নামক গাছ বাড়ীতে রাখার সংস্কার তৈরী হয়েছিল। এর ফলে বাড়ীতে বাজ পড়ে না বলে ধারণা।

৪১। এমন অনেক শিশু আছে যারা একটু বেশী বয়সেও রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় বিছানায় প্রস্রাব করে ফেলে। এদের এই বদভ্যাস দূরীকরণের ব্যাপারে একটি সংস্কার প্রচলিত আছে। সে'টি হল বিছানায় প্রস্রাবকারী শিশুকে রাস্তার তেমাথায় বসিয়ে রাখা হয়। তাকে যদি কেউ সম্বোধন করে তখন শিশুটিকে বলতে হয়, 'শেজে মুতো নেরে'। এই বলে পালিয়ে গেলে বদভ্যাসটি চলে যায়। একটি প্রবাদেও এই প্রসঙ্গটি উল্লিখিত হয়েছে—ওরে আমার কে রে শেজে মুতো নে রে।

৪২। স্নেহ বা প্রীতিভাজন কাউকে হাত দিয়ে মারার অব্যবহিত পরেই মাটিতে হাত দিয়ে আঘাত করতে হয়। নতুবা স্নেহভাজনের অমঙ্গল হয়।

৪৩। ঝাঁট দেবার সময় গায়ে ঝাঁটা লেগে গেলে অমঙ্গল হয়। সে ক্ষেত্রে দু'পা দিয়ে ঝাঁটাটি তিনবার মাড়াতে হয়, তাহলেই সব দোষ খণ্ডন হয়ে যায়। ঝাঁটা গায়ে লাগলে বুদ্ধি কমে যায় বলে বিশ্বাস।

৪৪। যে ঘা দীর্ঘদিন ধরে রয়েছে, নিরাময় হচ্ছে না, সেক্ষেত্রে হাতে পায়ে চুল কিংবা কালো সুতোয় কড়ি পরতে হয়। পরলে পুরনো ঘা সেরে যায়।

৪৫। কারো ঘন ঘন জ্বর হলে এবং তা ছেড়ে গেলে ভালুকের লোম পরিয়ে দিতে হয়, তাহলে এই ধরনের জ্বর যা 'ভালুক জ্বর' নামে পরিচিত, নিরাময় হয়।

৪৬। কদবেলের খোলায় নারকেল তেল রেখে তারপর সেই তেল মাখলে মাথার খুশকি সেরে যায়।

৪৭। অমাবস্যার রাতে তেমাথার থেকে সংগৃহীত ঘোড়ার নালে প্রস্তুত আংটি পরলে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধার করা যায়।

৪৮। উটের প্রস্রাব খাওয়ালে যক্ষ্মারোগ নিরাময় হয়।

৪৯। বাসি মুখের থুথু লাগালে দাদ ভাল হয়।

৫০। ঠোঁট ফাটা সারাতে রাত্রে ঘুমোবার সময়ে নাভিতে তেল দিতে হয়।

৫১। ঘোড়ার মল লেগেছে এমন জুতোর সুকতলা শোঁখালে মৃগী রোগী ভাল হয়।

৫২। ঘৃতকাঞ্চনের জল মাথায় দিলে মাথা ঘোরা সারে।

৫৩। পেট ব্যথা করলে পেটে পুকুরের পাঁক লাগাতে হয়।

৫৪। আমরুল পাতার রস গরম করে খেলে আমাশয় নিরাময় হয়।

৫৫। পেট কামড়ালে পেটের ওপর একটা বড় পান রেখে দিতে হয়। তাহলেই কামড়ান সারে।

৫৬। ছাগল দুধের সঙ্গে জাম গাছের সাতটা কচিপাতা বেটে তার রস মিশিয়ে খাওয়ালে রক্ত আমাশয় ভাল হয়।

৫৭। নিজের হাতে বেড়াল মেরে ফেলা খুবই অশুভ। এক্ষেত্রে মৃত বেড়ালের ওজনের সমান লবণ খাল-বিল-পুকুরের জলে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

৫৮। রাত্রিবেলা আকাশে এক তারা দেখতে নেই। দেখলে পাশের সঙ্গীকে বলতে হয়—তোর আমার ক' চোখ? সঙ্গীটি বলে 'চারচোখ'!

৫৯। কুকুরে কামড়ালে পচা পুকুরের জল খাওয়ান হয়।

৬০। আকাশে এক তারা দেখা অশুভ। সেক্ষেত্রে প্রতিকারের জন্য কপিল মুনির নাম করতে হয় সাতবার।

৬১। 'তোমার শরীরটা ভাল হচ্ছে'—একথা বলতে নেই। বললে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। এরকম ক্ষেত্রে গায়ে থুতকুড়ি দিয়ে দিতে হয়।

৬২। ভূমিকম্পের সময় উলঙ্গ হয়ে মাটি কামড়ে তুলতে হয়। তাহলে এই মাটি পরীক্ষা-বৈতরণী উত্তীর্ণ হতে কিংবা মামলা জয়ে কাজে লাগে।

৬৩। প্রবল ঝড় বন্ধ করতে উঠোনে পিঁড়ি ছুঁড়ে দিয়ে বলতে হয়—পবনদেব বসো।

৬৪। পায়ে চুটকী পরানো ঘরের বউ বারমুখো হয় না।

৬৫। মেয়েদের নাকে সোনা ধারণ করতে হয়, তাহলে নিঃশ্বাস শুদ্ধ হয়।

৬৬। মৃত্যুর খবর শুনলে অথবা বাড়ীর সামনে দিয়ে মড়া গেলে জল ঢালতে হয়।

৬৭। কোনো বন্ধ্যা স্ত্রীলোক যদি নবজাতকের ক্ষতিসাধন করে, তাহলে তার সন্তানলাভ ঘটে। বিপরীতক্রমে বন্ধ্যা রমণী যাতে নবজাতকের কোন ক্ষতিসাধন করতে না পারে সেজন্যে জাতকের কানে দুটো ফুটো করে দিতে হয়।

৬৮। ছোট শিশুকে কোনো কিছু খাওয়ানোর সময় খাবারের কিছু অংশ শুঁকে ফেলে দিতে হয়। বিশেষতঃ মা যখন শিশুকে খাওয়ায়। সংস্কার হ'ল মায়ের দৃষ্টি খুব সাংঘাতিক। মায়ের দৃষ্টি খাবারে লেগে যদি শিশুর অসুখ করে তবে তা সহজে সারেনা।

৬৯। সন্ধ্যাকালে আকাশে একতারা দেখলে অনেকে ন'টা ফুলের নাম করে ভ্রম সংশোধন করে।

৭০। তিনবেলা স্নানে কাম রিপুর উপশম হয়।

৭১। তুলসীপাতা জলে, ভাতে এবং খাবার পরে ব্যবহার করা ভাল। এতে শরীর শীতল থাকে।

৭২। মহাবিষুব সংক্রান্তিতে ভগ্নী ভ্রাতাকে ছাতু, কলা ও গুড় থেকে বর্তুলাকারে অন্যান্য উপাদেয় খাদ্যের সঙ্গে পরিবেশন করলে ভ্রাতার আয়ু বৃদ্ধি পায়।

৭৩। চৈত্র সংক্রান্তির দিন স্নান করে দু'মুটো ছাতু নিয়ে তে মাথায় উপস্থিত হয়ে দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে পেছন দিকে তা ওড়াতে ওড়াতে বলতে হয়—'ছাতু যায় উইড়া, দুষমন বাদী মরে হুইড়া'। তিনবার বলতে হয়। বললে শত্রুর বিনাশ হয়।

৭৪। শনি-মঙ্গলবারে পোড়া খেলে গ্রহদোষ নাশ হয়।

৭৫। বসন্ত রোগ হলে বলতে হয় 'মায়ের দয়া' হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মা' বলতে শীতলা দেবীকে বোঝান হয়েছে। বসন্ত হলে মনে করা হয় মা শীতলা রুষ্ট হয়েছেন। কাজেই তাঁকে পূজা দিতে হয়। তাঁকে মানত করতে হয়, তাহলেই রোগ নিরাময় হয়।

৭৬। কার্তিক পূজা করলে সন্তানহীনা রমণী সন্তান লাভ করে বলে বিশ্বাস। একটি প্রবাদেও এই সম্পর্কে ইঙ্গিত দিয়ে বলা হয়েছে—হবেনা আর, বাঁজার ছেলে, কার্তিক রে তোর বাবাও এলে।

৭৭। মাছের কাঁটা গলায় আটকালে বেড়ালের পায়ে ধরতে হয়, ধরলে গলার কাঁটা নেমে যায়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—

মাছের কাঁটা গলায় দড়,
বিড়ালের পায়ে গড় কর।

অন্য একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

'ডাইল দা' খাইবাম,
বিলাইরে ঠেং দেখাইবাম।

—অর্থাৎ ডাল দিয়ে ভাত খেলে আর গলায় কাঁটা লাগার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। আর সেক্ষেত্রে বেড়ালের মত প্রাণীর পায়ে ধরা তো দূরের কথা, বরং বেড়ালকে তখন লাথি দেখানোও যেতে পারে।

৭৮। একজনের সঙ্গে অপরের মাথা ঠুকে গেলে অন্ততঃপক্ষে আর একবার নিজেদের মধ্যে মাথা ঠুকে নিতে হয়। নইলে মাথায় শিঙ গজায়।

৭৯। খেতে বসে হাঁচলে পাতের তলা থেকে ভাত তুলে খেতে হয়।

৮০। বন্ধ্যা রমণী দেবস্থানের সংলগ্ন গাছে দড়ি দিয়ে ঢিল বেঁধে দিলে সন্তান-সম্ভবা হয় বলে বিশ্বাস। তাই প্রায় সব উল্লেখযোগ্য দেবস্থানেই অসংখ্য দড়ি বাঁধা ঢিল গাছ থেকে ঝুলতে দেখা যায়। অনেক সময় গাছ ছাড়াও মন্দিরের জানলার শিকেও এইভাবে ঢিল বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে দেখা যায়।

৮১। আকাশে তারা খসা দেখলে সাতটি ফুলের এবং সাতজন ব্রাহ্মণের নাম করতে হয়। মতান্তরে সাতজন ব্রাহ্মণ, সাতটি ফুল এবং সাতটি পুকুরের নাম করতে হয়।

৮২। মন্দির-মসজিদের জল পাঁচটি গোলমরিচ ও তেজপাতা সহ খেলে হাঁপানি সারে।

৮৩। খাঁড়া ধোয়া জল ফেলে (গোলমরিচ সহ) রোগ সারে।

৮৪। ঝড় আসবার আগে উঠানে পিঁড়ি দিয়ে রাখলে ঝড় কমে যায়।

৮৫। রাত্রিবেলা কোথাও বের হবার আগে বুকের মধ্যে থুতু দিয়ে দিলে অপদেবতা বা ভূতের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়।

৮৬। শিশুর জন্মগ্রহণের পর তার প্রথম মল কাজললতার একদিকে রেখে এবং এই দিয়ে জননীকে প্রত্যহ শিশুর কপালে ফোঁটা পরিয়ে দিতে হয়, তাহলে ডাইনির দৃষ্টি পড়ে না।

৮৭। কোন মানুষকে যদি সন্দেহ হয় যে সে শিশুর ক্ষতি করবে, অর্থাৎ সে ডাইনি, তাহলে তার কানে যাবার মত করে প্রস্রাব, পায়খানা এবং এই ধরণের আবর্জনার নাম করতে হয়। তাহলেই সন্দেহ ভাজন মানুষটির কুদৃষ্টি থেকে শিশু রক্ষা পাবে।

৮৮। দীপাবলির দিন রাত্রে পাটখড়ির আগুনে হাত-পা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সেঁকে নিলে খোস-প্যাঁচড়া হয় না।

৮৯। প্রসব যন্ত্রণায় গর্ভবতী রমণী কষ্ট পেলে পুষ্পহীন তেঁতুল গাছ এক নিঃশ্বাসে এক টানে উপড়ে নিয়ে এসে গর্ভবতীর চুলে বেঁধে দিতে হয়। তাহলে সঙ্গে সঙ্গে প্রসব হয়।

৯০। সন্তান হওয়ার সময় যদি গর্ভবতী রমণী কষ্ট পায়, তাহলে তার পায়ে লজ্জাবতী লতার শেকড় বেঁধে দিতে হয়।

৯১। সদ্য পোয়াতির স্তন শক্ত হয়ে ব্যথা হলে সন্ধ্যাবেলা একটা মুড়ো ঝাঁটা নিয়ে স্তনে তিনবার ছুঁইয়ে ফেলে দিতে হয়।

৯২। শিশু সন্তানের বমি হলে ময়ূরের পেথম বেঁধে দিলে উপশম হয়।

সু ও কু-লক্ষণ সংক্রান্ত

১। খড়মঠেঙী ভাতার খায়—

স্ত্রীলোকের পক্ষে খড়ম পায়ের অধিকারিণী হওয়া খুবই খারাপ। 'খড়ম পা'-বলতে যে নারীর পায়ের তলদেশের মধ্যভাগ চলার সময় মাটি

স্পর্শ করেনা এবং খড়মের মত শূন্যে থাকে, সেই পা-কেই বোঝানো হয়েছে।

২। রাতের বেলায় লক্ষ্মীপেঁচা বা সাদা পেঁচা দেখা মঙ্গল জনক।

৩। রাতে বেড়াল কিংবা কুকুরের কান্না শোনা অশুভ। মৃত্যু সূচনা করে।

৪। ছেলেদের বাঁ হাত চুলকালে ক্ষতি হয়, কিন্তু ডান হাত চুলকালে ভাল হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এর বিপরীত।

৫। সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে অপুত্রক বা আঁটকুড়ির মুখ দেখতে নেই। দেখলে সারা দিনটা খারাপ যায়। বিশেষত অর্থপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

৬। পুরুষের পক্ষে বাঁ চোখ নাচা খারাপ। তা ক্ষতির নির্দেশ করে। বিপরীতক্রমে ডান চোখ নাচলে তা লাভের সূচক। মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু এর বিপরীত—

ডাইনে উঁচু বাঁয়ে উঁচু
লাভ হয় কিছু কিছু

এই প্রসঙ্গে আরও বিশ্বাস করা হয়—উত্তমের অধম,
অধমের উত্তম।

৭। পিতৃমুখী কন্যা সুখী, মাতৃমুখী পুত্র সুখী।
কন্যার যদি পিতার মত মুখ হয় অপরপক্ষে পুত্র পায় মায়ের মতন মুখ, তাহলে পুত্র-কন্যা উভয়েই সুখী হয়।

৮। অষ্টম গর্ভের সন্তান, বিশেষত সেই সন্তান যদি ছেলে হয়, তাহলে সে অত্যন্ত বুদ্ধিমান, প্রতিভাবান ও খ্যাতিসম্পন্ন হয়। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অষ্টম গর্ভের সন্তান। পূর্বোক্ত সংস্কারের অন্যতম উৎস এ'টিই!

৯। অশুভ লক্ষণ যুক্ত স্ত্রীলোক প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—
উটকপালী চিরুনদাঁতী, গোদা পায়ে মারবে লাথি।

১০। উট্‌কপালী চিরুনদাঁতী খড়ম পায়া, অধিক বাতী।
অশুভ লক্ষণযুক্ত মানুষ এবং গরু সম্পর্কে বলা হয়েছে—
উনপাঁজুরে বরাখুরে। —অর্থাৎ যার পাঁজর কম, যে গরুর খুর বরাহের মত তারা কুলক্ষণে।

১১। দিনে শেয়াল, রাতে গাই, ডাকলে গাঁয়ের রক্ষা নাই।
—সচরাচর গাভীর ডাক শোনা যায় দিবাভাগে আর শৃগালের ডাক

শোনা যায় রাত্রে। কিন্তু এর যদি বৈপরীত্য ঘটে অর্থাৎ দিনে শৃগালের ডাক আর রাত্রে গাভীর ডাক শোনা যায় তাহলে তা গ্রামের পক্ষে অমঙ্গলসূচক।

১২। তিন ঝি হইয়া পুত,
ঘরে সামায় যমদূত।
পরপর তিনটি কন্যা সন্তান প্রসবের পর চতুর্থবারে যদি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তাহলে তা কুলক্ষণ বলে ধরা হয়।

১৩। তিন পুত হইয়া হয় ঝি,
কনুই বাইয়া পড়ে ঘি।

১৪। তিনটি পুত্র সন্তানের পর যদি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, তবে তা সুলক্ষণের পরিচায়ক বলে মনে করা হয়।

১৫। ডুবডুবিয়ে হাঁটে নারী চোখ পাকিয়ে চায়।
আটকপালী হতভাগী পুরুষ আগে খায়।
যে নারী ডুমদাম করে হাঁটে এবং কটমট করে তাকায়, যার উটকপাল, সেই নারী বিধবা হয়। উটকপালী নারীর কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। এখানে 'উটকপালী'র বিকৃত রূপ 'আটকপালী' পাওয়া যাচ্ছে।

১৬। ছেলেদের জোড়াভুরু সৌভাগ্যের সূচক। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে তা অশুভ লক্ষণ।

১৭। ছেলেদের ডান দিকে গজদাঁত থাকা ভাল লক্ষণ আর মেয়েদের বাঁ দিকে গজদাঁত থাকা শুভ।

১৮। ছেলেদের ডান হাতে বা দেহের ডান দিকে জড়ুল থাকা শুভ, মেয়েদের দেহের বাঁ দিকের জড়ুল সুলক্ষণ।

১৯। মেয়েদের বাঁ দিকে এবং পুরুষদের ডানদিকে সাপ দেখা ভাল।

২০। মেয়েদের হাঁটুর তলায় চুল থাকা অলুক্ষণে।

২১। দেওয়াল থেকে ছবি পড়ে যাওয়া কুলক্ষণ।

২২। সর্প-সর্পিনীর মৈথুন দর্শন সৌভাগ্যের সূচক।

২৩। রাত্রে কাকের ডাক অমঙ্গলজনক।

২৪। বিষ্ঠার স্বপ্ন দেখলে আর্থিক লাভ হয়।

২৫। সাপের স্বপ্ন দেখলে বংশ বৃদ্ধি হয়।

২৬। ডুপুরবেলা চালের ওপর কাক ডাকলে অশুভ সংবাদ আসে।

২৭। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে গরু বেশি ডাকলে তা বন্যার ইঙ্গিতবাহী।

২৮। তক্ষক সাপ ডাকা অশুভ।

২৯। বাঁশের ফুল হলে মড়কের সম্ভাবনা।

৩০। বাস্তুতে পিঁপড়ে আর ইঁদুর বেশি হলে পরবর্তী বর্ষায় বন্যা হয়।

৩১। টিকটিকি বাঁ-দিকে পড়লে রাজা হয়।

৩২। বয়স তারিখ এমন কি কেনা বেচার ক্ষেত্রেও তের সংখ্যাটি ক্ষতিকারক।

তের (অ)

ফের (অ)

৩৩। সোমবার এবং শুক্রবার নতুন শাড়ী পরিধানকারিণীর প্রচুর ধন হয়—

সোমে শুক্রে পরে শাড়ী
ধন হয় তার আড়ি আড়ি।
মতান্তরে 'গাড়ি গাড়ি'।

৩৪। স্বর্ণালঙ্কার বাড়ী থেকে বা কারো গা থেকে হারানো খুবই অমঙ্গলজনক। তাই স্বর্ণালঙ্কার বা স্বর্ণনির্মিত যে কোন দ্রব্য খুব সাবধানে রাখতে হয়।

৩৫। যে ব্যক্তির জন্মলগ্ন থেকে একাদশ স্থানে বৃহস্পতি, সেইব্যক্তি প্রভূত সমৃদ্ধির অধিকারী হয়।

৩৬। অষ্টম স্থানে আশ্রিত শনি জাতকের প্রাণহানি ঘটায়। একটি প্রবাদে এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—'একে শনি, তাই রন্ধ্রগত।'

৩৭। কোন ব্যক্তির কথা হবার সময় সেই ব্যক্তি স্বয়ং যদি এসে হাজির হয় তাহলে সেই ব্যক্তি দীর্ঘজীবী হয়।

৩৮। যে ব্যক্তির মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ রটে, সেই ব্যক্তিও দীর্ঘজীবী হয়।

৩৯। দ্বিতীয় বিবাহের ফলে যদি পুত্র সন্তানের জন্ম হয় তাহলে সংসারের পক্ষে তা খুবই অশুভ হয়। বিপরীতক্রমে দ্বিতীয় বিবাহের ফলে কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করলে তা সংসারের পক্ষে খুব শুভ—

শেষ ঘরে হয় পুত, সংসারে লাগে ভূত।
শেষ ঘরে হয় মেয়ে, ঘি পড়ে শিকে বেয়ে।

৪০। বেশ কয়েকটি নাম আছে যেগুলি উচ্চারণ করা অশুভ। এই রকম একটি হ'ল ২৪ পরগণার দক্ষিণাঞ্চলের 'গোচরণ' নামটি। সাধারণ মানুষ শুধু 'চরণ' বলে। এই রকম 'ফুটিগোদা' নামটিও অশুভ। তাই সাধারণ মানুষ এ'টিও উচ্চারণ করে না।

৪১। প্রথম সন্তানটি মেয়ে হলে পিতার পক্ষে খুব শুভ হয়।

৪২। পরম শুভযোগ হ'ল 'চাঁদের দিন, বুধের দশা'।

৪৩। মাথার ওপর কাক ডাকলে অমঙ্গল হয়।

৪৪। ডুমুরের ফুল ফোটা যে দেখে সে রাজা হয়।

৪৫। মা অথবা বাবা মারা গেলে বলা হয় মহাগুরু নিপাত। মহাগুরু নিপাতের পর থেকে এক বছর খুব সাবধানে থাকতে হয়। ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে।

৪৬। গামছা হারান অমঙ্গল।

৪৭। হলদে গুড়গুড়ি বা বউকথা কও পাখী ডাকলে বোঝা যায় প্রবাসী আত্মীয় বাড়ী ফিরছে।

৪৮। বউ কথা কও পাখী যদি এমন ভাবে ডাকে যাতে মনে হয় সে বলছে 'খোকার খুকী হোক' কিংবা 'খুকীর খোকা হোক', তাহলে ঐ সময়ে বাড়ীতে কোন গর্ভবতী রমণী থাকলে তার সেইমত সন্তান হয়।

৪৯। গাছে তেঁতুল বেশি হলে ধান বেশি হয়।

৫০। আম বেশি ফললে ঝড় হবার সম্ভাবনা থাকে।

৫১। কোন কিছু খাবার সময় মুখে কয়লা পড়লে পিতামাতার মৃত্যু সম্ভাবনা থাকে।

৫২। চিলের কান্না মৎস্যাভাব সূচিত হয়।

৫৩। শকুনির কান্না মড়কের সূচক।

৫৪। বেড়ালের কান্না ব্যাধির সূচক।

৫৫। কুকুরের কান্না অঞ্চল জুড়ে মহামারী হবার লক্ষণকে প্রকাশ করে।

৫৬। খেতে বসে খাদ্য বস্তুতে আঁশটে গন্ধ লাভ পিতৃ কিংবা মাতৃ বিয়োগের ইঙ্গিতবাহী।

৫৭। স্নানের পর লৌহ নির্মিত কোন কিছুর স্পর্শ লাভ আত্মীয় বিয়োগ সূচনা করে।

৫৮। যাত্রালগ্নে কালো রঙের ভাঙ্গা কলসী দেখার অর্থ আসন্ন আত্মীয় বিয়োগ।

৫৯। সন্তানের খাদ্য গ্রহণের সময় পিতামাতার মুখে জল আসা সন্তানের রোগে আক্রান্ত হওয়ার লক্ষণ।

৬০। খেতে বসে মুখের ভাত পড়ে যাওয়ার অর্থ শত্রু বৃদ্ধি।

৬১। প্রজাপতি ঘরে আসা মানে টাকা লাভ হবার সম্ভাবনা।

৬২। যাত্রাপথে মৃত কাক দর্শন শুভ সংবাদ লাভের ইঙ্গিতবাহী।

৬৩। ঘুঘুর ডাক শোনা অথবা বাড়িতে ঘুঘু পাখী ঢুকলে অমঙ্গল। এ'টা নাকি মৃত্যু সূচনা করে। অর্থাৎ যে বাড়ীতে ঘুঘু ঢোকে এবং ডাকে, সেই বাড়ীর কারোর মৃত্যু ঘটবে এরকম একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে।

৬৪। বাড়ীতে কালো বেড়ালের আনাগোনা খুব খারাপ। কালো বেড়াল বলতে একেবারে কুচকুচে কালো, কোথাও সাদার চিহ্ন মাত্র নেই এমন। অন্ধকারে চোখ দুটো শুধু জ্বলে। এই ধরণের বেড়ালের আনাগোনায় কারো মৃত্যু ঘটতে পারে এই রকম বিশ্বাস রয়েছে।

৬৫। বাড়ির সামনে কাক একটানা ডাকলে বলা হয় কোন দুঃসংবাদ আসবে।

৬৬। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে সর্বপ্রথম বেড়ালের মুখ দেখলে দিনটা খারাপ যায়।

৬৭। সকালে উঠে মেথরের মুখ দর্শনে দিন ভাল যায়।

৬৮। কোন শুভকাজে ব্রাহ্মণ বা তাঁতীর মুখ দেখা অশুভ।

৬৯। উঠানে ঝাঁটা পড়ে থাকা খারাপ।

৭০। উঠানে বা বারান্দায় জুতো উল্টিয়ে থাকা দুর্লক্ষণ।

৭১। ছেলেদের দাঁত বাঁকা থাকলে ভাগ্য ভাল হয়।

৭২। মেয়েদের কপাল চওড়া হলে ভাগ্যবতী হয়।

৭৩। দিনের বেলায় বাড়ীর চালে পেঁচা বসা অলুক্ষুণে।

৭৪। সিঁদুর পড়া খুব অশুভ লক্ষণ।

৭৫। সোনা কুড়িয়ে পাওয়া খারাপ।

৭৬। হাঁড়ি অথবা কড়ার তলা হাসলে বাড়ীতে শুভ কাজ অনুষ্ঠিত হয়।

৭৭। খাওয়ার অথবা মাছের স্বপ্ন দেখলে অসুখ হয়।

৭৮। কাপড়ের দোকানে জেলে অথবা গোয়ালার হাতে বউনি শুভ।

৭৯। নিদ্রাভঙ্গের অব্যবহিত পরে বামন অথবা মাকুন্দকে দেখা অশুভ।

৮০। ঘুম থেকে উঠে গাই-বাছুর একসঙ্গে দেখা শুভ।

৮১। কাপড়ের দোকানে গামছা বেচে বউনি করা অশুভ।

৮২। পায়ে পায়ে গোছ লাগা খারাপ, বিপদ হয়।

৮৩। হাতে বা পায়ে পাঁচটার বেশী অথবা কম আঙ্গুল যার সে অলুক্ষণে।

৮৪। কপালে তিল থাকা ভাল লক্ষণ নয়।

৮৫। যে মেয়ের দাঁত ফাঁকা ফাঁকা, সে সুলক্ষণা নয়।
৮৬। একটা শালিখ দেখা খারাপ। দেখলে ক্ষতি হয়।
৮৭। নিখুঁত সুন্দরী মেয়ে দুর্ভাগ্যবতী হয়।
৮৮। স্বপ্নে মৃত্যু দেখা ভাল।
৮৯। স্বপ্নে দাঁত পড়া দেখলে মা বাবার মৃত্যু হয়।
৯০। স্বপ্নে সর্প দংশনে বিবাহিতা রমণী সন্তানবতী হয়।
৯১। দিনের বেলায় আকাশে তারা দেখতে পাওয়া অশুভ।
৯২। আচমকা অসাবধানে সিঁথির সিঁদুর মুছে গেলে পতিবিয়োগ ঘটে।
৯৩। মহিষের কপাল সাদা হলে চাষী সেটিকে অশুভ মনে করে।
৯৪। গো-সাপ দেখলে ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়।
৯৫। বামে টিকটিকি ডাকলে কাজে বাধা পড়ে।
৯৬। দাঁড়কাক ডাকলে শোক হয়।
৯৭। কালপেঁচা ডাকলে অর্থহানি ঘটে।
৯৮। কালো কুকুরের কান্না শোক বয়ে নিয়ে আসে।
৯৯। সকাল বেলায় দুই শালিখ পাখী দেখা শুভ লক্ষণ।
১০০। বাড়ীর মধ্যে একত্রে অনেক কাকের ডাক কুলক্ষণের ইঙ্গিত বহন করে।
১০১। ভোরবেলা ডানকাতে (ডানহাত বিছানায় লাগিয়ে রেখে) শুয়ে স্বপ্ন দেখা ভাল।
১০২। শীতকালে উষ্ণ আর গরমকালে শীতল যার শরীর, সেই মেয়ে লক্ষী।
১০৩। শঙ্খচিল দর্শন, শুভ সংবাদ বা ঘটনাকে সূচিত করে।
১০৪। জল আনতে গিয়ে কলসী ভেঙ্গে যাওয়া অশুভ লক্ষন।
১০৫। নারীর বক্ষে লোমের আবির্ভাব অশুভ।
১০৬। কনে দেখার সময় সুলক্ষণা মেয়ে তাকেই বলা হয় যার পায়ের মধ্যবর্তী অংশের ছাপ খাঁজ কাটা অবস্থায় পড়ে।

বিবাহ সম্পর্কিত

১। এক গোত্রে বিবাহ হয় না।
২। কনেকে কালো জিনিস উপহার দিতে নেই, পরাতেও নেই।

৩। গায়ে-হলুদের কাপড় খুব সাবধানে রেখে দিতে হয়। নতুবা ঈর্ষাকাতর মানুষ তা কেটে নিয়ে তুক করতে পারে।

৪। বাড়ীতে নতুন বউ এলে তার কানে, মুখে মধু ছুঁইয়ে দিতে হয়। এর ফলে শ্বশুর বাড়ীর সবকিছুই তার কাছে মধুর বলে মনে হয়। নতুন বউ যা বলবে তাও মধুর হয়।

৫। নরগণ এবং রাক্ষসগণের পাত্রপাত্রীর মধ্যে বিবাহ হয় না। কারণ তাহলে নরগণ যার তার মৃত্যু হয়।

৬। বিবাহের উপযুক্ত সময় হ'ল মাঘ এবং ফাল্গুন।
ঘর আর বর, মাঘ ফাগুনে কর।

৭। বিয়ের দিন ঠাট্টার সম্পর্কীয়রা দুধে-আলতা গোলা জলে মোনা মুনি ভাসিয়ে দেয়। মোনামুনি দু'টি দ্রুত এক জায়গায় হলে নববিবাহিত দম্পতির মধ্যে মিল হয় ভাল।

৮। ভাদ্র, আশ্বিন আর কার্ত্তিক এই তিন মাস মল মাস। এই তিন মাসে বিবাহ হয় না।

৯। অগ্রহায়ণ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ হয় না। বিবাহ হলে কার্য-কারণ সূত্রে স্বামী-স্ত্রী ছাড়াছাড়ি অবস্থায় থাকে। বলা হয় অগ্রহায়ণ মাসে রামচন্দ্র ও সীতার বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। আর উভয়ের দাম্পত্য-জীবন মোটেই সুখের হয়নি।

১০। অবিবাহিত ছেলে বা মেয়ের কাছে প্রজাপতি উড়ে এলে সেই ছেলে বা মেয়ের শীঘ্র বিবাহ হয়।

১১। অবিবাহিতা মেয়ে কুলোর হাওয়া খেলে বুড়ো বর হয়।

১২। বিবাহের পর দিন হ'ল কালরাত্রি, এইদিন নববিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হওয়া বারণ।

১৩। অগ্রহায়ণ বা মাঘমাসের গোধূলি লগ্নে বিবাহ নিষিদ্ধ।

১৪। নববধূকে শ্রাবণ মাসের বৃষ্টির জল শ্বশুরালয়ে লাগাতে নেই। তাই শ্রাবণ মাসের আগেই নববধূকে পিত্রালয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৫। অবিবাহিতরা কার্ত্তিক ঠাকুরকে প্রণাম করলে তাদের আর বিবাহ হয় না।

১৬। শ্রাবণ মাসে অনেকেই বিবাহ নিষিদ্ধ বলে মানে। কারণ এই মাসে নাকি বেহুলার বিবাহ হয়েছিল এবং তিনি বিধবা হয়েছিলেন।

১৭। পৌষ এবং চৈত্রেও বিবাহ বারণ।

১৮। জন্মবারে বিবাহ নিষিদ্ধ।

১৯। বাড়ীতে কোন পরিচিত ব্যক্তি এলে অন্ততঃ কিছু সময়ের জন্য তাকে বসতে হয়, নইলে বাড়ীর মেয়েদের বিবাহ হয় না।

২০। নব বিবাহিতা বধূকে শ্বশুরবাড়ীতে প্রথমে গুণের (চটের) ওপর বসতে দিতে হয়। তাহলে শ্বশুরবাড়ীতে সকলের কাছে সে গুণের বলে স্বীকৃতি পায়!

২১। বিয়ের সময় বরকনে কলাতলায় খুরি ভাঙ্গে। বিশ্বাস এই যে খুরি যতটুকরো হবে, ততগুলি সন্তান জন্মাবে।

২২। বিয়ের তত্ত্ব পাঠাবার সময় কাতলা মাছের মুখে পানের খিলি দিয়ে পাঠাতে হয়। নইলে বিয়েতে বিচ্ছেদ ঘটার সম্ভাবনা।

২৩। বিয়ের দিন বরের সঙ্গে মাছ, দই আর পান নাপিতের হাতে দিয়ে পাঠাতে হয়।

২৪। বিয়ের দিন বরের বাড়ীতে বরের জন্যে কোন সধবা রমণীকে দিয়ে পরমান্ন রাঁধান হয়। আর এই সধবাকে নতুন কাপড় দিতে হয়।

২৫। পরপর ছু'টি স্ত্রীর মৃত্যু হলে তৃতীয়বার দার পরিগ্রহের আগে কলাগাছের সঙ্গে কাল্পনিক বিবাহ অনুষ্ঠান সেরে নিলে আর কোন অমঙ্গল হয় না।

২৬। বিয়ের সময় বর ও কন্যাকে স্নান করানোর পর বরের দক্ষিণ হাতে এবং কনের বাম হাতে তিন প্যাঁচ করে কার্পাস সূতা বেঁধে দিতে হয়। এরপর থেকেই বর রূপা কিংবা লোহার জাঁতি এবং কনে কাজললতা ধারণ করে।

২৭। ছাঁদনাতলায় বর-কনের শুভ দৃষ্টির সময় কোন ঋতুমতী নারীর সেখানে থাকতে নেই। থাকলে বর-কনের জীবনে নানাবিধ অশান্তি দেখা দেয়।

২৮। বাসরঘরে বর-কনে যাবার পর বর ও কনের মুকুট ও কপালী থেকে ছু'টি শোলা ছিঁড়ে নিয়ে একটা জলপূর্ণ পাত্রে দিয়ে দেওয়া হয়। শোলা ছু'টি ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় মিলিত হলে প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হয়।

২৯। বিবাহের দিন কনের মাকে উপবাস করে থাকতে হয়। বিশ্বাস, কনের মা যত শুকোবেন, কনে ততই সুখী হয় শ্বশুর বাড়ীতে।

৩০। বিবাহের পর বর যখন বধূকে নিয়ে নিজের গৃহে উপস্থিত হয়, তখন

এয়োস্ত্রীরা বরণডালা নিয়ে তাদের বরণ করে। এই সময়ে নব দম্পতির মাথার ওপর দিয়ে বাইরের দিকে দু'টি ডিম ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, এর ফলে নাকি যাবতীয় বালাই দূর হয়।

৩১। বিয়েতে সব সময় বিজোড় সংখ্যায় বরাতি থাকতে হবে।

৩২। বৈশাখ মাসের ভোরবেলা নীলকণ্ঠ পাখী দেখলে শিবের মত বর হয়।

৩৩। সুখী পরিবারের বৌ হাইহামলা বাটলে নবদম্পতি সুখী হয়।

৩৪। জ্যৈষ্ঠ মাসে জ্যেষ্ঠ পুত্র বা কন্যার বিবাহ দেওয়া হয় না।

গর্ভবতী রমণী ও প্রসূতির আচরণীয়

১। গর্ভবতী রমণীকে ঘটি, মুচি বা ঢাকনায় খেতে নেই। খেলে সন্তানের পেট বড় হয়।

২। গর্ভবতী রমণীকে টাকি, গজার. চিকর ইত্যাদি মাছ খেতে নেই। এই সব মাছ খেলে তার প্রভাব পড়ে নবজাতকের ওপর। যেমন টাকিমাছ খেলে সন্তান হয় টাকির মত বেঁটে; গজার খেলে জাতক হয় গজারের মতন দাগযুক্ত।

৩। গর্ভবতী রমণীকে কচ্ছপ খেতে নেই।

৪। গর্ভবতী রমণীকে মাছের জোড়া ডিম খেতে নেই, খেলে যমজ সন্তান হয়।

৫। গর্ভবতী রমণীকে পান ছিঁড়ে খেতে নেই, খেলে জাতক নুলো বা খোঁড়া হয়।

৬। গর্ভবতী রমণী বাঁধা গরু, ছাগল ডিঙ্গোবেনা।

৭। সাধের দিন রাত্রে ভাত খেতে নেই।

৮। অন্তঃসত্বা অবস্থাতে প্রসাধন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। সংস্কার, এতে অশরীরী এবং অশুভ আত্মারা ভর করে।

৯। গর্ভবতী রমণীর বিশেষ কোন খাদ্যে লোভ হলে সেই খাদ্য গ্রহণ করে লোভ মিটিয়ে ফেলা উচিত। নতুবা নবজাতকের মুখ দিয়ে খুব নাল পড়ে।

১০। সন্তানসম্ভবা রমণীকে কাপড়ের কোন আঁচলে গেঁট দিয়ে রাখতে হয়।

১১। গর্ভবতী অবস্থায় বেশি ঝাল খেতে নেই, খেলে সন্তান খুব রাগী হয়।

১২। আটে কাটে—আটমাস গর্ভাবস্থায় মেয়েদের খুব সাবধানে থাকতে হয়। এই সময় ঘরের চৌকাট ডিঙ্গোন নিষেধ। খাটে বা অন্য কোন উঁচু জায়গায় শোওয়াও নিষেধ।

১৩। অন্তঃসত্ত্বা রমণীর কাপড় সন্ধ্যের আগেই তুলে ফেলতে হয়। নইলে অপদেবতার দৃষ্টি পড়ে।

১৪। অন্তঃসত্ত্বার সময় সন্ধ্যার আগেই চুল বেঁধে ফেলতে হয়। সন্ধ্যার পরেও এলোচুলে থাকলে অশুভ শক্তির নজর পড়ে। ফলে মা ও ছা দুইই নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা।

১৫। অন্তঃসত্ত্বা রমণীর সন্ধ্যার পর বাইরে বেরোতে নেই। বিশেষতঃ শনি ও মঙ্গল বারে।

১৬। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মাথায় গন্ধ তেল মাখতে নেই, ফুল গুঁজতে নেই।

১৭। গর্ভাবস্থায় শাঁখা পরা নিষেধ।

১৮। গর্ভাবস্থায় নদী নালা পার হতে নেই।

১৯। পোয়াতীকে গ্রহণ-কালে ফল-ফুলুরি কিছু কাটতে নেই। সংস্কার হ'ল গ্রহণের মধ্যে পোয়াতী যদি এইরকম কিছু কাটে, তাহলে জাতক ঠোঁট নাক কাটা অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে।

২০। পোয়াতীকে এঁটো পাতা বা এঁটো হাঁড়ি ছুঁতে নেই।

২১। গর্ভবতী রমণী অশুচি রমণীকে স্পর্শ করে না।

২২। গর্ভবতী রমণীর মৃতদেহ দেখা নিষিদ্ধ এমন কি যে পথ দিয়ে মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেই পথে পর্যন্ত তার চলাফেরা করা নিষেধ।

২৩। এক গর্ভবতী রমণীর অন্য গর্ভবতী রমণীর সাধ ভক্ষণে অংশ গ্রহণ নিষেধ।

২৪। সাপ, বানর এবং কচ্ছপ গর্ভবতী রমণীর দেখা নিষেধ।

২৫। গর্ভাবস্থায় ছুঁচের সাহায্যে সেলাই করা নিষেধ। সংস্কার এই যে এর ফলে ছুঁচের আঘাত নাকি গর্ভস্থ সন্তানকেও স্পর্শ করে।

২৬। গর্ভাবস্থায় ছুঁচে সেলাই করলে গর্ভস্থ সন্তানটির চোখ নষ্ট হয়ে যায়।

২৭। গর্ভবতী রমণীর ঘাটে মাছ ধুতে যেতে নেই, মাছ ধুতে নিয়ে যাবার পর সেই মাছ যদি চিল ছোঁ মেরে নিয়ে যায়, তাহলে গর্ভস্থ সন্তানের অমঙ্গল হয়।

২৮। গর্ভবতী রমণীকে অশ্বত্থ, শেওড়া, নিম, বেলগাছ প্রভৃতিদের তলদেশ দিয়ে যাতায়াত করতে নেই।

২৯। পোয়াতীকে ঘরের বারান্দায় শুতে নেই।

৩০। গর্ভবতীকে লাউ বা সিম বীজ লাগাতে নেই। লাগালে যতদিন না লাউ বা সিম গাছে ফল ধরে, ততদিন পর্যন্ত গর্ভবতীর প্রসব বন্ধ থাকে।

৩১। পোয়াতীর প্রসব বেদনা শুরু হলে তার চুলে ধানপোকা দিয়ে দিতে হয়। দিলে পোয়াতীর প্রসব হয় নির্বিঘ্নে এবং তাড়াতাড়ি।

৩২। গর্ভবতীর গর্ভ অনেক সময় নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম নষ্টগর্ভা রমণীর পেটের মাঝখানে 'আষাঢ়িয়া নাইল্যার পাটে'র একটা খোয়ায় একুশটি গেরো দিয়ে বেঁধে দিতে হয়। দিলে আর গর্ভ নষ্ট হয় না।

৩৩। হিন্দু সমাজে নারী সন্তানবতী হলে পাঁচ মাসে কাঁচা সাধ এবং ন' মাসে পাকা সাধ খাওয়ানোব রীতি। সংস্কার এই যে গর্ভবতী রমণীর সাধ অপূর্ণ থাকলে তার সন্তানটি হয় লোভী এবং অসংযমী।

৩৪। লোক-বিশ্বাস প্রসূতির প্রথম সন্তানটি নষ্ট হলে তার পরবর্তীকালেরও কোন সন্তান আর বাঁচে না। কারণ প্রসূতির 'মল্লির দোষ' ঘটে। এক্ষেত্রে প্রসূতিকে একচোরা ব্রত পালন করতে হয়। একচোরা ব্রত পালন করলে প্রসূতির সব দোষ দূর হয়ে যায়।

৩৫। গর্ভবতীকে ঝাঁটা বাঁধতে নেই। বাঁধলে জাতকের নাড়ি জড়িয়ে যায়।

৩৬। গর্ভবতী রমণীর রাত্রে একা ঘরের বাইরে যেতে নেই। যদিই বা বেরোতে হয় সেক্ষেত্রে সঙ্গে আগুন নিতে হয়।

৩৭। গর্ভবতী রমণীর কোন কিছু ডিঙোতে নেই।

৩৮। গর্ভাবস্থায় কোন দুঃসংবাদ দিতে নেই।

৩৯। গর্ভবতী রমণীর শিলনোড়া, কলসী অথবা ধামার ওপরে বসতে নেই।

৪০। গর্ভবতী রমণীর আগুনে জল ঢালতে নেই।

৪১। গর্ভবতী রমণী যদি চিংড়ি মাছ খায়, তাহলে ভাবী সন্তানের মাথার চুল হয় কোঁকড়ানো।

৪২। গর্ভাবস্থায় সাপ দেখতে নেই, তাহলে ভাবী সন্তানও জিভ বার করা হয়।

৪৩। গর্ভাবস্থায় খড়ি কাটলে সন্তানের ঠোঁটও কাটা হয়। তাই এই সময় খড়ি কাটাতে নেই।

৪৪। আঁতুড় ঘরে নব পোয়াতী সাতদিন অবধি মাথায় ঘোমটা দেয় না। কারণ এটা দোষের।

৪৫। পোয়াতীর দুধ চুলোয় পড়লে স্তন দুগ্ধ শুকিয়ে যায়।

৪৬। গর্ভবতী রমণীর সাপের গর্ত ডিঙ্গান নিষেধ। এতে ভাবী সন্তান নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

৪৭। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় সুদখোর দেখতে নেই, দেখলে সন্তান সুদখোরের প্রকৃতি নিয়ে জন্মায়।

৪৮। গ্রহণের সময় গর্ভবতী রমণীর ঘড়া ভাঙ্গতে নেই, ভাঙ্গলে সন্তান পঙ্গু হয়।

৪৯। গর্ভবতী অবস্থায় শ্মশানে যাওয়া নিষেধ।

৫০। গর্ভবতী রমণীর ঘরে সুন্দর শিশুর ছবি রাখতে হয়, তাহলে গর্ভবতীও সুন্দর শিশু প্রসব করে।

৫১। সন্ধ্যায় গর্ভবতী রমণীর জল আনতে নেই, অবশ্যই পুকুরঘাট থেকে।

৫২। ফলবতী গাছ গর্ভবতীকে কাটতে নেই।

৫৩। গর্ভবতী মেয়েদের সহজে কোন কিছুতে গেঁট দিতে নেই।

৫৪। প্রসূতিকে শোলা জ্বালাতে নেই, জ্বালালে প্রসবের সময় কষ্ট পেতে হয়।

৫৫। অমাবস্যা এবং পূর্ণিমায় গর্ভবতী রমণীর সাদা গাইয়ের দুধ খাওয়া বারণ।

৫৬। গর্ভাবস্থায় কলার থোড়, ঢেঁকিশাক ইত্যাদি খেতে নেই, খেলে সন্তানও লোমশ হয়ে জন্মায়।

৫৭। উঁচুকপালী নারী প্রথমে পুত্র সন্তান প্রসব করে বলে বিশ্বাস।

৫৮। সূর্য গ্রহণের সময় গর্ভবতী রমণীর মাছ কাটা নিষেধ, কারণ তাহলে সন্তানের ঠোঁট কাটা হয়।

৫৯। গর্ভবতী রমণীকে কিছু খাদ্যদ্রব্য দিলে তাতে রসুনের কোয়া দিয়ে দিতে হয়।

৬০। গর্ভাবস্থায় সকালে অথবা সন্ধ্যায় খালি কলসী দেখতে নেই।

৬১। কন্যা সন্তান জন্ম গ্রহণের পর একমাস এবং পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে একুশদিন পর্যন্ত অশৌচ থাকে। এই সময়ের মধ্যে রান্নাঘরে ঢোকা, কিংবা পূজার্চনার ঘরে প্রবেশ করা যায় না।

৬২। গর্ভাবস্থায় ঘর মোছার পর ন্যাতা না ধুলে প্রসবকালে কষ্ট পেতে হয়।

৬৩। আঁতুড় ঘরের থেকে পায়খানা করতে গেলে খালি গায়ে যেতে নেই। খালি গায়ে গেলে পায়খানা হয়ে যাবার পর স্তনদুটি জলে ধুয়ে ফেলতে হয়। তার আগে শিশুকে স্তন দিতে নেই।

৬৪। গ্রহণের সময় গর্ভবতী রমণীর কোথাও কোন দাগ দিতে নেই।

৬৫। সন্তানের জন্মের ছ'দিনের দিন রাত্রে প্রসূতিকে সারারাত সন্তানকে কোলে নিয়ে জেগে থাকতে হয়।

৬৬। নবজাতকের অন্নপ্রাশন না হওয়া পর্যন্ত প্রসূতিকে সন্তানকে স্তনদুগ্ধ দেবার আগে প্রথমে স্তনদুগ্ধ একটু বার করে সন্তানের বুকে দিতে হয়।

৬৭। আঁতুড় ঘরের পোয়াতী পায়খানা করার সময় সঙ্গে একটা ছুরি বা অন্য কোন অস্ত্র রাখে।

৬৮। প্রসূতির স্তনদুগ্ধ মেঝেয় যদি পড়ে, আর তা যদি পিঁপড়েয় খায়, তাহলে প্রসূতির স্তনের দুধ শুকিয়ে যায়।

৬৯। আঁতুড় ঘর থেকে প্রসূতি বাইরে গেলে ফের ঘরে ঢোকার সময় আগুন ছুঁয়ে তবে ঘরে ঢুকতে হয়।

৭০। সদ্য প্রসূতি আঁতুড় ঘরের বাইরে গেলে প্রথম ২১ দিন পর্যন্ত সঙ্গে কাস্তে রাখে।

৭১। দুপুরবেলা গর্ভবতী রমণীকে বাঁশ ঝাড় বা শেওড়া গাছের পাশ বা তলা দিয়ে যেতে নেই।

৭২। গর্ভবতী রমণী গ্রহণকালে যাঁতি দিয়ে সুপারি কাটলে ভাবী সন্তানের ওপরের ওষ্ঠ কাটা হয়।

৭৩। সন্তান সম্ভবা মেয়েকে অষ্টধাতু ধারণ করতে হয়।

৭৪। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় কাউকে রাত্রে খাটের লেজের দড়ি টান করতে দিতে নেই। দিলে কন্যা সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা।

৭৫। গর্ভবতী রমণীকে দিনে অথবা রাত্রে একা থাকতে দিতে নেই।

৭৬। কোন মৃত বৎসার পায়ের দাগের ওপর গর্ভবতী রমণীর পা ফেলতে নেই।

৭৭। গর্ভবতী নারীকে শবানুগমন করতে নেই অথবা দেবপূজায় বলি দিতে নেই।

৭৮। গর্ভাবস্থায় গুণিকের সামনে যাওয়া নিষেধ।

৭৯। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হাড় ডিঙ্গোতে নেই।

৮০। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মাঠ থেকে ফেরানো ভাত খেতে নেই।

৮১। গর্ভাবস্থায় ভেড়ার মাংস খেতে দিতে নেই, খেলে জাতকের গায়ে লোম বেশি হয়।

বৃষ্টি সম্পর্কিত

১। শনির সাত মঙ্গলের তিন
বাকি সব দিন দিন।
শনিবার বৃষ্টিপাত শুরু হলে তার মেয়াদ চলে সাতদিন পর্যন্ত। মঙ্গলবার বৃষ্টিপাত শুরু হলে সেক্ষেত্রে মেয়াদ চলে তিনদিন ধরে। সপ্তাহের অন্য অন্য দিন বৃষ্টি এক দিনেই শেষ হয়।

২। অবিরাম বৃষ্টিপাত বন্ধ করতে একটি আচার অনুসৃত হয়। এমন একজন স্ত্রীলোক যার প্রথম সন্তানটি ছেলে এবং যার তার পূর্বে কিংবা পরে আর কোন সন্তান হয়নি বা হয়ে মারা যায়নি, এমনকি প্রসবের আগেও নষ্ট হয়নি, সেই স্ত্রীলোক যদি একটি বাটি উপুড় করে দেয় তাহলেই বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়।

৩। ব্রাহ্মণের মাধ্যমে শিবের মাথায় যদি ১০৮ ঘড়া গঙ্গাজল, পরিবর্তে জলাশয়ের জল ঢালা যায় তাহলে বৃষ্টি হয়।

৪। ছোট ছেলে উলঙ্গ হয়ে মাথায় কুলো নিয়ে খোলা উঠোন বা ছাদের মাঝখানে তিনবার ঘুরলে বৃষ্টি হয়।

৫। অতিবৃষ্টি বন্ধ করতে যে স্ত্রীলোকের একটি মাত্র মেয়ে তাকে মাটির নীচে একটা বাটি পুঁততে হয়।

৬। কারো বাড়ী থেকে না জানিয়ে পান খাওয়ার চুন চুরি করলে বৃষ্টি থামে।

৭। ব্যাঙ মেরে চিৎ করে রাখলে বৃষ্টি হয়।

৮। শেষে পুরযুক্ত ১০৮টি জায়গার নাম একটি কাগজে লিখে দম বন্ধ করে সেটি মাটিতে পুঁতে দিলে বৃষ্টি হয়।

৯। ব্যাঙ গাছে উঠলে বৃষ্টি হয়।

১০। অনাবৃষ্টির সময় ছেলেরা যদি মাঠে জল ঢেলে কাদা করে সেই কাদায় গড়াগড়ি যায় এবং মুখে 'হো হো মর্ত্যরাণী' বলে, তাহলে বৃষ্টি নামে।

১১। অতিবৃষ্টি থামাতে দুটো ব্যাঙ ধরে তাদের সিঁদুর, হলুদ আর তেল মাখিয়ে বিয়ে দিতে হয়।

১২। চুনের বাটি লুকিয়ে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে মাটিতে পুঁতলে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়।

১৩। অতিবৃষ্টি বন্ধ করতে আছাড় খেতে হয়।

১৪। অতিবৃষ্টির সময় হাঁড়ির পেছনটা দেখাতে হয়, তাহলেই বৃষ্টি থেমে যায়।

১৫। কারো ঢেঁকি গোপনে চুরি করে পুকুরের ধারে উল্টে অথচ খাড়াভাবে পুঁতে রাখলে বৃষ্টি নামে।

১৬। অতিবৃষ্টির সময় কারো জিনিস চুরি করে পুঁতে রাখতে হয়, যার জিনিস সে গাল পাড়লে বৃষ্টি থেমে যায়।

১৭। ব্যাঙ যদি ঘন ঘন ডাকে,তাহলে বৃষ্টি হয়।

১৮। সদাচারী ব্যক্তিকে রোদে কষ্ট দিলে বৃষ্টি নামে।

১৯। গরু ওপরের দিকে চাইলে এবং সাপ গাছে উঠলে শীঘ্র বৃষ্টি নামে।

২০। যে ছেলে মামার বাড়ীতে জন্মেছে, সে যদি উলঙ্গ হয়ে উঠানে অথবা দরজার সামনে কিছু দিয়ে খুঁড়ে আগুন চাপা দেয়, তাহলে একটানা বৃষ্টি থেমে যায়।

২১। খুব বৃষ্টির সময় যদি বংশের একমাত্র মেয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে কারোর বাড়ীর বাটি চুরি করে মাটিতে পুঁতে দেয়, তাহলে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে যায়।

২২। মাছধরা খলসুন চুরি করে নিয়ে গিয়ে শুষ্ক স্থানে পেতে রাখলে বৃষ্টি হয়।

২৩। অমাবস্যা রাতে কৃষক রমণীর উলঙ্গ নৃত্যে বৃষ্টিপাত ঘটে।

কৃষি সংক্রান্ত

১। অমাবস্যায় হলকর্ষণ নিষিদ্ধ। তাই বলা হয়েছে, 'কুঁড়ে কৃষাণ অমাবস্যা খোঁজে'।

২। জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃক্ষরোপণ নিষিদ্ধ।

৩। অম্বুবাচীর সময় অর্থাৎ ৭ই আষাঢ় থেকে ৯ই আষাঢ় এই তিনদিন বীজবপন, ভূমিকর্ষণ নিষিদ্ধ।

৪। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় হাল চালান বারণ। কারণ এই সময়ে হাল চালালে বলদের বাত হয়।

৫। শোনে ক্ষেতি বুধে ঘর।
মাহুতে কয় না কর।
—শনিবারে বীজবপন এবং বুধবারে গৃহনির্মাণ করতে নেই। মহৎ ব্যক্তি তাই এই দুই প্রকার কাজ করা থেকে ঐদু'দিন বিরত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

৬। এক জমিতে তিন অমাবস্যায় চাষ শুরু করলে সেই জমিতে চাষ হয় না।

৭। নিজের জমিতে বীজ ফেলার আগে অন্য কাউকে বীজ দেওয়া হয় না।

৮। প্রথম যেদিন বীজ-ধান বীজাগার থেকে বার করা হয়, সেদিন একটা কলসী বা ঘট জল পূর্ণ করে তাতে সিঁদুরের তিনটি দাগ দিয়ে বীজাগারের সামনে রাখা হয় আর ঘটে বা কলসীতে রাখা হয় আম্রসহ একটি ডাল এরপর আমডালসহ জল আর বীজ-ধান জমিতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রথমদিন বাড়ির কর্তাকে বীজ বপনের সময় জমিতে উপস্থিত থাকতে হয়। এবং সব না হলেও অন্ততঃ তিন মুঠো বীজ প্রথমে তাঁকেই জমিতে ফেলতে হয়। সব বীজ বোনা শেষ হলে ঘট বা কলসির জল জমিতে ঢেলে দেওয়া হয়। আর আমডালটি হয় জলাশয়ের জলে ফেলে দেওয়া হয় নতুবা গরুকে খাইয়ে দেওয়া হয়। প্রথম বীজ

বোনার দিন বাড়ীতে আতপ চালের ভাত খেতে হয়। তাছাড়া হয় ছোলার ডাল, সজনে শাক, লাউ শাক এবং মাছ। যে আতপ চাল এদিন রান্না হয় সেই আতপ চাল এইদিনই তৈরী করা হয়। আর ধানের তুঁষ একটা পাত্রে করে নিয়ে গিয়ে যে জমিতে বীজ বোনা হচ্ছে সেখান পর্যন্ত ফেলতে ফেলতে যাওয়া হয়। তুঁষ ফেলে বাড়ীর ছেলেরা। যে আতপ চাল রান্না হয় এদিন সেই আতপ চাল কিছু, আর কিছু ছোলার ডাল জলে ভিজিয়ে রাখা হয়। কিষাণদের এই ভিজে চাল, ডাল গুড় সহযোগে জমিতে জলযোগের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বীজ বোনা হয়ে গেলে কৃষাণরা বাড়ীতে খেতে আসে। তখন তাদের মাথায় জল ঢেলে দেওয়া হয়। এতে জমিতে জলের অভাব দেখা দেয় না। খরা বা অনাবৃষ্টি হয় না। জমি শীতল থাকে।

৯। গায়ে যার ফোঁড়া হয়, তার প্রচুর শস্য ফলে।

১০। সরষে বোনার সময় জলে হাত লাগাতে নেই।

১১। সরষে পুরোপুরি পেকে যাবার পরে তা তুলতে যাবার আগে নতুন চালের ভাত খেতে নেই।

১২। সোমবার দিন ধান লাগালে ধানের ফলন বাড়ে।

১৩। ধান কেটে ফেলার পর ওই ধানের চারায় আবার যদি ধান হয়, তাহলে তা খেতে নেই। খেলে আয়ু হ্রাস পায়।

১৪। মেঝের ওপর ধান রাখলে সেই ধানের আর চারা হয় না।

১৫। আখের ক্ষেতে পোকা লাগলে একটি কাগজে তিনজন সুদখোরের নাম লিখে আখের চারায় বেঁধে দিতে হয়।

১৬। সোম এবং শুক্র যাত্রা করার পক্ষে যেমন ভাল, তেমনি ভাল চাষ-বাসের ব্যাপারে—সোম শুক্রে চাষবাস
যথা ইচ্ছা তথা যাস।

১৭। বাসি কাপড়ে পটোলের ক্ষেতে এবং পানের বরোজে ঢুকতে নেই।

১৮। একাদশীর দিন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া ভাল নয়।

১৯। কুমড়ো, আলু, পটোল ইত্যাদির জমিতে মাটির হাঁড়িতে বিজোড় সংখ্যায় চুনের দাগ লাগিয়ে হাঁড়িটা উল্টিয়ে রেখে দেওয়া হয়। এতে জমিতে নজর লাগে না।

নজর লাগা সম্পর্কিত

১। ছোট শিশুকে সাজিয়ে গুজিয়ে বাড়ির বাইরে বার করার আগে তার কড়ে আঙ্গুলটা একটু কামড়িয়ে দিতে হয়। বিশ্বাস, এর ফলে তার ওপর বাইরের লোকের নজর পড়বেনা, পড়বেনা কুদৃষ্টিও। কিংবা বাতাস লাগবেনা।

২। নতুন বাড়িঘর তৈরীর সময় ছেঁড়া চুপড়ি, ঝাঁটা, জুতো ইত্যাদি টাঙ্গিয়ে রাখতে হয়। এর ফলে নির্মীয়মাণ গৃহে কারো কুদৃষ্টি পড়ে না।

৩। বিশেষ কোনো খাদ্য দ্রব্যে অপরের নজর যাতে না পড়ে সেজন্য সেই খাবারের অংশ দাঁতে কেটে তাতে থুতু দিয়ে ফেলে দিতে হয়।

৪। ক্ষেতে যাতে কারো নজর না লাগে সেজন্য মাটির হাঁড়িতে চুন দিয়ে মানুষের মুখ এঁকে ক্ষেতে ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

৫। শিশুর ওপর যদি কারো নজর পড়ে, তাহলে সেই নজর থেকে মুক্ত করতে সন্ধ্যেবেলা তিনটে শুকনো মরিচ আগুনে দিয়ে সেই আগুনে শিশুকে সেঁকতে হয়।

৬। জন্মের পরই শিশুর কান ছেঁদা করে দিতে হয়। খুঁতযুক্ত শিশুকে প্রেতাত্মা স্পর্শ করেনা।

৭। শিশুর হাতে পায়ে লোহার বালা বা মল পরাতে হয়,এতে শিশু ডাইনীর প্রভাব থেকে মুক্ত থাকে।

৮। নবজাতকের ওপর পেঁচার দৃষ্টি পড়লে জাতকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে।

৯। শিশুর যদি নজর লাগে এবং এর ফলে যদি দুধ খেতে না চায়, তাহলে একমুটো শুকনো লঙ্কা এবং সরষে নিয়ে আরতির মতন তিনবার শিশুকে করে ঐ লঙ্কা-সরষে উনুনে দিয়ে দিতে হয়। যদি ঝাঁঝ বেরোয় বুঝতে হবে শিশুর ওপর নজর পড়েছে, আর ঝাঁঝ যদি না বেরোয় বুঝতে হবে নজর পড়ে নি।

১০। শিশুর ওপর যাতে কারো নজর না পড়ে, সেইজন্যে শিশুর কোমরে কালো কার বেঁধে রাখতে হয়।

১১। নজর লাগা থেকে শিশুকে রক্ষা করতে বাড়ির বাইরে নিয়ে যাবার সময় একটা গোবরের ফোঁটা দিয়ে দিতে হয়।

১২। নবজাতক যদি ছেলে হয় তাহলে তার কোমরে মাছ ধরার জালের একটা কাঠি বেঁধে দিতে হয়। আঁশটে কাঠি বাঁধা থাকায় ভূতের দৃষ্টি পড়ে না।

১৩। ছোট শিশুকে বাড়ী থেকে বের করার সময় তার কোমরের ঘুনসিতে কাঁচা খেঁজুর পাতা দিতে হয়। তাহলে আর নজর লাগেনা বা অশুভশক্তি কোন প্রভাব ফেলতে পারে না।

১৪। সন্ধ্যাবেলায় শিশুদের জিনিস বাইরে রাখতে নেই।

ভোজন সম্পর্কিত

১। ত্রয়োদশীতে বেগুন খেতে নেই।

২। রবিবার এবং বৃহস্পতিবার মুসুরডাল খেতে নেই।

৩। শেষপাতে শাক খেতে নেই।

৪। শেষপাতে তেতো খেতে নেই।

৫। সরস্বতী পুজোর আগে কুল খেতে নেই, বিশেষত শিক্ষার্থীদের। কারণ তাহলে বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী অসন্তুষ্ট হন।

৬।
আধখাওয়াতে ছাড়লে পিঁড়ি
অনেক দূরে শ্বশুরবাড়ী।

মেয়েরা খেতে বসে খাওয়া সম্পূর্ণ না করে উঠে গেলে তাদের বহুদূরে বিয়ে হয় বলে সংস্কার।

৭। মেয়েদের পা ছড়িয়ে খেতে বসতে নেই। বসলে শ্বশুরবাড়ী দূরে হয়।

৮। রথের পর থেকে রাসযাত্রা পর্যন্ত বিধবারা কলমীশাক খান না। বিশ্বাস, জগন্নাথদেব এই সময় কলমী শাকের ওপর শুয়ে থাকেন।

৯। মাঘ মাসে মুলো খেতে নেই। এই সময়ে মুলো খুব শক্ত হয়ে যায়, তাই সংস্কার হলো মুলো এই সময়ে গরুর শিঙের সমান হয়।

১০। যাদের প্রথমটি পুত্র সন্তান, তাদের জ্যৈষ্ঠমাসে লাউ খেতে নেই।

১১। বিবাহিত রমণী এলোচুলে খেতে বসলে স্বামী পাগল হয়ে যায়।

১২। ভুট্টা খাওয়ার পর ভুতিটা ফেলে দিতে নেই। ভুতিটাকে ভেঙ্গে দু'টুকরো করে নিয়ে তারপর তা শুঁকে ফেলে দিতে হয়।

১৩। পিতার বর্তমানে পুত্রকে দক্ষিণমুখী হয়ে বসে আহার করতে নেই। করলে পিতার মৃত্যু হয়। আবার পুত্র বর্তমানে পিতাকেও উত্তরমুখী হয়ে আহার করতে নেই। করলে পুত্রহানির আশঙ্কা থাকে।

১৪। চৈত্র মাসে সিম খেতে নেই।

১৫। গোধূলিতে কিছু খেতে নেই, খেলে অমঙ্গল হয়।

১৬। বিজয়া দশমী থেকে সরস্বতী পূজা পর্যন্ত ইলিশমাছ খাওয়া নিষেধ।

১৭। মাতাপিতা জীবিতাবস্থায় সন্তানের উত্তরমুখী হয়ে খাওয়া নিষেধ।

১৮। চালুনি থেকে হাত দিয়ে তুলে খই খেতে নেই। খেলে 'সরখাই' নামে এক ব্যাধির দ্বারা আক্রান্ত হতে হয়।

১৯। মাগুর মাছের মাথা খেলে স্ত্রীবিয়োগ হয়।

২০। দুধের সঙ্গে নুন খেতে নেই। কারণ তা গোরক্তের সমান।

২১। জামাই ষষ্ঠীর দিন পোনামাছ খাওয়া নিষেধ।

২২। গ্রহণের সময় আহার্য গ্রহণ নিষেধ।

২৩। মাটির সরাতে ছেলেদের খেতে নেই, খেলে বোবা হয়।

২৪। শনি ও মঙ্গলবার মোচা খেতে নেই, ছুঁতে বা কিনতেও নেই।

২৫। বিধবাদের মুসুর ডাল, পুঁইশাক এবং মাসকলাই খেতে নেই।

২৬। ছেলেদের ল্যাটা মাছ খেতে নেই।

২৭। এক সন্তানের মা মাগুর মাছের মাথা খান না।

২৮। কার্ত্তিক মাসে ওল খেতে নেই।

২৯। গোয়ালে চালভাজা খেতে নেই, খেলে গরুর বসন্ত হয়।

৩০। খাওয়ার সময় ভিক্ষুককে ভিক্ষা দেওয়া নিষেধ।

৩১। ফাঁকা মাঠে মুড়ি বা অন্য কোন খাবার খাওয়ার সময় যদি হঠাৎ দমকা বাতাস বয়, তাহলে কিছু মুড়ি বা খাবার ফেলে দিতে হয়।

৩২। বাড়ীতে ভাত খাবার সময় ভিখারী এলে কোন একটা পায়ের বুড়ো আঙ্গুল মুড়ে বসে খেতে হয়। তাহলে আর ভিখারীর নজর লাগেনা।

৩৩। দুর্গাপূজার ক'দিন ঢেঁড়স খেতে নেই। কারণ ঢেঁড়সের সঙ্গে দেবীর

আঙ্গুলের সাদৃশ্য আছে।

৩৪। পরীক্ষার আগে চিঁড়ে খেতে নেই।

৩৫। অন্ধকারে খেতে নেই।

৩৬। শুধু মাটিতে বসে খেতে নেই, আসন বা পিঁড়ি নিয়ে বসতে হয়।

৩৭। পাতের তলায় জল ছিটিয়ে খেতে বসতে হয়।

৩৮। রবিবার নিমপাতা খেতে নেই।

৩৯। কার্তিক মাসের ভূত চতুর্দশী তিথিতে চোদ্দশাক খেতে হয়।

৪০। ছাঁদনাতলায় বসান কলার তেউড় বাগানে রোপণ করা হলে সেই কলা-গাছের কলা বর-কনে কখনও খায় না।

৪১। নবমীতে লাউ খাওয়া নিষেধ।

৪২। খোলা চুলে বড় গ্রাস তুলে খায় যে নারী সে অলক্ষ্মী।

৪৩। স্ত্রীলোকে জোড়া কলা খায়না। জোড়া কলা খেলে যমজ সন্তান হয়। শুধু জোড়া কলা কেন স্ত্রীলোকে কোন জোড়া ফলই খায় না একই কারণে। স্ত্রীলোক মাত্রই সন্তানের জননী হতে চায়। কিন্তু তাই বলে যমজ সন্তান কেউ চায়না। কারণ যমজ সন্তান মানুষ করা খুব কঠিন এবং কষ্টদায়ক। এর ফলেই সংস্কারটির উদ্ভব হয়েছে সম্ভবত।

৪৪। এক সন্তানের বিধবা জননীর খেতে বসে বাঁশির শব্দ শুনলে আর খাওয়া হয় না।

৪৫। খেতে বসে জিভ কামড়ালে অন্যে নাম করছে বলে ধরা হয়।

৪৬। খেতে বসে জিভ কামড়ালে শীঘ্র মাংস ভোজনের সম্ভাবনা দেখা দেয়।

৪৭। বুধবার বেগুন খেতে নেই।

৪৮। মেয়ের বিয়ের পর যতদিন না তার সন্তান হচ্ছে, ততদিন মেয়ের বাড়িতে তার মা-বাবার অন্নগ্রহণ করতে নেই।

৪৯। পুরুষ মানুষের কই মাছের মাথা খেতে নেই, খেলে পেটে পাথর হয়।

৫০। খাবার সময় খাদ্যের কিছু অংশ ফেলে রাখতে হয়। নইলে ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

৫১। ভাত খেতে বসে ভাত ছড়ালে লক্ষ্মী অসন্তুষ্ট হন।

৫২। গালে হাত দিয়ে খেতে নেই।

৫৩। পশ্চিমদিকে মুখ করে খেতে নেই।

৫৪। ভাত খেতে বসা অবস্থায় মড়া গেলে পাতের তলায় জল দিতে হয়।

৫৫। ঋতুমতী হওয়ার পর চারদিনের দিন শাক খেতে নেই, খেলে শোক হয়।

৫৬। সন্তানের জন্মবারে মায়েরা কোন পোড়া জিনিস খান না।

৫৭। ছাঁচতলায় কিছু খেতে নেই, খেলে ভূতে ধরে।

৫৮। কালাশৌচের সময় ভিন্ন গোত্রের হাতে অন্ন খাওয়া চলে না।

৫৯। হবিষ্যান্ন করার সময় পাত ছেড়ে উঠে যেতে নেই। একেবারে খাওয়া শেষ করে তবে উঠতে হয়।

৬০। তেমাথার মাঝখানে দাঁড়িয়ে খাওয়া নিষেধ।

৬১। ভাত গোল করে খেতে নেই।

৬২। শনিবারে পোড়া খেলে গ্রহদোষ কাটে।

৬৩। মেয়েদের নারকেল ফোঁপড়া খেতে নেই।

৬৪। ভাদ্রমাসে ভাদুরে মেয়ের মাকে তাল, শশা, তেঁতুল, আতা ইত্যাদি খেতে নেই।

৬৫। জ্যৈষ্ঠ মাসে মা ও বড় ছেলেকে বেল খেতে নেই।

৬৬। বাসি শাক এবং পায়েস খেতে নেই।

৬৭। শাক চেয়ে খেতে নেই।

৬৮। রাতে পুরুষদের শাক খেতে নেই।

৬৯। এঁটো নুন খেতে নেই, খেলেও শুঁকে নিয়ে তবে খেতে হয়।

৭০। অম্বুবাচীর সময় আম আর দুধ খেতে হয়।

৭১। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন নারকেল জল খাওয়া বিধেয়।

৭২। একপাতে তিনজনের খেতে নেই।

৭৩। একসঙ্গে তিনটি জিনিস খেলে ভাইয়ের দোষ হয়।

৭৪। শাক, জল, নুন ও পায়েসের শেষ রেখে খেতে নেই।

৭৫। মেয়েদের আস্তফল কামড়ে খেতে নেই, তাহলে তার প্রথম সন্তানটি নষ্ট হয়ে যায়।

৭৬। মাংস ও দুধ একসঙ্গে খেতে নেই।

৭৭। ডাবের জল ভাগ করে খেতে নেই।

৭৮। ভাত খেতে বসে থালার ওপর বাটি তুলে খেলে মেয়েদের ক্ষেত্রে সতীন হয়। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে দুবার বিয়ে হয়।

৭৯। রাত্রে মেয়েদের দই খাওয়ার সময় জল ছিটিয়ে খেতে হয়, নইলে ছেলে-মেয়ের দোষ হয়।

৮০। চৈত্র মাসে লাউ খেতে নেই।

৮১। মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনিবার কোন মহিলা বেগুন পোড়া খেলে তার সুখ-শান্তি নষ্ট হয়।

৮২। দ্বাদশীতে শাক খেতে নেই।

৮৩। বাসি পান খেতে নেই।

৮৪। খাওয়া হয়ে গেলে থালায় জল না ঢাললে মায়ের বুক শুকিয়ে যায়।

৮৫। একাদশীতে বেগুন খেতে নেই। পুত্রের দোষ হয়।

৮৬। দ্বাদশীতে পুঁইশাক খেতে নেই। পুত্রের দোষ হয়।

৮৭। মাঘ মাসে নিমপাতা খেতে নেই।

৮৮। ছেলের জন্মবারে নিমপাতা খেতে নেই, খেলে অশান্তি হয়।

৮৯। চৈত্রমাসে বেগুন খেতে নেই।

৯০। ল্যাটা মাছের মাথা খেতে নেই।

৯১। শ্রীপঞ্চমীর পর গোটা পিঠে খাওয়া নিষেধ।

৯২। তেরই জ্যৈষ্ঠ রোহিনীর দিন একটুকরো আষাঢ়ীফল মুখে দিতে হয়। তাহলে তা সর্পবিষের প্রতিষেধক হয়।

৯৩। মাঘ মাসে ভীম একাদশীর পরের দিন কুলের সঙ্গে বেথাশাকের তরকারী খেতে হয়।

৯৪। বাড়ীতে অশৌচ চলাকালে আ-হলদে, আ-সাঁতলা খাওয়া নিয়ম।

৯৫। নতুন ধান উঠলে নিজে খাওয়ার আগে রাস্তার গরীব মানুষদের ক্ষীর রেঁধে খাওয়াতে হয়।

৯৬। যেদিন যে গৃহস্থের ধান লাগানো হয়, সেদিন সেই গৃহস্থ বাড়ীর মেয়েদের খেতে হয় কচুর শাক, মুরগী এবং ক্ষীর।

৯৭। গৃহস্থের প্রথম সন্তানকে কোন খাদ্যদ্রব্যের প্রথম অংশ খেতে দেওয়া হয় না। খেতে দিলে তার অকালমৃত্যু হবে বলে বিশ্বাস।

৯৮। আফুলা কলাগাছের কান্দাল কিংবা মাইজ খেলে মেয়েদের সন্তান হয় না।

৯৯। দই-ভাত খেতে নেই।

১০০। মেহেদি পাতা ঘিয়ে ভেজে খেলে অধিক সন্তান হয় না।

১০১। সন্তান হওয়ার সাতদিন পরে সাত রকমের তরকারী এবং তের দিনের দিন তের রকমের তরকারী খাওয়াতে হয়।

১০২। পা মুড়ে খেতে নেই, মায়ের শ্রাদ্ধ করা হয়।

১০৩। সূর্যাস্তের পর ফল খাওয়া নিষেধ।

১০৪। মাংস ভক্ষণ না করলে সমুদয় সুখ উৎপন্ন হয়।

১০৫। পিঁয়াজ ভক্ষণ গোমাংস আহার তুল্য।

১০৬। শ্রাদ্ধান্ন আহার করলে বিশেষ অনিষ্ট হয়।

১০৭। বৃহস্পতিবারে আমিষ ভোজনে বহুমূত্র রোগ হয়।

১০৮। একবার রান্না করা ভাত, ডাল, তরকারী আবার গরম করে খেলে চক্ষু অন্ধ হয়, হাত-পা কাঁপুনি রোগ হয়।

১০৯। উদ্ধৃত অন্ন, তরুণ দধি, অতি কচি চালকুমড়া, একসঙ্গে ঘৃত ও মধুপান, মধুর সঙ্গে উষ্ণ জল পান বিষবৎ অনিষ্টকর।

১১০। রবিবারে মধু ভক্ষণে দারিদ্র্য দোষ হয়।

১১১। রাত্রে দধি ও যবের ছাতু ভক্ষণ করলে লক্ষ্মীত্যাগ করেন।

১১২। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, সংক্রান্তি, চতুর্দশী ও অষ্টমীতে স্ত্রী, তৈল ও মাংস সেবনে চণ্ডালযোনি প্রাপ্ত হতে হয়।

১১৩। রবিবার মাছ, মাংস, মসুর ডাল, আদা এবং কাঁসার বাসনে আহার করলে কুম্ভীপাক নরকবাস হয়।

১১৪। প্রতিপদে চালকুমড়া ভক্ষণে অর্থহানি ঘটে।

১১৫। দ্বিতীয়ায় বেগুন ভক্ষণে হরিস্মৃতি হ্রাস পায়।

১১৬। তৃতীয়ায় পটল ভক্ষণে শত্রু বৃদ্ধি পায়।

১১৭। চতুর্থীতে মূলা ভক্ষণে ধন হানি ঘটে।

১১৮। পঞ্চমীতে বেল ভক্ষণে কলঙ্ক রটে।

১১৯। ষষ্ঠীতে নিম ভক্ষণে পক্ষিযোনি প্রাপ্তি ঘটে।

১২০। সপ্তমীতে তাল ভক্ষণে শরীর বিনাশ হয়।

১২১। অষ্টমীতে নারকেল ভক্ষণে মূর্খতা প্রাপ্তি ঘটে।

১২২। দশমীতে কলমীশাক ভক্ষণ গোবধতুল্য।

১২৩। ত্রয়োদশীতে বেগুন ভক্ষণে সন্তানহানি ঘটে।

১২৪। চতুর্দশীতে মাসকলাই ভক্ষণে চিররোগ।

১২৫। দগ্ধ অন্ন ভোজন পাপ।

যাত্রা সম্পর্কিত

১। ডাইনে ফনী, বামে শিয়ালী,
দহিলে দহিলে বলে গোয়ালী
তবে জানিবে যাত্রা শুভালি।

যাত্রার সময় যদি ডানদিকে সাপ দেখা যায়, বাঁদিকে দেখা যায় শেয়াল অথবা গয়লাকে দই বিক্রী করতে দেখা যায়, তাহলে তা' শুভ।

২। ছাগলের কাননাড়া, গরুর কাশ
বিড়ালের হাঁচি করে সর্বনাশ।

যাত্রাকালে ছাগলের কাননাড়া দেখা, গরুর কাশি কিংবা বেড়ালের হাঁচি শোনার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। নতুবা যাত্রার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা।

৩। শঙ্খচিলের ঘটিবাটি
গোদাচিলের মুখে লাথি।

যাত্রাকালে শঙ্খচিল দেখা শুভ, কিন্তু গোদাচিল ঠিক তার বিপরীত, অর্থাৎ অশুভ।

৪। মঙ্গলের ঊষা, বুধে পা,
যথা ইচ্ছা তথা যা।

৫। যদি পায় রাজ্য দেশ
তবু না যায় বৃহস্পতির শেষ।

বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কোন শুভকাজ আরম্ভ করতে নেই, এমনকি যাত্রাও করতে নেই।

৬। হাঁচি টিকটিকির বাধা,
যেনা মানে সে গাধা।

যাত্রার সময় যদি কেউ হাঁচে, অথবা এই সময় যদি টিকটিকি ডাকে

তাহলে যাত্রা করতে নেই। এ'সবক্ষেত্রে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বেরোতে হয়।

৭। হাঁচি জিঠি যে জন বাছে,
বিঘ্নের সময় সে জন বাঁচে।

৮। শূন্য কলসী, শুকনা না, শুকনা ডালে ডাকে কা।
যদি দেখ মাকুন্দ ধোপা, এক পা না বাড়াও বাপা॥
এ সকলে পায়ে ঠেলি, যদিনা সমুখে দেখি তেলী।

যাত্রাকালে শূন্যকলস, ডাঙ্গায় নৌকা, শুষ্ক ডালে উপবিষ্ট কাকের ডাক (শোনা), শ্মশ্রুমুণ্ডিত ধোপা এবং তেলী দেখা অশুভ।

৯। রবি গুরু মঙ্গলের ঊষা,
আর সমস্ত ফাসাফুসা।

রবি, বৃহস্পতি আর মঙ্গলবারের ঊষাকালে যাত্রা শুভ।

১০। অগস্ত্য যাত্রা।

মাসের প্রথম দিনটি যাত্রার পক্ষে শুভ নয়। পুরাণে বর্ণিত হয়েছে ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে সূর্যের গতিরোধকারী বিন্ধ্যপর্বত গুরু অগস্ত্যের কাছে মাথা নত করলে অগস্ত্য বিন্ধ্যকে সেই অবস্থায় থাকতে বলে আর ফেরেননি। তাই মাসের প্রথম দিনটিতে যাত্রা করলে যাত্রাকারীর আর ফেরার সম্ভাবনা থাকেনা বলে বিশ্বাস।

১১। ঠিক বেরোবার মুখে যদি ধাক্কা লাগে বা কোন জিনিসে কাপড় বেঁধে যায় তখন কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে যাত্রা করতে হয়। নতুবা যাত্রা সফল হয় না।

১২। তিন ব্রাহ্মণের একসঙ্গে যাত্রা করতে নেই।

১৩। তিন বামুন এক শূদ্দুর, কোথা যাও নির্ব্বংশের পুত্তুর।

তিন ব্রাহ্মণ এবং এক শূদ্রের একসঙ্গে যাত্রা নিষেধ। যাত্রা করলে ফল অশুভ হয়।

১৪। মঘা, এড়াবি ক' ঘা।

অশ্লেষা মঘা নক্ষত্রে যাত্রা অশুভ বলে সংস্কার প্রচলিত।

১৫। ভরা হতে শূন্য ভাল যদি ভরতে যায়।
আগে হতে পিছে ভাল যদি ডাকে মায়।
মরা হতে তাজা ভাল যদি মরতে যায়।

বাঁয়ে হতে ডাইনে ভাল যদি ফিরে চায়।
বাঁধা হতে খোলা ভাল যদি মাথা তুলে চায়।
হাসা হতে কাঁদা ভাল যদি কাঁদে বাঁয়।

শুভযাত্রার নানা লক্ষণ। যেমন যাত্রাকালে ভরা কলসী অপেক্ষা শূন্য কলসী জলে ভরতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখাটা শুভ; মা যদি পেছন থেকে ডাকেন তাহলে সেটাও একটা শুভ লক্ষণ। মৃত ব্যক্তি অপেক্ষা যে ব্যক্তি গঙ্গাযাত্রা করেছে এমন ব্যক্তি দেখা শুভ; শৃগালকে ডানদিকে, বিশেষত ফিরে তাকানো অবস্থায় দেখা শুভ; বাঁধা অপেক্ষা ছাড়া গরু এবং সে গরু যদি মাথা তুলে তাকায়—এমনটি দেখতে পাওয়া যায় তাহলে শুভ; হাস্যরত অপেক্ষা ক্রন্দনরত কাউকে, বিশেষত বাঁ দিকে দেখতে পাওয়া শুভ।

১৬। শুকনো কাঠে রটে কাউ, ভাঙ্গি দাপুনি, দেখে লাউ।
যোগী আগু, ছুছু কলসী, তা দেখিলে না ঘরে আসি॥

শুষ্ক কাষ্ঠে উপবিষ্ট কাক, দর্পন, লাউয়ের অর্ধাংশ, শূন্য কলস ইত্যাদি যাত্রাকালে দেখা খারাপ।

১৭। বাঁ পা বাড়ালি সুখ কুড়ালি
ডান পা বাড়ালি দুঃখ পোয়ালি।

স্ত্রীলোকদের যাত্রার সময় বাঁ পা আগে ফেলতে হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে এর বিপরীতটাই শুভ, অর্থাৎ ডান পা আগে ফেলে যাত্রা করা বিধেয়।

১৮। শুভ কোন কাজে যাবার সময় ডিম, কলা খেয়ে অথবা দেখে বেরোতে নেই।

১৯। কোথাও যাত্রা করার সময় পূর্ণঘট দেখে বেরোলে যাত্রার উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

২০। পায়ের তলা চুলকালে বিশ্বাস বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

২১। খাওয়ার সময় থালা নড়লে তাও বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনাকেই বোঝায়।

২২। কোন শুভ কাজে বের হবার আগে দইয়ের ফোঁটা পরলে সেই শুভ কাজে সিদ্ধিলাভ ঘটে! তাই পরীক্ষা দিতে বেরোবার আগে কিংবা বিয়ের পাকাকথা বলতে বেরোবার আগে দইয়ের ফোঁটা পরলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে।

২৩। যাত্রার সময় মরা ব্যাঙ দেখা খারাপ, দেখলে যাত্রা ব্যর্থ হয়।

২৪। শেষ সূর্যাস্তের পর থেকে সন্ধ্যা প্রদীপ প্রজ্জলিত হওয়ার আগে পর্যন্ত যে সময় তাকে বলে 'কালসন্ধ্যা'। এই সময়ে যাত্রা নিষেধ।

২৫। গ্রহণের পর সাতদিন পর্যন্ত যাত্রা নাস্তি। এই সময়ে সর্বপ্রকার শুভকাজ করাও বারণ।

২৬। উঠান ঝাঁট না দেওয়া পর্যন্ত কোথাও যাওয়া নিষেধ।

২৭। বেরোবার সময় গরু হাঁচলে বেরোতে নেই। বেরোলে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে!

২৮। বেরোবার সময়ে এঁটো বাসন এবং ফাঁকা ঘটি না দেখাই ভাল।

২৯। তিনজনে একসঙ্গে বেরোতে নেই।

৩০। বেরোবার সময়ে খাবার জায়গায় এঁটো থালা ফেলে রাখতে নেই।

৩১। যাত্রার সময় কুঁচে, ঝাঁটা, ডিম, কাঁচকলা ও গাধা দেখলে যাত্রা শুভ হয় না।

৩২। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় কেউ যদি পেছন থেকে ডাকে তাহলে যাত্রা অশুভ হয়। এক্ষেত্রে খানিক অপেক্ষা করে তারপর যাত্রা করতে হয়। নইলে যে উদ্দেশ্যে বাড়ী থেকে বের হওয়া তা ব্যর্থ হয়।

৩৩। অযাত্রা নানা কারণে হয়। তন্মধ্যে একটি হ'ল হিজড়ে দেখা। সংস্কার, হিজড়ে দেখে যাত্রা করলে বা পথিমধ্যে এদের দেখা মিললে যাত্রা অশুভ হয়। অন্য মতে যাত্রাকালে 'হিজড়ে' নাম করতে নেই, কিন্তু তাদের দর্শন শুভ।

৩৪। যাত্রার সময় মাথায় আঘাত লাগলে যাত্রা শুভ হয়।

৩৫। মাকড়সা এবং গোসাপ দেখা যাত্রার পক্ষে অশুভ।

৩৬। যাত্রাকালে মাছ দেখলে বা যাত্রার সময়ে সঙ্গে করে মাছ নিয়ে গেলে তা যাত্রার পক্ষে শুভ হয়।

৩৭। যাত্রার সময় ভিখারী দেখে যাত্রা করলে যাত্রা ব্যর্থ হয়।

৩৮। পরীক্ষা বা ঐ ধরণের গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাত্রা করার সময় মাথায় সিদ্ধি ছড়িয়ে দিতে হয়। তাহলে যাত্রার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।

৩৯। ত্র্যহস্পর্শ যোগে যাত্রা নাস্তি। এই তিথিতে যাত্রা করলে কর্মে অসাফল্য ঘটে।

৪০। যাত্রাকালে কাঁকড়া দেখতে নেই বা কাঁকড়ার নাম উচ্চারণ করতে নেই।

যাত্রা ব্যর্থ হয়। কাঁকড়া জন্মক্ষণেই মাতৃহারা হয়। এইজন্য যাত্রাকালে কাঁকড়াকে বলা হয় 'দশরথ'।

৪১। যাত্রাকালে কচ্ছপের নাম করতে নেই, অমঙ্গলজনক। কচ্ছপের গতি মন্থর। কাজেই কোন কাজে বেরোবার আগে কচ্ছপ দেখলে সেই কাজ সত্বর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

৪২। মাছের জাল দেখে যাত্রা নাস্তি।

৪৩। 'হাঁচি জেঠি পড়ে যবে, অষ্টগুণ লভ্য হবে।' যাত্রাকালে হাঁচি বা গায়ে টিকটিকি পড়লে আটগুণ লাভ হয়।

বিবাদ সম্পর্কিত

১। সকালে ঘুম থেকে উঠে এক চোখ দেখতে বা দেখাতে নেই। এতে নাকি ঝগড়া হয়।

২। দু'কাঠি বাজাতে নেই। বাজালে ঝগড়া হয়। অন্যমতে এক কাঠি বাজাতে নেই বাজালে ঝগড়া হয়। তাই একটা কাঠি যে বাজায় তাকে দু'কাঠি বাজাতে বলা হয়।

৩। এক শালিখ দেখা নিষেধ। এর ফলেও ঝগড়া হয়। কিন্তু দু'শালিখ দেখা শুভ।

৪। নাকের নথ বাজাতে নেই, বাজালে ঝগড়া হয়।

৫। ঝগড়ারত দুই পক্ষের কাছে 'নারদ নারদ' বললে ঝগড়া বেড়ে যায়।

৬। নাক চুলকোলে তা কলহের সূচক বলে ধরা হয়।

৭। পাড়ায় বা বাড়ীর কাছাকাছি কিংবা বাড়িতে যদি ঝগড়া লাগে, তখন দুটো শিকেয় রাখা জিনিসের মধ্যে ঠোকাঠুকি করে দিলে ঝগড়া বেড়ে যায়।

৮। ঝাঁটা ও জুতো উল্টো করে রাখলে ঝগড়া হয়।

৯। দুটি ঝাঁটা একসঙ্গে রাখলে ঝগড়া হয়।

১০। পিঁড়ি উল্টো করে রাখলে সংসারে অশান্তি হয়।

১১। বিবাহে পাশাখেলার সময় যে মাটির পাত্রে ধান কিংবা পানের ওপর কড়ি রাখা হয়, সেই পাত্র সরা দিয়ে ঢাকার সময় শব্দ হলে নব-বিবাহিত

বর-কনেব দাম্পত্য জীবনে ঝগড়া-ঝাটির আর অন্ত থাকে না। তাই নিঃশব্দে সরা ঢাকতে হয়।

১২। কুকুরের মধ্যে ঝগড়া হলে যে এলাকায় ঝগড়া হয়, সেই এলাকার লোকেদের মধ্যেও ঝগড়া শুরু হয়।

১৩। দু'জনের মধ্যে ঝগড়া বাধলে ঐ দুজনের অজান্তে চালের মাথায় যদি ঝাঁটার কাঠি রেখে আসা যায়, তাহলে ঝগড়া বেড়ে যায়।

১৪। ঝাঁটা ও বাড়ন এক জায়গায় রাখলে ঝগড়া হয়।

১৫। গৃহের সামনে চটি জুতো উল্টিয়ে রাখলে ঝগড়া হয়।

১৬। দুটো মাটির কলসী একসঙ্গে থাকলে ঝগড়া হয়।

১৭। কোন নারীর মাথার কাপড়ের অংশ বিশেষ ছেঁড়া হলে বিবাদের সূচনা হয়।

অতিথির আগমন সম্পর্কিত

১। দুই পৃথক ব্যক্তির যদি একই সময়ে একই কথা মুখ থেকে বের হয়, তাহলে বাড়িতে অতিথি আসে।

২। হাত থেকে বাসন পড়লে বাড়িতে অতিথির সমাগম হয়।

৩। বাড়ির সংলগ্ন অংশে যদি দু'টি কাককে নিজেদের মধ্যে খাবার খেতে দেখা যায়, তাহলে বুঝতে হবে বাড়িতে অতিথি সমাগম ঘটবে।

৪। কোন শিশু যদি ঝাঁটা নিয়ে ঝাঁট দেয়, তাহলেও বাড়িতে অতিথি সমাগম ঘটে।

৫। খাবার সময় হাঁচি হলে বাড়িতে অতিথি আসে।

৬। হাত থেকে চিরুনী পড়ে গেলে অতিথি আসে।

৭। হলদে রঙের কুটুম পাখী ডাকলে বাড়িতে অতিথি আসে।

৮। হাত থেকে গ্লাস পড়ে গেলে বলা হয় বাড়িতে অতিথি আসবে।

৯। বাড়ি থেকে রওনা হবার মুখে হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে ধারণা করা হয় কোন অতিথি আসছে।

১০। বেড়াল যদি নিজের মাথায় পা তোলে ও পায়ের পাতা চাটে, তবে বাড়িতে অতিথি আসে।

১১। ঠেকাঠেকি পাখী ডাকলে অতিথি আসে।

১২। বেড়াল আঁচালে অতিথি আসে।

১৩। কাকেরা খাদ্য নিয়ে নিজেদের মধ্যে কাড়াকাড়ি করলে অতিথির আগমন সূচিত হয়।

১৪। বেড়াল মাটিতে মুখ ঘসলে অতিথি আসে।

১৫। শিশু উলঙ্গ হয়ে ঝাঁট দিলে অতিথি আসার সম্ভাবনা।

১৬। জোড়া শালিখ ডেকে গেলে অতিথি আসে।

নামকরণ সংক্রান্ত

১। মেয়েদের নাম সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ইত্যাদি রাখতে নেই। বিশ্বাস, এইসব নাম রাখলে তারা জীবনে সুখী হয় না। সীতা, সাবিত্রী কিংবা দময়ন্তীর জীবন দুঃখময় তার থেকেই এই বিশ্বাসের উৎপত্তি।

২। ছেলের নাম গৌতম, বুদ্ধ, সিদ্ধার্থ, গৌরাঙ্গ প্রভৃতি রাখতে নেই। বিশ্বাস, এর ফলে ছেলের গৃহত্যাগী হবার সম্ভাবনা থাকে।

৩। যে হতভাগ্য জননীর পুত্র-সন্তান বাঁচেনা, সেই রমণী দীর্ঘজীবী সন্তান লাভের জন্যে পুত্রের নামকরণ করেন এককড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি কিংবা সাতকড়ি। সচরাচর বিজোড় সংখ্যানুযায়ী নামকরণ করার রীতি। এক্ষেত্রে করণীয় প্রথাটি ছিল মৃতবৎসা জননী সন্তান প্রসবের পর ধাত্রী কিংবা অন্য কোন অনাত্মীয় বা দুঃসম্পর্কের মানুষের কাছে নির্দিষ্ট সংখ্যক কড়ির বিনিময়ে সন্তানকে বিক্রী করে দিতেন। তারপর ক্রয়কারীর পক্ষে নিজের সন্তানকে লালন-পালন করতেন।

৪। মৃতবৎসা জননী নবজাতককে দীর্ঘজীবী করতে ঘৃণাসূচক বা অনাদর-সূচক নাম দেন। যেমন হেগো, গুয়ে, পচা ইত্যাদি। এরফলে নবজাতককে মৃত্যু নাকি স্পর্শ করেনা।

৫। পর পর অনেকগুলি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করলে যাতে আর কন্যা জন্মগ্রহণ না করে সেজন্যে কন্যার কয়েকটি বিশেষ নামকরণ করা হয়। যেমন ইতি, ক্ষমা, ক্ষান্ত>খ্যান্ত, আরনাকালী>আন্নাকালী, চাইনা>চায়না ইত্যাদি।

৬। অন্নপ্রাশনে শিশুর যে নামকরণ হয়, সেই নামে ডাকতে নেই।

ঋণ সম্পর্কিত

১। মেঝেয় জলের দাগ কাটা নিষেধ। এতে বাবার ঋণ হয়।
২। মাটিতে লোহার কিছু দিয়ে দাগ কাটতে নেই। কাটলে ঋণ হয়।
৩। তরকারির খোসা কাটতে নেই, কাটলে ধার হয়।
৪। তরকারির খোসা বাড়িতে থেকে শুকালে ঋণ হয়।
৫। খেতে বসে পাতায় আঁকিবুকি কাটতে নেই, কাটলে দেনা হয়।
৬। ঘাটে গামছা রাখলে ঋণ হয়।
৭। কুকুরের গায়ে জল দিলে ঋণ হয়।
৮। ছুরি বা কাঠারি দিয়ে বাসগৃহের খুঁটি চাঁচতে নেই, চাঁচলে ঋণ হয়।
৯। এক পায়ে নাচলে ঋণ হয়।
১০। লক্ষ্মীর কড়ি নিয়ে খেললে ঋণ হয়।
১১। কড়ি বা টাকা নাচালে ঋণ হয়।
১২। দরজার মাথায় গামছা রাখলে ঋণ হয়।
১৩। ঝাঁটা-বাড়নের মুখ একদিকে রাখলে ঋণ হয়।
১৪। জলের ওপর লোহা দিয়ে দাগ কাটলে বাপের দেনা হয়।
১৫। পান খেয়ে কাপড়ে চুন লাগালে দেনা বাড়ে।
১৬। বাম হাত মাটিতে রেখে খেতে নেই, ঋণ হয়।
১৭। কুঁজোর থেকে ঢালা জল আবার কুঁজোয় ঢালতে নেই, দেনা হয়।
১৮। চাষের সরঞ্জাম ছাড়া অন্য কাজে ব্যবহার করা হয় এমন লোহা দিয়ে মাটি খুঁড়লে ঋণ হয়।

বিবিধ

১। ঘোড়া কাউকে লেজ দিয়ে মারলে সে শুকিয়ে যায়।
২। ঘোড়ার গা থেকে লোম কেটে নিলে ঘোড়ার শক্তি বেড়ে যায়।
৩। বাড়িতে বসন্ত রোগ হলে কোন আমিষ জাতীয় দ্রব্যের ঢোকা নিষেধ।
৪। সকালবেলায় ছড়া ঝাঁট এবং সন্ধ্যায় প্রদীপ দিলে গৃহে লক্ষ্মী অচলা থাকেন—

সকালবেলায় ছড়া ঝাঁট সন্ধ্যেকালে বাতি
লক্ষ্মী বলেন সেইখানেতে আমার বসতি ॥

৫। কোন দোকানদারই দিনের প্রথম বিক্রয় ধারে দেয় না। বিশ্বাস, এতে সারাদিনে ভাল রোজগার হয় না। নগদমূল্যেই তাই প্রথম বিক্রয় করা হয়ে থাকে।

৬। দিনের প্রথম বিক্রয় করাকে বলে বউনি করা। বউনির সময়ে কোনো দোকানদারই খুব বেশি দরাদরি করেনা। বউনি ভাল হলে সারাদিন ভাল বিক্রী হয় বলে বিশ্বাস।

৭। কোন বিষয়ে কথা বলার সময় যদি টিকটিকি ডাকে, তাহলে বিশ্বাস করা হয় যে কথাটা বলা হচ্ছে সেটা ঠিক।

৮। হাঁচি হলে 'জীব' বলতে হয়। একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—

'জীব' বলতে লোক নেই।

৯। কোন কথা তিনবার করে বললে তা সত্য বলে স্বীকৃত হয়। আবার তিন সত্যি করেও কোন কথা না রাখলে তা খুবই দোষের বলে বিশ্বাস।

১০। কাউকে কোন জিনিস দিয়ে আবার ফেরৎ নিতে নেই তাহলে কালী-ঘাটের কুকুর হয়।

১১। তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি জল চাইলে তাকে যদি জল না দেওয়া হয়, তাহলে পরজন্মে চাতক পাখী হয়ে জন্মাতে হয় বলে বিশ্বাস।

১২। 'নেই' বললে নাকি সাপের বিষ থাকে না। এই সম্পর্কিত প্রবাদটি হ'ল—

'নেই বললে সাপেরও বিষ থাকে না'।

১৩। শয়নের ব্যাপারে কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয়। প্রবাসে, নিজের গৃহে কিংবা শ্বশুরালয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে মাথা রেখে ঘুমাতে হয়—

প্রবাসে উত্তর শির, দক্ষিণ শির ঘরে।
শ্বশুরবাড়ী পূর্ব শির, শুয়োনা পশ্চিম শিরে ॥

১৪। স্ত্রী ভাগ্যে ঘটে ধনলাভ কিন্তু পুত্র সন্তান লাভের পেছনে থাকে পুরুষের ভাগ্য—

'স্ত্রী ভাগ্যে ধন, পুরুষ ভাগ্যে পুত্র'।

১৫। ক্ষৌরকর্মের জন্যে প্রশস্ত দিন হ'ল সোমবার আর বুধবার।

১৬। বন্ধ্যা রমণী প্রথম সন্তানটিকে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেবার মানত করলে

সন্তানলাভ করে—এই বিশ্বাস দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত ছিল। অসংখ্য শিশুকে এই কারণে গঙ্গাসাগরে বিসর্জন দেওয়া হয়েছে।

১৭। নববিবাহিতা বধূ প্রথম শ্বশুরালয়ে এলে উনুনে দুধ উথলে পড়ছে, কিংবা চালের জায়গা চালে পূর্ণ—এইসব দেখাতে হয়। তাহলে বিশ্বাস শ্বশুরালয়ে বাড়-বাড়ন্ত হয়।

১৮। খেতে বসে বিষম লাগলে বিশ্বাস করা হয় তার কেউ নাম করছে। তখন মাথায় ফুঁ দিতে হয়।

১৯। কারো হাই উঠলে বিশেষত শিশুর, তার মুখের সামনে তুড়ি দিতে হয়।

২০। দুর্গাপূজা অন্তে বিজয়া দশমীর দিন হলুদ গোলা জলে দর্পণ বিসর্জন করা হয়। প্রচলিত বিশ্বাস, এই হলুদ গোলা জলে যে সব মেয়ে হাত ডোবায়, তাদের রান্নার হাত খুব ভাল হয়।

২১। পাখার বাতাস করতে গিয়ে যদি কারো গায়ে পাখাখানা লাগে, তাহলে পাখাখানিকে তিনবার মেঝেয় ঠুকে নিতে হয়।

২২। দোকান বন্ধ করার পর রাত্রে একটি কাগজে আগুন জেলে বন্ধ দোকানের সামনে সেই জ্বলন্ত আগুন নিয়ে আরতি করতে হয়।

২৩। আকাশে বাজ পড়ার শব্দ শোনা গেলে, বিশেষত খুব জোরে, তাহলে শাঁখ বাজাতে হয়।

২৪। গরু চুরি করা মহাপাপ। লোক-বিশ্বাস এই যে গরু চোরের মৃত্যু অনিবার্য।

—গোঁসাই দণ্ডবৎ, গরু চুরি করলে পরে দক্ষিণমুখী পথ।

যমকে দক্ষিণদিকের অধিপতি বলে বলা হয়েছে। সেইজন্যে দক্ষিণমুখী বলতে মৃত্যু পথের ইঙ্গিত করা হয়েছে।

২৫। ঘুনসির তুলনায় তাবিজের শক্তি অধিকতর বলে বলা হয়ে থাকে—

'ঘুন্‌সিতে কি করে, মুদোয় প্রাণ হারে।'

২৬। লক্ষ্মীছাড়ার একটি লক্ষণ হ'ল—

'দক্ষিণে তাল উত্তরে বেল, লক্ষ্মী ছাড়িয়া গেল'।

অর্থাৎ গৃহের দক্ষিণে এবং উত্তরে যথাক্রমে তালগাছ ও বেলগাছ বসাতে নেই।

২৭। তিনজন ব্রাহ্মণের সঙ্গে যদি একজন শূদ্র থাকে, তবে স্বয়ং রুদ্রও ভয় পান—

'তিন বামুন এক শূদ্দুর, তাকে দেখে ডরান রুদ্দুর।'

২৮। 'তিন মঙ্গলে বৃহস্পতি'।

২৯। বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের অভিশাপ অক্ষরে অক্ষরে ফলে বলে লোক-বিশ্বাস প্রচলিত; আবার এও দেখা যায়, সমাজে যাদের স্থান অনেক নীচে, সেই হাড়িনী যদি দুঃখ বা আঘাত পেয়ে অভিসম্পাৎ করে সেক্ষেত্রে সেই অভিসম্পাৎ ব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেও কার্যকরী হয়—

দুঃখ পাইয়া যদি হাড়িনীও শাপে।
এড়াতে পারেনা তারে বামুনের বাপে॥

৩০। চৈত্র সংক্রান্তিতে যারা পুত্র সন্তানের জননী তাদের সারাদিন উপবাস করে থাকতে হয়। তারপর সন্ধ্যেবেলা নীলের পূজা দিয়ে নীলের ঘরে বাতি দিয়ে তবে উপবাস ভঙ্গ করতে হয়—

নীলের ঘরে দিয়ে বাতি
জলখেয়োগো পুত্রবতী।

৩১। পৌষ সংক্রান্তির আগের দিন ভোরবেলা সব বয়সীর ছেলেরা স্নান সেরে অভুক্ত অবস্থায় ডান হাতে খইয়ের ছাতু এবং বামহাতে বাসি ছাই দিয়ে রাস্তার তিন মাথার মোড়ে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে ছাতু ও ছাই ছোঁড়ে আর মুখে বলে—

'শত্রুকে দিলাম ছাই, মিত্রকে দিলাম ছাতু।,

এর ফলে শত্রুর সংখ্যা হ্রাস পায় এবং শত্রু মিত্রে পরিণত হয়।

৩২। পেটে তিল থাকলে পেটুক হয়, গলায় তিল থাকলে গাইয়ে হয় আর হাতে তিল থাকলে ভাল রাঁধুনি হয়।

৩৩। স্নানের সময় মাথায় তেল মাখার আগে মাটিতে তিনবার তেলের ছিটে দিতে হয়, এতে অশ্বথামা আশীর্বাদ করেন।

৩৪। হাতের আঙ্গুলগুলি কারো যদি ঘন সন্নিবিষ্ট হয়, এতটুকু ফাঁক না থাকে, যার ফলে হাতে জল রাখলে তা সহজে পড়েনা, এমন ব্যক্তি খুব কৃপণ হয় বলে বিশ্বাস।

৩৫। দুগ্ধপোষ্য যে শিশুর অন্নপ্রাশন হয়নি, তার ব্যবহৃত কাঁথা ও অন্যান্য জামা কাপড় সন্ধ্যার আগেই তুলে ফেলতে হয়।

৩৬। যে শিল এবং নোড়া পাড়ে বা বাটনা বাটে, তাকেই শিল নোড়া তুলে রাখতে হয়। নইলে স্বামী পাগল হয়।

৩৭। চৌকাঠে পা লেগে গেলে প্রণাম করতে হয়।

৩৮। নিজের লোকের সম্পর্কে খারাপ স্বপ্ন দেখলে সেই স্বপ্ন বাইরের লোকের ক্ষেত্রে ফলবতী হয়। বিপরীতক্রমে স্বপ্নে বাইরের লোকের খারাপ কিছু দেখলে তা নিজের লোকের ক্ষেত্রে ফলবতী হয়।

৩৯। সকালে উঠে বাসিমুখে মিথ্যাকথা বলা অত্যন্ত খারাপ। মুখ না ধুয়ে সেই অবস্থায় মিথ্যা কথা বললে মুখ পচে যায় বলে বিশ্বাস। এমনকি এর ফলে জিভ খসে পড়তে পারে, দাঁতেও পোকা লাগে।

৪০। একহাতের শাঁখা ভাঙ্গলে স্বামীকে দিয়ে অন্যহাতের শাঁখা খুলিয়ে নিতে হয়।

৪১। এমনিতে খাবার সময় জল ডান দিকে দিতে হয়, কিন্তু শ্রাদ্ধের সময় জল দিতে হয় বাঁ দিকে।

৪২। আঙ্গোটপাতা বাঁদিকে পেতে খেতে দিতে হয়, কিন্তু শ্রাদ্ধের সময় আঙ্গোটপাতা পাতা হয় ডানদিকে।

৪৩। কোন ব্যক্তি যেস্থানে মারা যায়, সেই জায়গায় একটা পেরেক পুঁতে রাখতে হয়।

৪৪। কারো হাত থেকে পড়ে আয়না ভেঙ্গে গেলে যার হাত থেকে আয়না পড়েছে তার বারো বছর দুঃখে কাটে।

৪৫। শিশু জন্মগ্রহণের পর ছ'দিনের দিন আঁতুড় ঘরে শিশুর মাথার কাছে সন্দেশ, জল, তালপাতা আর দোয়াত-কলম রেখে দিতে হয়। বিশ্বাস এই যে বিধাতা পুরুষ এইদিন এসে নবজাতকের ভাগ্যরেখা প্রস্তুত করে দেন।

৪৬। পায়খানা বা প্রস্রাব করার পর থুথু ফেলতে হয়।

৪৭। ব্রাহ্মণেরা প্রস্রাব বা পায়খানা করার সময় কানে পৈতা জড়ায়।

৪৮। শবদাহ করার পর বাড়ীতে ঢোকার আগে খড় জেলে আগুনের ভাপ নিতে হয় প্রথমে। তারপর নিমপাতা এবং মিষ্টি জল খেয়ে তবেই ঘরে ঢোকার রীতি।

৪৯। যে শিশু খুব খাই খাই করে তার অল্প সময়ের ব্যবধানে অসুখ হয় বলে লোক-বিশ্বাস।

৫০। ভাগ্নে দেবতার অংশ, তাই মামা ভাগ্নের প্রণাম নেন না।

৫১। মেয়ে বাপের কোলে বসলে চালের দাম বাড়ে।

৫২। নদী, পুকুর, খাল বিল বা জল সংক্রান্ত কোন স্বপ্ন দেখলে সর্দি হয়।

৫৩। হাত থেকে কারো তেল পড়ে গেলে তাকে তিরস্কার করতে নেই। বরং যেখানে তেল পড়ে, সেখানে একটু জল দিতে হয়। এক্ষেত্রে বিশ্বাস, পৃথিবী স্নান করতে ইচ্ছুক তাই তেল পড়েছে।

৫৪। প্রতিমা দক্ষিণমুখী করে বসাতে হয়।

৫৫। শ্রাদ্ধের সময় প্রদীপ দক্ষিণমুখে বসাতে হয়।

৫৬। কথায় বলে 'কানা খোঁড়া তিন গুণ বাড়া'। অর্থাৎ দৈহিক দিক দিয়ে যার ত্রুটি থাকে সেই ধরণের মানুষ থেকে সাবধানে থাকতে হয়। বিশ্বাস, এরা মানুষ হিসাবে ভাল হয় না।

৫৭। স্নান করার পর ভাত খেতে হয়, তার বদলে যে ব্যক্তি খাওয়াদাওয়ার পর স্নান করে, তার ক্ষতি হয়।

'খেয়ে দেয়ে নায়, পরের ভাল চায়'।

৫৮। খড়কে দিয়ে দাঁত খোঁচাবার আগে খড়কের ডগাটা একটু ভেঙ্গে ফেলতে হয়। এই ডগা রাবণের চিতা জ্বলতে সহায়তা করে। রাবণের চিতার অগ্নি প্রজ্বলিত থাকলে মন্দোদরীর বৈধব্য দশা শুরু হতে পারে না।

৫৯। বলি দিতে হয় এক কোপে।

৬০। কাঁকড়া উঁচু জায়গায় উঠলে বন্যা হয়।

৬১। চুন কেউ চুরি করেনা। তাই বাড়ীর বাইরে রাখা ইঁটের পাঁজায় চুন ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে কেউ ইঁট নিয়ে যেতে পারেনা।

৬২। কার্তিক মাসের অমাবস্যা রাত্রে কুলো লাঠি দিয়ে পেটালে মশা চলে যায়।

৬৩। শুধু ভিক্ষা চাইলে ভিখারীকে ভিক্ষা দিতে নেই। কোন না কোন ঠাকুর দেবতার নাম করলে তবেই ভিক্ষে দেওয়া হয়।

৬৪। আঁতুড় ঘরের দরজায় লোহার নেউলা ছুঁইয়ে রাখতে হয়।

৬৫। গরুর বাছুর হবার পর গরুর শিঙে লোহা বেঁধে দিতে হয়।

৬৬। বাছুর যাতে খুব খাইকুটে না হয়, সেজন্যে তার চারটে পায়ের খুর থেকে একটু একটু অংশ কেটে নিয়ে পাঁচটা দূর্বা তুলে বাছুরের গায়ে বুলিয়ে তিনবার বলতে হয়—

হট হট হট, আমার গ্রামে ঘাস নাই
মুখ কর খাট।

৬৭। আকন্দ কাঠের পেরেক শত্রুর পুকুরে দিতে পারলে ঐ পুকুরের সব মাছ নষ্ট হয়ে যায়।

৬৮। কারো হাতে নুন দেবার সময় বলতে হয় 'অমৃত' দিলুম।

৬৯। আকাশে একতারা দেখার পর প্রথম যার মুখ দেখা যায় তার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

৭০। শনিবার কোন মূর্তি গড়ে পূজা করলে পয়সা হয়।

৭১। প্রদীপের গর্ভ সলতে পুড়ে যেতে নেই।

৭২। যে গরুর দুধ ফুটে উনানে পড়ে যায়, সেই গরুর দুধ কমে যায়।

৭৩। সধবাদের দু'বার করে আলতা পরতে হয়।

৭৪। জলশুদ্ধ ঘড়া বা ঘটি হাত থেকে পড়ে গেলে পরিচিত জনের ছেলে হয়।

৭৫। মেয়ের শ্বশুর বা শাশুড়ী কেউ মারা গেলে তার বাপের বাড়ী থেকে মেয়ে-জামাই ও সন্তানাদির জন্যে নতুন কাপড় কিনে দিতে হয়। ঘাটে কাপড় পরতে হয়।

৭৬। চাঁদের দিকে চেয়ে জলপান করলে স্বাস্থ্য ভাল হয়।

৭৭। কার্তিক মাসের ভূত-চতুর্দশী তিথিতে চোদ্দশাক তোলার সময় বলতে হয় 'চোদ্দশাকের মধ্যে ওল পরামানিক'।

৭৮। কোজাগরী লক্ষ্মী পূজার দিন রাত্রি জাগরণ করলে মা লক্ষ্মীর কৃপালাভ ঘটে, বিপরীতক্রমে নিদ্রা গেলে লক্ষ্মী বিরূপা হন।

৭৯। এক সন্তানের পর ঋতুতে গর্ভিত 'একমুড়া' সন্তান পরিবারের কোন বৃদ্ধ ব্যক্তির মৃত্যুর কারণ হয়।

৮০। মাঘ মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী বা 'রটন্তী চতুর্দশী'তে পুত্রবতী স্নান করলে পুত্রের কল্যাণ হয়।

৮১। ঋতুমতী হওয়ার পর চার দিনের দিন স্নান করে মুখে কিছু মিষ্টি দিয়ে সিঁদুর পরে তারপর সন্তানদের ছুঁতে হয়। তা নাহলে সন্তানের অমঙ্গল হয়।

৮২। চোরেরা চুরি করে যাবার সময় পায়খানা করে দিয়ে যায়।

৮৩। শাড়ীর আঁচল কেউ কেটে দিলে স্বামী-বিচ্ছেদ ঘটে।

৮৪। স্থির জলে কিংবা বদ্ধ নীচু জায়গায়, চাতালে বা পথে নিজের মুখ

আচমকা দেখার অর্থ ভবিষ্যৎ কর্মধারার ইঙ্গিত বহন।

৮৫। যে স্ত্রীলোকের সন্তান হয়ে কেউ মারা যায়নি তার কোমরে যদি কারো লাথি লাগে, তখন যার লাথি লাগে তাকে স্ত্রীলোকের কোমরে চিমটি কেটে বলতে হয় জিঁয়চ।

৮৬। অকারণে দীর্ঘশ্বাস ফেললে রোগকে ডেকে আনা হয়।

৮৭। অপরের গায়ে থুথু ফেলার অর্থ নিজের রোগ ডেকে আনা।

৮৮। মুখের থেকে পড়ে যাওয়া ভাত পিষ্ট করলে শত্রু নাকি শক্তিহীন হয়।

৮৯। পানের ডগা না ছিঁড়ে খাওয়ার অর্থ লক্ষ্মীকে হারান।

৯০। স্নানের সময় কলসী উপুড় করে মাথায় জল ঢালা মানে আত্মীয় বিয়োগ আসন্ন।

৯১। রাত্রিবেলা ঘরের মধ্যে শিস্ দিলে ঘরে সাপ আসে।

৯২। চালধোয়া জল পায়ে লাগলে অন্নকষ্ট হয়।

৯৩। চাল ঝাড়ার সময় কুলোর বাতাস গায়ে লাগার অর্থ আয়ুঃক্ষয়।

৯৪। একই সঙ্গে দু'ব্যক্তির একই কথা উচ্চারণ করা মানে বাড়ীতে চিঠি আসা।

৯৫। মৃতদেহ নিয়ে যেতে দেখলে নমস্কার করতে হয় এবং মুখে বলতে হয় 'শিব শিব'।

৯৬। সধবা রমণীকে নখ কেটে আলতা ছোঁয়াতে হয়।

৯৭। মৃত্যু দোষ কাটাতে হয়। তিন পো দোষ বাড়ীতে কাটান চলে না। গঙ্গার ঘাটে বা পুকুরের ধারে কাটাতে হয়। এই দোষ না কাটালে গৃহস্থের যেমন অমঙ্গল হয়, তেমনি মৃত ব্যক্তির আত্মাও অতৃপ্তিতে থাকে।

৯৮। রাত্রিবেলা পাতের এঁটো কাঁটা ফেলার আগে বলে নিতে হয় —কে কোথায় আছ সরে যাও। নইলে অবাঞ্ছিত আত্মারা ভর করে।

৯৯। মেয়েদের মাথা আঁচড়াবার সময় চুল ওঠে, সেগুলি ফেলার সময় থুথু দিয়ে ফেলতে হয়।

১০০। লোক-বিশ্বাস এই যে বিপদ কখনও একা আসেনা। অর্থাৎ বিপদাপন্ন ব্যক্তিকে পরপর অনেকগুলি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়।

'একে ধরে যারে, দশে বেড়ে তারে'।

১০১। একা কোন কাজে ব্রতী হলে নানাবিধ বাধার সম্মুখীন হতে হয়। তাই

অন্তত, দু'জনে মিলে কাজে ব্রতী হতে হয়। তিনজন থাকলে কার্যসিদ্ধি অনিবার্য হয়ে ওঠে।

একে বাধা, দুয়ে বিধি, তিনে হয় কার্য সিদ্ধি।

১০২। খেতে বসে জিভ কামড়ালে বলা হয় কেউ গালাগাল দিচ্ছে।

১০৩। মামার বাড়ীর ভাত খেলে আয়ুঃ বাড়ে।

১০৪। কারো জুতো উল্টো থাকলে বলা হয় সে আজ মারা যাবে।

১০৫। গঙ্গাসাগরে গরুর লেজ ধরে গঙ্গা পারাপার করলে বলা হয় বৈতরণী পার হয়ে পুণ্যার্জন হ'ল।

১০৬। গঙ্গায় স্নান করলে সব পাপ দূর হয়ে যায়।

১০৭। জেলেরা যখন নদীতে মাছ ধরে তখন যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, কি মাছ হচ্ছে? তাহলে এটাকে বলে টুকে দেওয়া। বিশ্বাস, এর ফলে মাছ আর নাও পড়তে পারে।

১০৮। গরুর বাচ্চা হলে তার গলায় কালো চুল বেঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। দুধ বেশী হয় তাহলে।

১০৯। জামা কাপড় ডান দিক দিয়ে পরতে হয়।

১১০। ঘুমের সময় বাম হাত নীচে রেখে ঘুমান ভাল।

১১১। গরুর বাচ্চা হলে তার গলায় আধখানা নারকেল মালা ফুটো করে নারকেল দড়ি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে দিতে হয়। এতে গরুর ভাল হয়, বাছুরও ভাল থাকে।

১১২। কোন কাজ আরম্ভ করলে ডান হাত দিয়ে তা আরম্ভ করতে হয়।

১১৩। রাতের বেলা দু'জনের একসঙ্গে জোড়া কথা হলে বাড়ীতে চোর আসে।

১১৪। বাচ্চা ছেলের বিছানা সরাবার সময় বলতে হয় সেজ নড়ে পরমায়ু বাড়ে।

১১৫। হুগলী জেলার 'বেলমুড়ি' জায়গার নাম কেউ করেনা, বলে 'রাজার হাট'।

১১৬। ইলিশ মাছ ধরার সময় জেলেকে পাড় থেকে ইলিশমাছ আছে কিনা জিজ্ঞাসা না করে বলতে হয় 'আছে না কি'।

১১৭। পুকুর থেকে ভেসে ওঠা থালা প্রয়োজনে ব্যবহারের পর পুকুরে ভাসিয়ে না দিলে মৃত্যু ঘটে।

১১৮। অপ্রত্যাশিত ভাবে টাকা পাওয়া গেলে হরির লুঠ দিতে হয়, নইলে মৃত্যু ঘটার সম্ভাবনা।

১১৯। যার নামে ঘড়ায় টাকা সঞ্চিত, সে ছাড়া অন্য কেউ তা ভোগ করলে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা।

১২০। কাজের বাড়ী প্রথম রান্না পায়েস কিংবা চাটনী রাঁধতে হয়।

১২১। রাত্রি বেলায় পেঁচার নাম করলে খেতে পায় না।

১২২। ছেলে শুয়ে থাকলে থুতু দিতে হয়।

১২৩। মাছ রাখবার জায়গাতে (খালুইতে) থুতু দিলে মাছ বেশী পড়ে।

১২৪। মাছ ধরবার ছিপ ডিজোলে আর মাছ পড়ে না।

১২৫। একচোখে কাজল পরালে ছেলের অসুখ হয়।

১২৬। গোসাপের ছাল ডিঙ্গিয়ে পার হলে পরের জন্মে গোসাপ হবার সম্ভাবনা থাকে।

১২৭। বিবাহিত মেয়েদের আলতা পরলে শাঁখা এবং নোওয়াতেও আলতা লাগাতে হয়।

১২৮। মাটিতে ঠুকে কোন কিছু ভাঙ্গলে শিবের মাথায় লাগে।

১২৯। নতুন কাপড় পরার আগে ধোপা-নাপিতকে কিছু দিয়ে পরতে হয়।

১৩০। পুরুষের রাগ লক্ষ্মী, মেয়েদের রাগ অলক্ষ্মী।

১৩১। মেয়ের জন্মবারে নতুন উনানে আগুন দিলে মেয়ের কষ্ট হয়।

১৩২। তেমাথায় মৃতদেহ নামাতে হয়।

১৩৩। নবজাতককে মাথায় তেল দিয়ে তবে ঘরে গ্রহণ করতে হয়, নইলে ইঁদুর হয় বলে বিশ্বাস প্রচলিত।

১৩৪। বিছানায় ছেঁড়া চুল থাকলে কুস্বপ্ন দেখতে হয়।

১৩৫। শিশু ঘুমের ঘোরে হাসলে মনে করা হয় মা ষষ্ঠী তাকে বলেছেন যে তার মা মারা গেছে, শিশু সে কথা বিশ্বাস না করে হাসছে। আবার কাঁদলে মনে করা হয় শিশুকে মা ষষ্ঠী বলেছেন যে তার বাবা মারা গেছে। শিশু তাই বিশ্বাস করে কাঁদে। আবার শিশু মাঝে মাঝে চোখ মেলে উপরের দিকে তাকায় যখন মা ষষ্ঠী তাকে বলেন যে আগুন লেগেছে।

১৩৬। তেল মেখে খালি গায়ে চলাফেরা করতে নেই, করলে ক্ষতি হয়। তবে তেল মাখার পর বুকে একটু জল নিয়ে বার হলে আর কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

১৩৭। কোলে চেপে থাকা শিশুর ঝুলন্ত পা যদি নিকটস্থ দণ্ডায়মান কোন ছেলে-

মেয়ের মাথায় ঠেকে, তাহলে কোলে থাকা শিশুটিকে কিছুক্ষণের জন্যে মাটিতে নামিয়ে দিতে হয়।

১৩৮। শিশু হাঁচলে বলতে হয়—'জীইও মা ষষ্ঠীর পদে থাইও'।

১৩৯। মকর সংক্রান্তির আগের দিন বাড়ীতে পিঠে তৈরী করতে হয়। এই দিনের নাম বাঁউড়ী। বাঁউড়ী-রাতে ঘুমোবার আগে পায়ের তলায় তেল মেখে শুতে হয়। ঘুমন্ত শিশুদের পায়ের তলাতেও তেল মাখিয়ে দেওয়া হয়। বিশ্বাস, তা না হলে প্রেতাত্মা এসে পা চাটে।

১৪০। টিকটিকি হত্যা করলে সোনার টিকটিকি গড়িয়ে ব্রাহ্মণকে দান করতে হয়।

১৪১। গর্ভপুষ্পের মধ্যে যতগুলি গেরো থাকে ততগুলি সন্তান হয় বলে বিশ্বাস।

১৪২। বামন পৈতা নিয়ে জন্মগ্রহণকারী শিশু খুব আহ্লাদে হয়।—এই ধরণের শিশুকে প্রহার করতে নেই।

১৪৩। পাটের ওপর বসে চুল কাটলে শিশুর চুল বড় হয়।

১৪৪। স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিকে বা শিশুকে স্বাস্থ্যবান বললে তার অভিভাবকেরা সেটা ক্ষতিকারক বলে মনে করে থাকেন।

১৪৫। গরুর বাঁট ফেটে গেলে (নজর লাগলে হয়) ঘরের তে-কোনার ছন (উলু) কিছুটা সংগ্রহ করে তে-মাথায় পুড়িয়ে ফেললে গরুর বাঁট ভাল হয়ে যায়।

১৪৬। পেঁচা ঘরে ঢুকে পড়লে নারায়ণ পূজা করতেই হয়।

১৪৭। বিয়ের সময় ছাদনাতলায় লাগান কোন কলাগাছ ভেঙ্গে গেলে দম্পতির খুব অমঙ্গল হয়।

১৪৮। জল আনতে গিয়ে জল না পেলে শূন্য কলসী ঘরে ঢোকানো নিষিদ্ধ। এক্ষেত্রে শূন্য কলসী ঘরের বাইরে রাখতে হবে—জল না ভরে কলসী কিছুতেই ঘরে ঢোকানো চলবে না।

১৪৯। সমাধি নির্মাণের জন্য যারা দেহ নিজ গৃহে দাহ করে, তারা মৃতদেহের চারপাশে কলসী ও কুলো দেয়। কুলোর মধ্যাংশ ছিদ্র করে তার মধ্যে কলসীর ঘাড় ঢোকানো হয় এবং তা উত্তরমুখী করে বসান হয়। যেহেতু উত্তরদিকে হ'ল হিমালয়, দেবতাদের আবাসস্থলের প্রতীক।

১৫০। দরজার ঠিক মাঝখানে যাকে 'তুল দু'য়ার' বলে, সেখানে বিবাহিত নারী বসে না।

১৫১। কাঁধে রাখা ছাতা খেলাচ্ছলেও ঘোরাতে নেই, ঘোরালে মামার মাথা ঘোরে বলে বিশ্বাস।

১৫২। গর্ভাবস্থায় হাতে মেহেদি দিলে শিশুর গায়ে তা জড়ুল হয়ে আত্মপ্রকাশ করে।

১৫৩। সন্তান প্রসবের সময় প্রসূতির বিছানা এমন স্থানে করা চাই, যে স্থান দু'দিকের চালের জোড়ায় না থাকে।

১৫৪। গর্ভিণী রমণী ছিটকির গাছ ছুঁলে তার নীলবর্ণের পায়খানা হয় বলে বিশ্বাস।

১৫৫। গর্ভবতী রমণী নিজের স্তন চুলকালে গর্ভস্থ সন্তানের অসুখ হয়।

১৫৬। প্রসবাগারের সামনে ছেঁড়া জুতো, মুড়ো ঝাঁটা ঝুলিয়ে রাখতে হয়।

১৫৭। আঁতুড় ঘরের শিশুকে বাড়ীর রান্নাঘরে নিয়ে যেতে নেই, কারণ নিয়ে গেলে ইঁদুরের উৎপাত হয় বাড়ীতে।

১৫৮। সন্তান জন্মগ্রহণের পর গর্ভপুষ্প খুব সাবধানে অপসারিত করা হয়। বিশ্বাস, প্রসূতি অথবা নবজাতকের যদি গর্ভপুষ্প স্পর্শ হয় অথবা এদের যদি গর্ভপুষ্পের বাতাস লাগে তাহলে উভয়েই শুকিয়ে যাবে এবং কদাকার হবে।

১৫৯। শনি এবং মঙ্গলবারে হাল চাষের দড়ি ছিঁড়ে গেলে সেই দড়ি ফেলতে নেই, ফেললে তা অপদেবতায় পরিণত হয়।

১৬০। সন্তান জন্মগ্রহণের পর গর্ভপুষ্প গড়ার অব্যবহিত পরেই যদি তা উল্টিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে আর সন্তান হয় না।

১৬১। চামচিকে স্পর্শ করলে ক্ষয়রোগের সম্ভাবনা।

১৬২। ভাদ্রমাসে প্রসব করেছে এমন গরুর দুধ দেবপূজার কাজে লাগে না।

১৬৩। ঘর থেকে মন্দিরে মঙ্গল প্রদীপ নিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ যদি বাতাস উঠে প্রদীপ নিতে যাবার উপক্রম হয় তাহলে 'শিব শিব শিব' বলতে হয়।

১৬৪। মড়া পুড়িয়ে এসে শ্মশান বন্ধুদের মৃতের বাড়ীতে অবশ্যই নিম-ভাত খেতে হয়।

১৬৫। যে গাছের ডালে মানুষ উদ্বন্ধনে মৃত্যু বরণ করে, সেই গাছকে বা গাছের

ডালকে কেটে ফেলতে হয়।

১৬৬। নতুন কুটুম্ব বা আত্মীয় এলে গুড় এবং জল দিয়ে প্রথমে আপ্যায়ন করতে হয়।

১৬৭। মেয়েকে কাজল পরাবার সময় তার বাঁ হাতের চেটোয় এবং কব্জির সন্ধি-স্থলে কাজলের ফোঁটা কেটে দিতে হয়।

১৬৮। বাইরে যাওয়ার সময় চৌকাঠে বাঁ পা তিনবার ঠুকে বেরোতে হয়।

১৬৯। পা তুলে এক খাটে চারজনের বসতে নেই। বিশেষত বসে যদি কেউ হেঁচে ফেলে অমঙ্গল হয়। তাহলে সেক্ষেত্রে অপর কাউকে এক ঘটি জল নিয়ে এসে সেই জল ডান হাতের অঞ্জলিতে নিয়ে খাটের চারটে খুরায় অল্প করে ছুঁইয়ে দিতে হয়। এর পর খাটে উপবিষ্ট যারা তাদের মাথাতে অল্প করে জল ঠেঁকিয়ে দিতে হয়। সবশেষে চার জনের একজনকে ভূমিতে পা ঠেঁকিয়ে বসতে হয়। এতে দোষ কেটে যায়।

১৭০। দিবাকালে সঙ্গম করলে গর্ভজাত সন্তান চোর হয়।

১৭১। ঋতুব্যবহৃত বস্ত্রখণ্ড অগ্নিদগ্ধ করলে সেই রমণী সূতিকা বা যৌন রোগগ্রস্ত হয়।

১৭২। বেড়ালের মত কটা চোখের অধিকারিণী নারী অত্যন্ত কলহপরায়ণা ও সন্দিগ্ধ চরিত্রের হয়।

১৭৩। যাত্রাপথে জলন্ত চিতা দর্শনে কার্যসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

১৭৪। অন্ধকারে দুগ্ধ পানে কুষ্টরোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

১৭৫। বেগুন কেটে সঙ্গে সঙ্গে জলে না ডোবালে স্বামীর পুংক্ষমতা লোপ পায়।

১৭৬। অনুষ্ঠান বা শুভকাজে হস্তীর আগমন শুভ।

১৭৭। শিশুসন্তানের বমি হলে ময়ূরের পেখম বেঁধে দিলে উপশম হয়।

১৭৮। নারীর মুখে পানের রঙ ফিকে হলে সেই নারী স্বামী সোহাগ থেকে বঞ্চিত হয়।

১৭৯। কাকের বিষ্ঠা মাথায় পড়লে অসুস্থ হবার সম্ভাবনা। এক্ষেত্রে মামার বাড়ীর ভাত খেয়ে দোষ স্খালন করতে হয়।

১৮০। জোড়া গাধা দেখলে কার্যসিদ্ধি সুনিশ্চিত।

১৮১। বয়স্ক বা বয়স্কদের জোড়া ধুতি বা শাড়ী প্রণামী স্বরূপ দেওয়া আয়ু বৃদ্ধির লক্ষণ।

১৮২। গৃহস্থ বাড়ীর চালে প্রচুর পরিমাণে লাউএর ফলন কারো মৃত্যু সংবাদ বহন করে আনে।

১৮৩। সিঁদুর পরাকালীন এয়োতি রমণীর নাকে সিঁদুর চূর্ণ পড়লে স্বামী সোহাগিনী হয়।

১৮৪। পুরুষের বক্ষে লোমগুচ্ছ দয়াবান, মমতাবান এবং স্নেহপ্রবণতার প্রতীক, অন্যপক্ষে লোমহীন বক্ষ নির্দয়তা ও নির্মমতার প্রতীক।

১৮৫। মেঝেতে বা দেওয়ালে কয়লার আঁচড় কাটলে মাতৃ বা পিতৃ বিয়োগ ঘটে।

১৮৬। প্রত্যুষে কাকের ক্রমাগত ডাক বাইরে থেকে কারো আগমনকে স্থচিত করে।

১৮৭। স্ত্রীলোকের ঝাঁটা দিয়ে বেড়াল প্রহার তার সন্তানের মৃত্যু কামনাকে স্থচনা করে।

১৮৮। বেড়ালের হাসি দেখলে কলহ, বাধা বা অনিষ্ট অনিবার্য।

১৮৯। শনি-মঙ্গলবারে রাস্তায় আড়াআড়ি দড়ি ডিঙ্গোলে অসুস্থতা অনিবার্য।

১৯০। জ্যৈষ্ঠ মাসে নারীরা লাউডগা শাক ভক্ষণের অর্থ জ্যেষ্ঠ সন্তানের মস্তক ভক্ষণ।

১৯১। পরীক্ষা দেওয়াকালীন হাতের আঙ্গুলে কালি মাখামাখি হলে সাফল্য নিশ্চিত।

১৯২। গৃহস্থের প্রথম ছেলেমেয়েকে কোন খাদ্য দ্রব্যের প্রথম অংশ খেতে দেওয়া হয় না। বিশ্বাস, খেতে দিলে তার অকালমৃত্যু ঘটে।

১৯৩। যে সব মহিলার সন্তান হয়ে বাঁচেনা, তাদের সন্তান অন্যের কাছে বিক্রয় করে দিতে হয়। এক্ষেত্রে ঘরের বেড়া ভেঙ্গে ফেলে সদ্যোজাত শিশুকে সেখান দিয়ে বিক্রয় করতে হয়। বিশ্বাস এই যে এর ফলে সন্তান আর মরে না। অবশ্য বিক্রীত শিশুকে পরে ফেরৎ আনা হয় ক্রয়কারীর প্রদত্ত অর্থ প্রত্যর্পণ করে।

১৯৪। মহাপ্রসাদ খেলে পুনর্জন্ম হয় না।

১৯৫। দিবা নিদ্রায় আয়ুঃ ক্ষয় হয়।

১৯৬। স্ত্রীলোকের অবমাননা হলে বংশ শ্রীহীন হয়।

১৯৭। রোজ তিনটি কোমল নিমপাতা চিবিয়ে খেয়ে জল পান করতে হয়।

১৯৮। ঋতুর একাদশ ও ত্রয়োদশ দিনে কন্যাসন্তান জন্মালে সে বেশ্যাতুল্যা হয়।

১৯৯। মাতা-পিতা দুজনেই যে পুত্রের ওপর রুষ্ট থাকেন, সেই পুত্র মৃত্যুর পর গর্দভ হয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই গর্দভ মাত্র দশমাস জীবিত থাকে।

২০০। পুত্র যদি মাতা ও পিতাকে ভৎর্সনা করে তাহলে তাকে সারিক পাখী এবং প্রহার করলে কচ্ছপ হয়ে জন্মাতে হয়।

২০১। ফলহরণ কারীর সন্তান অকালে মৃত্যু মুখে পতিত হয়।

২০২। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় নিশিপালন কর্তব্য।

২০৩। একাদশীতে উপবাস কর্তব্য।

২০৪। কারও আকাঙ্ক্ষার বা লোভের বস্তু তাকে না দিয়ে খেলে অনিষ্ট হয়।

২০৫। পাদদ্বারা অগ্নি স্পর্শ করলে মার্জারযোনি প্রাপ্ত হতে হয়।

২০৬। সুরাপান করলে কৃষ্ণবর্ণ দন্ত বিশিষ্ট জীব হয়ে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

২০৭। জলে শ্লেষ্মা, মল ও মূত্র ত্যাগকারীর ভয়ংকর নরকবাস হয়।

২০৮। সংক্রান্তির পূর্বদিন মেঘ ডাকলে সাপের ডিম নষ্ট হয়।

২০৯। সংক্রান্তির পূর্বদিন লাউ, কুমড়া, ফল-মূল, ইত্যাদির বীজ অথবা চারা রোপন করলে গাছের গিঁটে ফল ধরে।

২১১। বামহাতে জলপানে সুরাপান তুল্য পাপ হয়।

২১১। একাদশী পালন করলে ধনসম্পদ ও সৌভাগ্য বৃদ্ধি পায়।

২১২। পুরুষ দীপ নির্বাণ করলে মৃত্যুর পর খদ্যোত হয়।

২১৩। গরুকে পা দিয়ে তাড়না বা অপসারণ করা পাপ।

২১৪। দাতা দান করবেন পূর্বমুখে।

২১৫। গ্রহীতা দান গ্রহণ করবেন উত্তরমুখে।

২১৬। তুলসীপাতা সযত্নে চয়ন করতে হয়।

২১৭। বংশ নির্মিত আসনে বসলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়।

২১৮। তৃণাসনে বসলে যশোহানি ঘটে।

২১৯। কাষ্ঠাসনে বসলে ব্যাধি হয়।

২২০। বস্ত্রাসনে বসলে লক্ষ্মীলাভ ঘটে।

২২১। প্রস্তরাসনে বসলে দুঃখলাভ অবশ্যম্ভাবী।

২২২। দ্বাদশী ভিন্ন অন্য দিনে পূজার জন্য তুলসী চয়ন করতে হয়।

২২৩। যে ব্যক্তি 'নাই' কথাটি বার বার বলে, সেও ঐ পাপে লিপ্ত হয়।

২২৪। এক হাতে প্রণাম করলে নরকবাস হয়।

২২৫। নারী কুমড়ো কাটলে শঙ্খচিল হয়।

২২৬। লৌহপাত্রে পক্ক অন্ন কাকমাংসতুল্য।

২৭৮। স্নান ও দেবপূজায় কাঁসার পাত্রের জল কুকুরের মূত্র তুল্য

॥ গ্রন্থপঞ্জী ॥

ইংরেজি

1. The Psychology of Superstitions : Gustav Jahoda.
2. The Golden Bough : J. G. Frazer.
3. Man, Myth & Magic (Vols. II, XX) : Edited by Richard Cavendish
4. The Keys of Power : J. Abbott.
5. Encyclopedia of Superstition : Edtied by Christina Hole.
6. Man and his Superstition : Carveth Read.
7. A Dictionary of Omens and Superstitions : Philippa Waring.
8. Ancient Beliefs and Modern Superstitions(lst Edition) : Martin Lings.
9. Ancient Rites and Ceremonies (2nd Edition) : Grace A Murray.
10. Encyclopedia of Magic and Superstitions.
11. All about Superstitions : Dr. Girija Khanna & Harimonan Khanna.
12. The Origins of Popular Superstitions and Customs : T. S. Knowlson.
13. Encyclopaedia Britanica.
14. 'Probability, Science and Superstition' (The Rationalist Annual, 1948) : Prof. A. E. Heath
15. The Natural History of Nonsense : Michael Joseph (1947)
16. The Science of Folklore : Alexander H. Krappe.
17. Cultural Anthropology : Melville J. Herskovits.

বাংলা

১. বাঙলা দেশের লৌকিক ঐতিহ্য : আবদুল হাফিজ
২. লৌকিক সংস্কার ও মানব সমাজ : ঐ

৩. লৌকিক সংস্কার ও বাঙালী সমাজ ঃ আবদুল হাফিজ
৪. বাংলার লোক-সংস্কৃতি ঃ ওয়াকিল আহমদ
৫. লোকায়ত দর্শন ঃ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়
৬. চিরঞ্জীব বনৌষধি ঃ আয়ুর্বেদাচার্য শিবকালী ভট্টাচার্য

গ্রন্থের সংকলিত লোক-বিশ্বাস এবং লোক-সংস্কারগুলি সংগ্রহে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলার বিভিন্ন মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা লাভ করা গেছে। এঁদের মধ্যে আছেন এনায়েতুল্লা বিশ্বাস (নদীয়া), প্রদীপকুমার চট্টোপাধ্যায় (বাঁকুড়া). প্রভাতকুমার দাস (হাওড়া), অমিতকুমার রায় (২৪ পরগণা), অভয়চরণ দে (২৪ পরগণা), শ্রীহর্ষ মল্লিক (নদীয়া), তৃপ্তিকুমার মুখোপাধ্যায় (কলকাতা), ইন্দিরা গঙ্গোপাধ্যায় (২৪ পরগণা), সমীর চন্দ (২৪ পরগণা), স্বপন চক্রবর্তী (২৪ পরগণা), শর্মিষ্ঠা মিত্র ও শর্মিলা মিত্র (কলকাতা), প্রণব মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), নগেন্দ্র দাশ (কলকাতা), সুভাষ দাশ (মেদিনীপুর), নুরুল আলম (হুগলী), মানবকুমার মুখোপাধ্যায় (হাওড়া), সুব্রত সেনাপতি (হাওড়া), দেবাশিস্ দত্ত (হাওড়া), সন্দীপ দত্ত (২৪ পরগণা), শশিশেখর মণ্ডল (মুর্শিদাবাদ), জলি চক্রবর্তী (বর্দ্ধমান), কৃষ্ণা ঘোষাল (মুর্শিদাবাদ), শরদিন্দু চট্টরাজ (বীরভূম), রীণা গণি (বীরভূম), জগন্নাথ মুখোপাধ্যায় (বাঁকুড়া) প্রদীপকুমার মুখোপাধ্যায় (২৪ পরগণা) এবং শান্তিময় ঘোষাল (হাওড়া)।